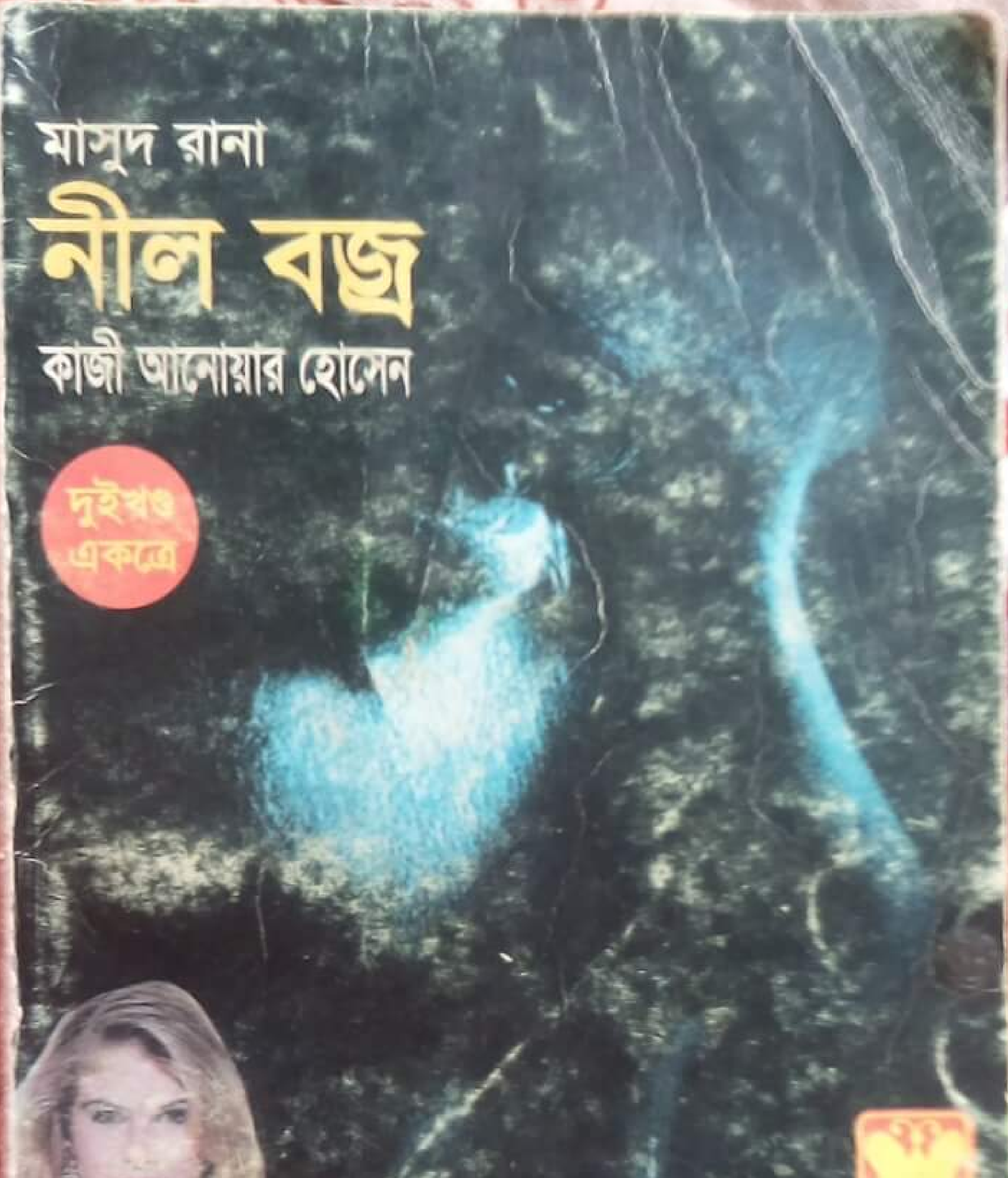
মাসুদ রানা

নীল বজ্র

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুইখণ্ড একত্রে



নীল বজ্র-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হবে। কানে প্রচণ্ড গর্জন অনুভব করল ও, উত্তেজিত রক্তস্রোত আছড়ে পড়ছে, তারপর মনে হলো খুলির গায়ে অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্ত, মুখ, কান আর নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসছে আগুন। ঝাঁকি খেয়ে সজাগ হলো মাসুদ রানা, এক নিমেষে বুঝে ফেলল অনেক কিছু। গর্জনটা আসছে একজোড়া সোভিয়েত জেট থেকে, ছুটে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ব্রিফিং করার সময় কি বলা হয়েছে মনে পড়ে গেল। রাশিয়ার প্রাচীনতম সী পোর্ট আর্চঅ্যাঞ্জেল-এর কাছাকাছি একটা এয়ারফোর্স বেস আছে, পাহাড়-শ্রেণীর চূড়া ছুঁয়ে প্রায়ই দেখা যায় সামরিক জেটগুলো ঘাঁটিতে ফিরছে।

নিজেকে তিরস্কার করল রানা, একটু ঝিমিয়ে নেয়ার সুযোগ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়া উচিত হয়নি। শরীরটা মোচড়াল বার কয়েক, পেশীর আড়ষ্ট ভাব কাটাতে চাইছে। তারপর চোখ রাখল হাতঘড়িতে। অ্যাকশনে যাবার সময় প্রায় হয়ে গেছে, অথচ শরীরটা ঠাণ্ডা বরফ লাগছে, ভুগছে ক্র্যাম্পে। কান পাতল রানা। জেটগুলোর শব্দ এখনও ভেসে আসছে দূর থেকে, তবে স্পটার এয়ারক্রাফটের কোন আওয়াজ পাচ্ছে না। অনেক নিচের এয়ারফিল্ড থেকে টেক-অফ করে ওটা।

স্পটার প্লেনটা ষাট বছরের পুরানো, একটা স্টর্চ। জার্মান এয়ারফোর্সের প্লেন, দখল করা হয়েছিল স্ট্যালিনগ্রাডে। আশি সালের ইলেকট্রনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ওটাকে একটা খেলনা ছাড়া আর কি বলা যায়।

এই মুহূর্তে পুরোপুরি সচেতন রানা, চারদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে পরিবেশটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। ওর চারদিকে, যদিও অনেক দূরে, পাহাড়প্রাচীর। উঁচু একটা রিজ-এর মাথায় শুয়ে রয়েছে ও। ওর ডানদিকে লম্বা কৃত্রিম লেক, সামনে ভারি ও কঠিন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিট গার্ডহাউস। বিশাল ড্যামের চূড়ায় উঠতে হলে গার্ডহাউসটাই বাধা। উপত্যকার জমিন থেকে আটশো ফুট উঁচু ওই ড্যাম।

ড্যামের নিচের জমিন বোল্ডার আর নুড়ি পাথরে ভর্তি। তবে রানা জানে যে ওগুলো আসলে ক্যামোফ্লেজ, কারণ বাঁধটার নিচে বিশ ফুট গভীর পর্যন্ত বোমা-নিরোধক কংক্রিট আর ইস্পাত আবরণ আছে। ওই কঠিন আবরণের নিচে ওর টার্গেট—এক নম্বর বায়োকেমিকেল প্রসেসিং প্ল্যান্ট।

উনিশশো বাহাত্তর সালের কনভেনশনে নিষেধ করা হলেও, সোভিয়েত রাশিয়া বায়োলজিক্যাল ও কেমিকেল ওঅরহেড তৈরি করছে এই দুর্গম এলাকার গভীর তলদেশে।

প্রথমে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল। ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষ চিৎকার করে তার

প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের ধরন দেখেই সন্দেহ দানা বাঁধে। ইউরোপ ও আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো গোপনে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্ব থেকে একমাত্র বাংলাদেশ তাতে যোগ দেয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হলেও, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিশ্বশান্তির কাজে কারও চেয়ে কম অবদান রাখছে না। সেই পরাধীন আমল থেকেই বিসিআই-এর একটা এসপিওনাজ নেটওঅর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা এত বিশাল যে কোথায় তার ডালপালা ছড়ায়নি বলা মুশকিল। এক বছর লেগে থাকার পর গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হলো, তথ্যনির্ভর রিপোর্ট পেশ করা হলো জাতিসংঘে। বিষয়টার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে আগেই একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল, বিসিআই-এর রিপোর্ট পাবার পর রুদ্ধদ্বারকক্ষে মীটিঙে বসল কমিটি। দু'দিন পর, আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা হলো অভিযোগ। কিন্তু আগের মতই অভিযোগ অস্বীকার করা হলো ক্রেমলিন থেকে। তারপরই তদন্ত করে দেখার অনুমতি চাওয়া হলো জাতিসংঘের তরফ থেকে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অস্বীকার করে বললেন, তাতে তাঁদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা হবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে জাতিসংঘ কমিটি বিসিআই ও বিএসএস চীফকে অনুরোধ করল, তাঁরা যেন এর একটা বিহিত করেন। কিভাবে কি করতে হবে তা অবশ্য বলে দেয়নি কমিটি। জাতিসংঘের ফ্যাসিলিটি যথেষ্ট না হওয়ায় এই দুই ইন্টেলিজেন্সকে দায়িত্ব দেয়া হয় আরও তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার। অফিশিয়ালি এর বেশি কিছু বলা সম্ভব ছিল না। কি করতে হবে সেটা ঠিক করেন সংশ্লিষ্ট ইন্টেলিজেন্স সংস্থার দুই প্রধান। তারই ফলশ্রুতিতে এই মুহূর্তে এখানে দেখা যাচ্ছে রানাকে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান রানাকে জানিয়েছেন, এতদিন পরিচিত আতঙ্ক উৎপাদন করা হচ্ছিল—নার্ভ ও অন্যান্য প্রচলিত গ্যাস। কিন্তু ইদানীং প্ল্যান্টে নতুন মেশিন বসানো হয়েছে আরও মারাত্মক কিছু তৈরি করার জন্যে। এবার তৈরি হবে রোমহর্ষক একটা ভাইরাস। মানুষ যেমন ধীরে ধীরে দুনিয়ার বুক থেকে বন-বাদাড় ধ্বংস করে ফেলছে, এই ভাইরাসের কাজ হবে একই পদ্ধতিতে প্রাণীকুল নিধন। আর দু'হপ্তার মধ্যে এই জীবাণুর উৎপাদন শুরু হতে যাচ্ছে পাতাল কারখানায়। এই বায়োলজিক্যাল এজেন্টকে শুধু দুঃস্বপ্নের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। এর বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের শরীরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে, পাতলা পানির মত করে ফেলে রক্তকে, শরীরের প্রধান কলকজাগুলোকে একের পর এক অচল করে দেয়। মৃত্যু হয় দ্রুত, তবে যন্ত্রণাদায়ক।

বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো আর বিসিআই চীফ রাহাত খানের সিদ্ধান্ত হলো, এই বায়োলজিক্যাল এজেন্ট দিয়ে ওঅর-হেড বা বোমা বানানো পুরোপুরি যদি বন্ধ করা না-ই যায়, যে-কোন মূল্যে অন্তত দেরি করিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা যে খুব জরুরী, সেটা তাঁরা তাঁদের এজেন্টদের ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ-ধরনের ভাইরাস আমেরিকা বা ইউরোপে ব্যবহার করার সম্ভাবনা

কম, সোভিয়েত রাশিয়ার টার্গেট হবে তৃতীয় বিশ্ব। এই হামলা ঠেকানোর জন্যে কোন ধরনের ইমিউনাইজেশন দরকার। পশ্চিমা বিশ্বে এ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে, তবে কবে নাগাদ সাফল্য আসবে বলা কঠিন। কাজেই ব্যাপারটা সামাল দেয়ার দায়িত্ব চেপেছে বাংলাদেশের মাসুদ রানা আর তার পুরানো বন্ধু ইংল্যাণ্ডের পিটার মুরেলের ওপর।

রাহাত খান রানাকে বলেছেন, 'তোমার সঙ্গী হিসেবে মুরেলকে বাছাই করা হয়েছে, সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে। ওরা ধরে নিয়েছে, বিসিআই-এর বেস্ট এজেন্ট তুমি। আর মুরেল ওদের সেকেণ্ড বেস্ট। খুব স্বাভাবিকভাবেই টীমের লিডার নির্বাচন করা হয়েছে তোমাকে। আমি বা মি. লংফেলো, দু'জনেই জানি যে তোমাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। প্ল্যান্টটা এখুনি ধ্বংস করতে হবে। কয়েক হপ্তা দেরি করলে সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে নিচে, উপত্যকার দিকে তাকাল রানা। ও ভাবছে, মানুষের নিষ্ঠুরতার বুঝি কোন সীমা নেই। সোভিয়েত রাশিয়া নির্যাতিত মানুষের জয়গান গেয়ে সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করছে, অথচ কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের অধিপতিরা দেশটার দুর্গম উত্তর প্রান্তে এমন মারণাস্ত্র তৈরি করছেন, ইচ্ছে করলেই যেন মানবজাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন তাঁরা।

ওর নিচের দিকে সভ্যতার চিহ্ন বলতে ভোঁতা চেহারার একটা রানওয়ে। খোলা ক্ষতের মত দেখতে। লম্বা একটা খাদ ত্রিশ ফুট দূরে থাকতে থেমে গেছে ওটা। খাদটা ড্যামের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়, উপত্যকার মেঝের ওপর যে মালভূমি, তার দূর প্রান্তে। প্রায় এক মাইল চওড়া খাদ, খুব গভীর, তলাটা আলাদা একটা উপত্যকার মত।

প্রসেসিং প্ল্যান্টে আসা-যাওয়ার দুটো পথ আছে, রানওয়ে তার মধ্যে একটা। পুরানো একটা আন্তনভ এএন-ফরটিন বী প্লেন সিকিউরিটি গার্ড, শ্রমিক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে আসে বা নিয়ে যায়। প্লেনটা মডিফাই করা হয়েছে, অল্প একটু রানওয়ে পেলেই নামতে বা উঠতে পারে।

অপর প্রবেশপথ পাতাল রেল, ষাট সালের দিকে মাটি আর পাথর কেটে তৈরি, স্টাফ ও প্রোডাক্ট আর্চঅ্যাঞ্জেল বন্দরে আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। পণ্য বহন করার জন্যে রয়েছে ফ্ল্যাটবেড কার। ট্রুপস ও স্টাফ বসে খোলা ক্যারিজে, সীটগুলো কাঠের। আর্চঅ্যাঞ্জেল থেকে প্রসেসিং প্ল্যান্টে পৌঁছুতে সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, আরোহীদের কষ্টের সীমা থাকে না।

আর্চঅ্যাঞ্জেল বন্দরে তিন দিন আগে পিটার মুরেলের অনুপ্রবেশ করার কথা। তার ডকুমেন্ট যদি ঠিকঠাক থাকে, কেউ যদি তার কাভার চ্যালেঞ্জ না করে, এরইমধ্যে দীর্ঘ পাতাল ভ্রমণ শেষ করে প্রসেসিং প্ল্যান্টের ভেতর ঢুকে পড়েছে সে।

কাজটা দু'জনের। প্রথমে ভেতরে ঢুকবে মুরেল, ছাদে উঠে একটা গ্রিল খুলে রানার ঢোকার পথ তৈরি করবে। গ্রিলটা এয়ার কণ্ডিশনিং ইউনিটের কাছাকাছি। ভেতরে ঢোকার পর আরও একটা কাজ করতে হবে মুরেলকে। দেখেশুনে একটা

সেফ জোন বেছে রাখবে সে, যেখানে দু'জন মিলে আসল কাজটা সারবে।

ভেতরে ঢোকার আগে রানার কাজ হলো ড্যামের মাথায় পোস্ট-এ যে দু'জন গার্ড আছে তাদেরকে অকেজো করা, তারপর অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে মুরেলের কাছে পৌছুনো। এরপর গোপন ফ্যাসিলিটি উড়িয়ে দেবে ওরা, কপাল ভাল থাকলে পালাবে। পালিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছুতে হবে ওদেরকে, আর্চঅ্যাঞ্জেল থেকে সেটা বিশ মাইল পুবে। সংশ্লিষ্ট কারুরই মনে কোন সন্দেহ নেই যে এটা একটা সুইসাইডাল মিশন। নামটাও তাৎপর্যপূর্ণ–অপারেশন ডেথট্র্যাপ। কোডনেমটা মনে পড়তে রানার ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। এ বোধহয় সোহেলের কাণ্ড, সব সময় এমন নাম বাছাই করবে যে মনে পড়লেই ভেতরে সতর্ক একটা ভাব জেগে ওঠে।

হাত ও পা আবার লম্বা করল রানা। এই পজিশনে শুয়ে রয়েছে সাত ঘণ্টার ওপর, গার্ড পোস্ট থেকে পঞ্চাশ গজেরও কম দূরে। এখানে পৌঁচেছে, বলা উচিত নেমেছে, আট ঘণ্টা আগে–প্যারাশুট নিয়ে। এইচএএলও অর্থাৎ হাই অলটিচ্যুড লো ওপেনিং টেকনিট ব্যবহার করেছে ও, অস্তিত্ব গোপন রাখার সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল প্লেনটায়। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নেমে আসে ও, পাথুরে ঢাল বেয়ে আধ মাইল উঠতে এক ঘণ্টা লেগে গেছে। ঢাল বেয়ে ওঠার পর ঝুলে থাকা ছোট একটা পাথরের কাছে আসতে হয়েছে ওকে, এখান থেকে গার্ড পোস্টের ওপর পরিষ্কার নজর রাখা যায়।

গার্ড পোস্টটা কংক্রিট আর ইস্পাতের সরল একটা চৌকো কাঠামো, ঝুলে আছে বাঁধের শীর্ষ কিনারায়। রানার দিকে বিল্ডিঙটায় একটা দরজা ও জানালা আছে। ব্রিফিঙের সময় ছবি দেখানো হয়েছে ওকে, কাজেই জানে দু'জন স্থায়ী গার্ডের খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম ও ঘুমোবার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ও সুযোগ-সুবিধে আছে ওখানে। রানার আরও জানা আছে যে শেষ মাথায় উঁচু ইস্পাতের বার দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা আছে, স্লাইডিং ইলেকট্রনিক গেট সহ। ওই পথ দিয়ে বাঁধের মাথায় বিস্তৃত ওয়াকওয়েতে যাওয়া যায়।

এই পোস্টে যারা ডিউটি দেয় তাদেরকে এক নম্বর বায়োকেমিকেল প্রসেসিং প্ল্যান্টে স্থায়ী অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কেজিবি-র বর্ডার গার্ডস ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের, প্রত্যেককে এলিট ট্রুপস-এর সঙ্গে বিশেষ ট্রেনিং কোর্স কমপ্লিট করতে হয়েছে। বাঁধের অপর প্রান্তে গার্ড রাখার দরকার নেই, কারণ ওদিকটায় শুধুই খাড়া পাহাড়-প্রাচীর।

দু'জন গার্ড, প্রতি হপ্তায় একবার পালাবদল। পালাবদলের সময়টা মোটেই সুখকর নয়। বাঁধের গায়ে এক সেট চওড়া ডি-শেপড ধাপ আছে, ওঠা বা নামার সময় আতঙ্কে কলজে শুকিয়ে যায়। রানা ভাবছে, ঝড়ো শীতের দিনে ওই ধাপ বেয়ে নামতে কেমন লাগবে? শিউরে উঠল ও, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর নিজের নামার সময় হয়ে এসেছে।

সঙ্গে প্রচুর ইকুইপমেন্ট রয়েছে, সব একবার চেক করে নিল ও।

বিশেষভাবে ডিজাইন করা ওয়েট সুট পরেছে, ক্লাইম্বিং বুট ও লম্বা একটা পার্কা সহ। ওয়েট সুট আর পার্কার রঙ ছাই, যাতে পাথরের সঙ্গে মেলে। বোতাম

ও জিপার দিয়ে আটকানো অসংখ্য পকেট আছে দুটোতেই। পার্কার নিচে বুটে আটকানো আছে বিশেষ একটা ইকুইপমেন্ট। আর লম্বা একটা পকেটে আছে এমন এক জিনিস, ওর আশা চূড়ান্ত পর্বে উদ্ধার পেতে সাহায্য করবে ওকে। পকেটটা ওয়েট সুটে, ডান উরুর গায়ে। আরও আছে কোমরে জড়ানো একটা ওয়েবিং বেল্ট। ওই বেল্টে পাউচের সংখ্যা চার। ওয়েবিং হোলস্টারে রয়েছে এএসপি নাইনএমএম, লোড করা হয়েছে ভয়ঙ্কর গ্লেসার অ্যামুনিশন, সাইলেন্সার সহ। ওর মুখ আর মাথা ইনসুলেটেড স্কি মাস্কে ঢাকা, হাতগুলোকে রক্ষা করছে চামড়া কামড়ে থাকা লেদার গ্লাভস। গ্লাভস থাকায় আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে না, ফলে সূক্ষ্ম কাজ করার সময় ওগুলো অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে।

পকেট আর পাউচে যা যা আছে, সবগুলোর কথা স্মরণ করল রানা, মনে মনে টিক চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় আর ক্লান্তিতে চোখে বিপজ্জনক ঘুম নেমে আসার আগেও একবার এভাবে টিক চিহ্ন দিয়েছিল ও।

টিক চিহ্ন দিচ্ছে, আওয়াজটা সজাগ করে তুলল ওকে। স্টর্চের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, অনেক নিচের রানওয়ের কিনারায়। এটা হলো টহল শুরু হবার সঙ্কেত। গোটা এলাকার ওপর পুরানো এই প্লেন নিয়মিত চক্কর দেয়। পাইলট লক্ষ রাখে অতি উৎসাহী কোন নাগরিক বাঁধে চড়ছে কিনা, কিংবা রাষ্ট্রের কোন শত্রু নিষিদ্ধ এলাকার কাছাকাছি চলে এসেছে কিনা।

স্টর্চ টহল দেয় বিশেষ প্যাটার্ন ধরে, সেটা সাধারণত বদলায় না, সময় লাগে বিশ মিনিটের মত। শেষ পর্বে লেকের ওপর দিয়ে ছুটে আসে, বাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে যায় ঠিক মিডপয়েন্ট ধরে। বড় আকারের গ্রীনহাউস ককপিট থেকে গার্ড পোস্টের ওপর চোখ বুলায় পাইলট। রুটিন সিকিউরিটির নিয়ম অনুসারে, কেজিবি বর্ডার গার্ডদের একজন ইস্পাতের খাঁচায় বেরিয়ে আসবে, সঙ্কেত দিয়ে পাইলটকে জানাবে 'সব ঠিক আছে'। গার্ড পোস্টে দু'মুখো রেডিও ছাড়াও টেলিফোন আছে, তাসত্ত্বেও সিকিউরিটি ইন চার্জ কর্নেল কুরুনভ এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

দিমিত্রি ডাচোভস্কি কুরুনভ কেজিবি বর্ডার গার্ডস-এর একজন সিনিয়র অফিসার, রানার মত মুক্ত বিশ্বের অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্টই তাঁকে চেনে। সিকিউরিটির ব্যাপারে উন্মাদ বলা হয় কুরুনভকে, সন্দেহ করা হয় সুযোগ পেলে তিনি বোধহয় গার্ডের পিছনে গার্ড, তার পিছনে গার্ড, তার পিছনে…এভাবে চালিয়ে যাবেন।

টেক অফ করার সময় স্পটার প্লেনের আওয়াজ বদলে গেল। ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর নিঃশব্দে ছুটল বিল্ডিংটার দিকে। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল শরীরটা, জানালার দিকে এগোচ্ছে। একটা কান প্লেনের দিকে, উপত্যকা ছেড়ে আকাশে উড়ছে ওটা।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, উঁকি দিয়ে জানালার ভেতর তাকাল। মুখোমুখি বসে দাবা খেলায় মগ্ন দুই গার্ড। কি ঘটবে, ভাবল রানা, নির্দেশ ভুলে গিয়ে ওরা যদি পাইলটকে সঙ্কেত না দেয়?

প্লেনের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছিল; এখন আবার কাছে চলে আসছে।

লেকের দূর প্রান্তে এখন ওটা, বাঁধের মাঝখান বরাবর তাক করছে নাকটা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রয়েছে রানা, গার্ডদের গলা পাচ্ছে। মেঝেতে ঘষা খেল চেয়ারের পায়া।

আরেকবার উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। বাঁধের দিকের দরজা খুলছে গার্ডদের একজন। দরজা খুলে ইস্পাতের তৈরি ঘরের মধ্যে ঢুকল। দ্বিতীয় গার্ড এখনও টেবিলে বসে আছে, তার সমস্ত মনোযোগ দাবার বোর্ডে।

প্লেনের দিকে একটা কান রেখে হোলস্টার থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করল রানা। খুব সাবধানে দরজার দিকে এগোল। মাথা নিচু করে জানালাটাকে পাশ কাটাবার সময় আরেকবার উঁকি দিল ভেতরে। খাঁচায় দাঁড়ানো গার্ড হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ঝট করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও, ডান হাতটা তুলল। দাবার বোর্ডে মনোযোগ থাকায় নড়ে উঠতে দেরি করল দ্বিতীয় গার্ড। ঘাড় ফেরাল সে, রানার দিকে এমন হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল যেন ভিন গ্রহের কোন প্রাণী দেখছে। তারপর চেয়ারটা পিছন দিকে সরাতে চেষ্টা করল, চেহারায় বিস্ময় অবিশ্বাস আর ভয় ফুটে উঠেছে।

অটোমেটিক তেমন কোন শব্দ করল না, ক্লিক করে ওঠার পর ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরুল শুধু। রাউণ্ডটা ফায়ার হবার যে আওয়াজ, তারচেয়ে মেকানিজমের ক্লিকটাই বরং বেশি জোরাল। এক জোড়া বুলেট লোকটার বুক চুরমার করে দিল দেখে চোখ-মুখ কোঁচকাল রানা। দুটো বুলেটই হার্টে লেগেছে, মাঝখানের ব্যবধান সিকি ইঞ্চি। রানার নাকের ফুটো কেঁপে উঠল, গানস্মোক আর রক্তের গন্ধ পেয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, সব সময় দুটো গুলি ছুঁড়তে হবে, প্রচলিত নিয়মও তাই বলে। তবে, যেহেতু গ্লেসার বুলেট, একটাই যথেষ্ট–কারণ এই গুলি আঘাত করলে শতকরা নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে ভিক্টিম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা যায়। এটার বৈশিষ্ট্য হলো, ভেতরে ঢোকার পর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

মৃত সৈনিকের চেয়ার ধাক্কা খেয়ে দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি পিছিয়ে গেল। একদিকে কাত হয়ে পড়ল লাশ, তারপর ঢলে পড়ল মেঝেতে, টেবিলে ঘষা খেয়ে দাবা বোর্ডের সঙ্গে নিচে নামল একটা হাত, ঘুঁটিগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

স্পটার প্লেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

লাশটা টপকাচ্ছে রানা, বাজতে শুরু করল টেলিফোন।

ইতস্তত করছে ও, চোখ দুটো ইনকামিং পয়েন্ট খুঁজছে। পর পর পাঁচবার রিঙ হলো, এতক্ষণে দেখতে পেয়ে সকেট থেকে জ্যাকটা হ্যাচকা টানে খুলে নিল ও। ইতিমধ্যে প্রথম গার্ডের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকেছে কানে, ফিরে আসছে লোকটা। কংক্রিট মেঝে ধরে তার বুটের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে এল, সন্দেহ নেই হোলস্টার থেকে পিস্তলটাও বের করে ফেলেছে।

সতর্কতার অভাব, মনে মনে বলল রানা। গার্ড পোস্টের ভেতর কি ঘটছে বা ঘটতে পারে তা না ভেবেই ছুটে আসছে লোকটা। দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকে হোঁচট খাওয়া থেকে কোন রকমে রক্ষা পেল, হাতের পিস্তল

শক্তভাবে ধরার সময়টুকুও দেয়নি নিজেকে।

এবার রানা একটাই গুলি করল। বাঁ দিকে ঘুরে গেল লোকটা, বাড়ি খেলো দেয়ালে, ঘষা খেয়ে মেঝেতে কাত হলো, দেয়ালে ফুটে উঠল তাজা রক্তের মোটা একটা দাগ। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। দ্বিতীয় লাশের পায়ের কাছে শুধু একজোড়া বোড়ে গড়াচ্ছে।

খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ওর দৃষ্টি স্থির হলো গেটের কন্ট্রোলে। বাঁধের মাথায় পৌঁছুনোর পথ ওই গেট। বড় আকারের বোতামটা অনুজ্জ্বল রুপো দিয়ে তৈরি ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে, দরজার বাম দিক উঁচু দেয়ালে বসানো, ঠিক যেখানে থাকবে বলে ওকে জানানো হয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল রানা, হাতে আর বেশি সময় নেই। সব যদি ঠিকমত ঘটে থাকে, ওর জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছে মুরেল। প্ল্যান্টের সব স্টাফ এক ঘণ্টার মিড-মর্নিং ব্রেক-এ অলস সময় কাটাচ্ছে। প্ল্যানটা হলো, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিস্ফোরক বসাতে হবে, তারপর সরে যেতে হবে এলাকা ছেড়ে।

পার্কার জিপার ধরে টান দিল রানা, তারপর শরীরে জড়ানো ইলাস্টিক রোপ খুলতে শুরু করল। বাম বাহুতে পেঁচিয়ে নিল একটা প্রান্ত, লক্ষ রাখছে মেঝেতে রশির যে কয়েল তৈরি হচ্ছে সেটা যেন জড়িয়ে না যায়। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এই বিশেষ ইকুইপমেন্টের শক্তি ও নমনীয়তার ওপর ঝুলে থাকবে ওর জীবন। রশিটা এমনভাবে কুণ্ডলী পাকাল, কঠিন আবরণ লাগানো লূপটা যাতে বাঁ হাতে থাকে, ডান হাতে থাকে বড় আকৃতির স্প্রীঙ ক্লিপটা।

হাত তুলে ব্যাঙের ছাতায় বাড়ি মারল রানা, স্প্রীঙ ক্লিপ দিয়ে।

খাঁচার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে এল ধাতব গুঞ্জন। উঁকি দিয়ে তাকাতে দেখা গেল বাঁধের চওড়া মাথায় বেরুনোর পথ খুলে গেছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে ছুটল রানা।

দুই

রানার ধারণা ছিল না লেক থেকে এরকম তীব্র বাতাস এসে ধাক্কা মারবে, তবে বাঁধের মাথা যথেষ্ট চওড়া হওয়ায় তাল সামলাবার জন্যে গলদঘর্ম হতে হলো না। দু'পাশে লম্বা গার্ডরেইল আছে, কাজেই পা পিছলে আটশো ফুট নিচে পড়ার কোন ভয় নেই। যদিও নিচে পড়াই ওর উদ্দেশ্য। এই মুহূর্তে সেই প্রস্তুতিই নিচ্ছে।

আকাশ ছোঁয়া কাঠামোর মাঝখানে চলে এল রানা, নিচের দিকে তাকাতে পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। অপারেশন ডেথট্র্যাপের জন্যে প্রস্তুতি নিতে খুব বেশি সময় দেয়া হয়নি ওকে, মাত্র দু'বার প্র্যাকটিস করা সম্ভব হয়েছে। এখন যতটা দূরত্ব পেরোতে হবে, প্র্যাকটিসের সময় তার অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে। এ পদ্ধতিতে মাত্র একবারই সুযোগ পাবে তুমি—সঙ্গে না আছে রিজার্ভ প্যারাশুট,

কব্জিতে না আছে অলটিমিটার।

প্রথমে রানা প্রস্তাব রেখেছিল বাঁধের গা বেয়ে নিচে নামবে। কিন্তু তারপর নিজেই বুঝতে পারে, ক্লান্তিকর এই স্বাভাবিক পদ্ধতি ব্যবহার করলে অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে ওকে, কারও চোখে ধরা পড়ে যাবার ঝুঁকি তাতে অনেক বেড়ে যাবে। নানাদিক ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, খসে পড়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

গার্ডরেইলে স্প্রিঙ ক্লিপ আটকে টান দিল রানা, খুলে না আসায় স্বস্তিবোধ করল। ক্লিপ ঠিকমত আটকালেও, গার্ডরেইলের লোহা বাঁধের মাথায় কংক্রিটের ভেতর ভালভাবে ঢুকে আছে কিনা তার ওপর নির্ভর করবে ওর জীবন-মরণ। এক্সপার্টরা অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, গার্ডরেইল খুবই মজবুত, ভেঙে যাবার বা খুলে আসার কোন ভয় নেই।

সমস্ত দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে লূপের ভেতর ডান পা ঢোকাল রানা, তারপর লম্বা পিটন গানটা বের করল। এটা জোড়া লাগিয়েছে রানা এজেন্সির মেকানিক্যাল এক্সপার্ট সুলতানা পারভিন। ওয়েট সুটে, ওর উরুর কাছে, স্পেশাল একটা হোলস্টারে ছিল ওটা। হামাগুড়ি দিচ্ছে রানা, রেইলের নিচে দিয়ে বাঁধের কিনারায় চলে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল কর্ডের স্তূপটা পুরোপুরি মুক্ত কিনা বা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা। তারপরই বাঁধের মাথা থেকে লাফ দিল নিচে।

প্লেন থেকে লাফ দেয়াটা স্বস্তিকর এই অর্থে, জানা আছে এক সময় প্যারাশুট খুলে যাবে। লাফ দেয়ার সময় রানার মনে সেরকম কোন স্বস্তি ছিল না, কারণ ওর সঙ্গে কোন প্যারাশুট নেই। খসে পড়ার মুহূর্তে ওর পেট ছিল বাঁধের মাথায়। পতনটা সেই যে শুরু হয়েছে, তার আর যেন শেষ নেই। রানা অনুভব করতে পারছে, প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে ওর গতি। বাতাসের প্রতিরোধও অনুভব করছে। শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ পাচ্ছে কানে। মুখের পেশীগুলো কি আকৃতি পেয়েছে নিজেও বলতে পারবে না। নাকের দু'পাশের মাংস কেউ যেন কানের দিকে টেনে ধরেছে বলে মনে হলো। ঠোঁট আর ঠোঁটের চারপাশের মাংস লম্বা ও সরু হয়ে গেছে, ভিলেনের হাসির ঢঙে।

বাতাস কেটে নেমে যাচ্ছে শরীরটা, বাঁধের পাঁচিল মাত্র ফুটখানেক দূরে। পিটন গানটা সামনে ঠেলে দিল ও, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে জোড়া গ্রিপ। এই পিটন গানই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে ওকে। এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট থেকে কাজ পেতে হলে সময়ের চুলচেরা হিসাব থাকা চাই, এক সেকেণ্ড হেরফের হলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। হিসাবে ভুল হলে ইলাস্টিক রোপ বা কর্ড ওটার সবটুকু দৈর্ঘ্য খরচ করে ফেলবে, ঝাঁকি দিয়ে টেনে নেবে ওকে, কর্ডের টানে ওপরে উঠে যাবে ও, তারপর আবার পতন শুরু হবে—ধরে নেয়া চলে নির্ঘাত বাড়ি খাবে বাঁধের শক্ত দেয়ালে।

নিচে তাকাবার জন্যে বাতাসের প্রবল চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো ওকে। নিচের বোল্ডার আর নুড়ি পাথরগুলো তীর বেগে ছুটে আসছে ওর দিকে। এখন যদি আতঙ্ক পেয়ে বসে, আসল কাজটাই করতে পারবে না। পিটন ফায়ার করতে

হবে, কিন্তু সময় আন্দাজ করার ব্যাপার আছে। রানা পুরোপুরি ওর ইন্সট্রিঙ্কটের ওপর নির্ভর করছে। হিসাব কষে নির্দিষ্ট সেকেণ্ডটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সময় কোথায়! দূরত্ব তো প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।

ভুল হোক বা সঠিক, আন্দাজ করা সময়টা হাজির হলো। পিটন গানের হাতল দুটো মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে আছে রানা। আল্লার নাম নিয়ে চাপ দিল ট্রিগারে। প্রজেক্টাইল চার্জ বিস্ফোরিত হলো, ছোট্ট বিস্ফোরণের ঝাঁকি লাগল বাহুতে। কাঁটা লাগানো তীর, পিটন, সবেগে ছুটল নিচের দিকে–পিছনে সাপের মত রেখে যাচ্ছে প্রায় একশো ফুট আলট্রা স্ট্রং ক্লাইম্বিং রোপ, ওটার গতি রানার পতনের চেয়ে সামান্য একটু বেশি।

পিটন আটকাল বাঁধের গোড়ায়, ক্যামোফ্লেজড কংক্রিটে, ঠিক যেই মুহূর্তে কর্ডটার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের সবটুকু লম্বা হয়েছে; তবে তারপরও দু'শো ফুট ইলাস্টেশন বাকি। টানটা অনুভব করল রানা, মুহূর্তের জন্যে ভয় পেল সকেট থেকে বাহু দুটো না ছিঁড়ে যায়। দুই বাহু আর ডান পায়ের পেশী তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে দিল সারা শরীরে, যেন ওকে শূলে চড়ানো হয়েছে। নিচের দিকে মাথা, আকাশের দিকে পা, আলট্রা স্ট্রং রোপ শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে বাঁধের নিচে নামছে ও, নির্যাতনে বিকৃত হয়ে আছে মুখের চেহারা। কর্ডটা এখন টান টান, ওপর দিকে আকর্ষণ করছে ওকে, টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বাঁধের গায়ে।

অবশেষে বাঁধের গোড়ায় পৌঁছুল রানা, আটকে আছে কর্ড আর রোপের মাঝখানে। নিচের দিকে তাকাতে পিটনের কাহিল অবস্থা উপলব্ধি করতে পারল ও, কংক্রিটের ওপর একটু যেন নড়ছে সেটা।

এখন যদি পিটন খুলে আসে, কি ঘটতে পারে জানে রানা। দেয়ালে ঘষা খেয়ে ওপর দিকে উঠে যাবে ওর শরীর, পায়ে চামড়া বলে কিছু থাকবে না। কর্ডটা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাঁধের মাথায়, ওকে মানে ওর যে-টুকু তখনও অবশিষ্ট থাকবে।

কর্ড আর রোপের টানাটানিতে ওর বাঁ হাত ছিঁড়ে যেতে চাইছে। হাত বাড়িয়ে ডান পা থেকে লুপটা খোলার চেষ্টা করল ও। পা থেকে ওটা বেরিয়েই বাঁধের দেয়াল ধরে ছুটল ওপর দিকে, দ্রুতগতি লম্বা সাপের মত।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ধকলটা সামলে নিচ্ছে। তারপর মাথা নিচু করে পাথরগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল। বিশ গজ দূরের খয়েরি রঙ করা এয়ার কণ্ডিশনিং পাম্পটা ওর লক্ষ্য।

গ্রিলটা পাম্পের পাশে, দেখা গেল খোলা রয়েছে। বড় আকারের প্যাডলকে মেটাল-কাটিং ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, দাগ দেখে বোঝা গেল। সন্দেহ নেই, কাজটা মুরেলের। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিল রানা। সে নিরাপদ আছে ভেবে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদও জানাল। মুরেল অনেক দিনের পুরানো বন্ধু, রানা তাকে ভালবাসে। টান দিয়ে গ্রিলটা খোলার পর চৌকো ও অন্ধকার একটা গর্ত দেখতে পেল ও, গর্তের দেয়ালে ডি-শেপ ধাপ, নিচের দিকে নেমে গেছে।

অন্ধকারে ঢুকল রানা, ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করছে না, নামছে

ধীর সতর্ক পায়ে। এই অন্ধকার কুয়া কতটা গভীর ওর জানা নেই। নিচে নেমে কি দেখবে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই।

চওড়া ডাক্ট অসম্ভব লম্বা, শেষ হতে চাইছে না। চোখে অন্ধকার সয়ে এলেও, জীবনে এই প্রথম ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে আচ্ছন্ন একটা ভাব অনুভব করছে রানা, প্রতিটি ইন্দ্রিয় নিজের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। পেশীতে এখনও ব্যথা অনুভব করছে, অথচ ব্যথা ও এই মুহূর্তে যে কাজটা করছে তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওর মন। অনেকগুলো ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেছে, মনের একটা অংশ এখনও রয়ে গেছে মাটির ওপরে, খসে পড়ছে পাথর আর সিমেন্টের দিকে। হাত দিয়ে ধাপ ধরার সময় চামড়া ছড়ে গেল, নাকে ঢুকল ভ্যাপসা একটা গন্ধ। যতই নিচে নামছে, গন্ধটা বাড়ছে।

এক সময় মনে হলো দশ বা পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, ধাপ টপকেছে প্রায় একশোটা। তারপর পায়ে ঠেকল নিরেট কিছু। মেঝে? নাকি একটা কার্নিস, অসতর্ক হলে অতল পাতালে খসে পড়বে? ইতিমধ্যে ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে রানা, উচ্চতার আতঙ্ক পেয়ে বসেছে ওকে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে ও। যতটুকু বোঝা গেল, ছোট একটা চেম্বারে নেমেছে, সম্ভবত মেইন্টেন্যান্স শাফটের অ্যাকসেস পয়েন্ট। ডান দিকে অস্পষ্ট দেখা গেল একটা দরজার আকৃতি। সেদিকে এগোবার সময় পাথুরে মেঝেতে পায়ের ঘষা লাগার আওয়াজ হলো। দরজাটা খোলার পর মনে হলো, এটা আরেকটা চেম্বার, তবে আকারে বড়।

ভেতরে ঢুকে দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, জমে পাথর হয়ে গেল শরীর। রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে নাকে। শুধু তাই নয়, শীতল ধাতব কঠিন স্পর্শও অনুভব করল ঘাড়ের পাশে, ঠিক কানের নিচে। সন্দেহ নেই, ওটা একটা পিস্তল।

'এমনকি নিঃশ্বাসও ফেলো না,' রুশ ভাষায় কথা বলল লোকটা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাকি সবাই কোথায়?'

'আমি একা,' জবাব দিল রানা, গলার আওয়াজে সামান্য হলেও স্বস্তি।

'সে তো আমরা সবাই!' অস্পষ্ট হাসির শব্দ হলো, তারপরই আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার, ঘাড় ফিরিয়ে পুরানো বন্ধুর দিকে তাকাল ও।

নিঃশব্দে হাসছে পিটার মুরেল, চেহারায় এখনও সেই স্কুল পালানো ছাত্রের দুষ্টামি ভাব। পরিচিত অনেকেই তার এই কৌতুকপ্রবণ স্বভাবটাকে বিপজ্জনক বলে মনে করে, বিশেষ করে প্রতিপক্ষরা। 'ভালয় ভালয় আসতে পেরেছ, সেজন্যে আমি খুশি,' বলল সে।

'যতটুকু ভেবেছিলাম তারচেয়ে জার্নিটা লম্বা, তবে,' হাসছে রানাও, 'পুরোটাই অধঃপতন।'

ইঙ্গিতে দ্বিতীয় একটা দরজা দেখাল মুরেল। খোলা পথে পেঁচানো একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। 'তুমি রেডি, দোস্ত?'

'এসো, সেরে ফেলি কাজটা।' দ্রুত এগোল রানা, দরজা টপকে সিঁড়ি বেয়ে

নামতে শুরু করল। 'তুমি এই পথে এসেছ?' না থেমেই জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। নিচে, তোমার ডান দিকে, একটা দরজা আছে। আরেকটা আছে তোমার মুখোমুখি। দ্বিতীয়টায় ইলেকট্রনিক লক। ওটার পিছনে তুমি আলাদীনের গুহা পাবে। মানে উপমা দিয়ে বলছি আর কি।'

মুরেল কথা বলছে, তবে রানা থেমে নেই। জিপার টেনে বেল্টের একটা পাউচ এরই মধ্যে খুলে ফেলেছে। ইলেকট্রনিক দরজার সামনে যখন এসে দাঁড়াল, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোট একটা চৌকা বাক্স। বাক্সটা ম্যাগনেটিক, দরজার পাশে আটকে দিল, আটকাবার সময় চাপ দিল খুদে একটা সুইচে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক আলো মিটমিট করতে শুরু করল, ছোট একটা ডিজিটাল রিড-আউট সচল হলো দ্রুতবেগে। 'জিনিসটা আসলে খুবই সহজ,' সুলতানা পারভিন রানাকে জানিয়েছে। 'একটা অটোডায়ালার-এর মত কাজ করে, পার্থক্য এইটুকুই যে এটা জ্ঞাত সম্ভাব্য সংখ্যা বা শব্দের পারমিউটেশন বাছাই করে প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচশোর মত। বাছাই করার কাজ চলছে, এ সময় যদি ওগুলোর কোনটার সঙ্গে আংশিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়, পুরো ইলেকট্রনিক কোডটা খুঁজতে শুরু করবে। যতই চালাকির সঙ্গে বা জটিল ভাবে তৈরি করা হোক না কেন সিস্টেম, সঠিক সংখ্যা বা শব্দ খুঁজে পেতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না। এই কাজটা শেষ হলেই খুলে যাবে তালা। 'খুবই কাজের জিনিস,' মন্তব্য করেছিল রানা।

সুলতানা পারভিন মুচকি হেসে বলেছিল, 'বিদেশী অনেক ব্যাংকে এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। কর্মকর্তারা ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারেননি।'

স্মৃতি রোমন্থন শেষ হলো না, তার আগেই বাক্স থেকে বিপবিপ শব্দ বেরিয়ে এল, ক্লিক করে খুলে গেল দরজা।

উঁচু, ঝুলন্ত একটা ওয়াকওয়েতে রয়েছে ওরা, নিচে বিশাল আকারের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট। দূর প্রান্তে এক সারিতে দেখা গেল স্টেনলেস স্টীলের ছ'টা প্রকাণ্ড ভ্যাট দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে সরু মেটাল টিউব দিয়ে সংযুক্ত। ভ্যাটের লাইনটা শেষ হয়েছে অসংখ্য টিউব আর পাম্পের সামনে, ওগুলো ঢুকেছে আরও বড় একটা কন্টেইনারে, দেখে মনে হলো কোন ধরনের প্রেশার কুকার। আরও কিছু পাম্প আর টিউব ওদের ডানদিকের দেয়াল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নিজেকে রানার দিকভ্রান্ত ও হতচকিত লাগছে। মাথার ওপর মাটির সঙ্গে ওর এই পজিশনের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

বাম দিকে, প্রকাণ্ড ভ্যাটগুলোর শেষ মাথায়, আরেকটা ইলেকট্রনিক দরজা। ওদের পায়ের সরাসরি নিচে চওড়া একটা কনভেয়র বেল্ট, মেঝের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে, একটা রাবার ফ্ল্যাপের ভেতর দিয়ে ঘোরে ওটা।

'দোস্ত, কি বুঝছ?' জিজ্ঞেস করল মুরেল।

'ওদিকে কি?' ইলেকট্রনিক দরজাটা দেখাল রানা।

'ল্যাবরেটরির বাকি অংশ, আমার ধারণা,' বলল মুরেল। মৃদু শব্দে হাসল সে। 'এখানে ঢোকার পর কানেকটিং প্যাসেজে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তোমার বস্ যে ম্যাপটা আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা যথেষ্ট নিখুঁত কাজেই

আমাকে যেখানে পেলে ওখানে আমি লুকিয়ে থাকি। বলতে পারো ল্যাবরেটরির ভেতর ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। যীশুর কিরে বলছি, পরিবেশটা সত্যি ভৌতিক।'

বড় লাল সাইনগুলো দেখল রানা, খুলির নিচে ক্রসচিহ্নের মত একজোড়া হাড়। এরকম সাইন একটা নয়, চারদিকে অসংখ্য ঝুলছে। প্রতিটিতে রুশ ভাষায় লেখা রয়েছে–সাবধান! বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ। 'আর ওগুলো?'

'সমস্ত ইকুইপমেন্ট ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে ওরা। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনে আসার পথে লোকজনকে বলাবলি করতে শুনলাম, এটা একদম নতুন একটা জিনিস। ভাইরাস উৎপাদন শুরু করার আগে সব কিছু সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে এখানে ধূমপান করলে তোমার স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে?'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'এসো, নিচে নামি।' সিঁড়ির দিকে এগোল রানা, বিপজ্জনক কারখানার মেঝেতে নেমে এল, শেষ মাথার দরজার গায়ে আবার বসাল ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা।

নিচে নেমে সময় নষ্ট করল না ওরা। পাউচ আর পকেট খালি করে প্যাকেট করা টাইমার আর চার্জ বের করল রানা। দু'জন মিলে ভ্যাট আর টিউবের পিছনে বিস্ফোরক সেট করল।

'শেষটা আমি সেট করব,' দূর থেকে মুরেলকে বলল রানা। 'ওটা যদি আমি তিন মিনিটে সেট করি, বেরিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাব আমরা। বাকিগুলো পরপর বিস্ফোরিত হবে...।'

দরজার গায়ে বসানো ডিভাইস বিপবিপ করে উঠল, জানিয়ে দিল ইলেকট্রনিক পাসওয়ার্ড খুঁজে পেয়েছে। বিপবিপ থামতে না থামতে কানের পর্দা ফাটিয়ে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বেল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। 'মুরেল, একটা কিছুর পিছনে লুকাও। এখন আর সময়...'

বাধা দিল ইলেকট্রনিক লাউডহেইলার। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি কর্নেল কুরুনভ বলছি। আপনাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, পালাবার কোন পথ নেই। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে ফেলে দিন, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসুন। এখুনি!'

'বললেই হলো!' বিড়বিড় করল রানা। ভ্যাটগুলো ওর ওপর ঝুঁকে আছে, পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। গলা চড়িয়ে মুরেলকে ডাকল, 'মুরেল? ওই হাই-টেক গ্যাজেট রিভার্স করে দাও। বাম দিকের সুইচটা শুধু টিপলেই হবে।'

হাই প্রেশার কুকারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা। 'মুরেল?' মাথা নিচু করে ড্রামটার আড়ালে চলে এল ও, উঁকি দিল বাইরে।

ওর প্রাণের বন্ধু পিটার মুরেল মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। লম্বা এক লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে, হাতের পিস্তলটা চেপে ধরেছে মুরেলের ঘাড়ে। ইউনিফর্মটা কর্নেলের। চেহারাটা কদাকার। তার পিছনে ছ'জন সশস্ত্র সৈনিক,

তাদের একজন রানার দিকে এক রাউণ্ড গুলি করল।
'গর্দভ! কি করছ!' চিৎকার করলেন কর্নেল কুরুনভ। 'হার্ডওয়্যারে লাগলে কি হবে জানো? চোখের পলকে মিহি গুঁড়ো হয়ে যাব সবাই!'
পিছিয়ে এল রানা। সর্বশেষ চার্জে টাইমার ঢোকাতে যাচ্ছিল ও, সেটার দিকে তাকাল। এটা বিস্ফোরিত হলে, বাকিগুলো চেইন রিয়্যাকশনে বিস্ফোরিত হবে, ফলে প্রায় গোটা কাঠামোটাই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। মেঝের ওপর দিয়ে কারখানার আরেক দিকে তাকাল ও। কনভেয়র বেল্টের স্টার্ট বাটন একটা মেটাল পোস্টে সেট করা হয়েছে, রাবার ফ্ল্যাপের কাছাকাছি।
'দশ পর্যন্ত গুণব আমি,' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল কুরুনভ। 'গোণা শেষ হবার আগে যদি বেরিয়ে না আসেন, আপনার বন্ধুকে গুলি করব।'
'এবং বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করবেন?' টাইমারটা এক মিনিটে সেট করল রানা, তারপর এক্সপ্লোসিভ চার্জে সেঁধিয়ে দিল। আপনমনে হাসছে ও। বেল্ট পাউচ থেকে হাতে বেরিয়ে এল একটা গ্রেনেড। পাউচটায় এরকম গ্রেনেড আরও চারটে আছে।
'ওয়ান···টু···,' গুণতে শুরু করেছেন কুরুনভ।
মুরেলের ঘাড়ের পিছনে এত জোরে পিস্তল চেপে ধরেছেন কুরুনভ, মুখ তুলে তাকাতে পারছে না সে।
বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আধ সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর গ্রেনেড থেকে খুলে নিল পিনটা, চেপে রাখল সেফটি লিভার।
কুরুনভ গুণছেন, 'থ্রী··· ফোর···।'
প্রকাণ্ড স্টীল প্রেশার কুকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওর হাত দুটো দু'পাশে মেলা, ডান হাতে গ্রেনেড, বাম হাতে পিস্তল।
'ফাইভ···।'
'আপনি ওকে খুন করলে আমরা সবাই মারা পড়ব।' রানা জানে কথাটা খুবই সত্যি। গ্রেনেডের কথা বাদ দিলেও, মেইন চার্জ আর ত্রিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে।
'আপনার ধারণা দেশের জন্যে মরতে আমি ভয় পাব?' কর্নেল কুরুনভের গলা অস্বাভাবিক কঠিন। পরমুহূর্তে ট্রিগারে টান দিলেন তিনি। প্রিয় বন্ধুকে ঢলে পড়তে দেখল রানা।
আর কিছু না ভেবে গ্রেনেডটা ছেড়ে দিল রানা, লাফ দিয়ে পড়ল কনভেয়র বেল্টে, একই সঙ্গে মুক্ত হাত দিয়ে চাপ দিল স্টার্ট বাটনে।
শুনতে পেল কুরুনভ চিৎকার করে তার লোকদের গুলি করতে নিষেধ করছেন। চোখের কোণ দিয়ে আবছাভাবে পিছিয়ে যেতে দেখল তাঁকে রানা, মুরেলের লাশটা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।
ঝাঁকি খেয়ে সচল হলো কনভেয়র বেল্ট। এখন যেহেতু তরল দাহ্য পদার্থ ভর্তি সিলিণ্ডার আর ভ্যাটগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে রানা, রুশ কর্নেল ওকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করলেন। রাবার স্কার্ট-এর ওপর কাঠে লাগল বুলেট, ঠিক যখন প্রসেসিং রুম থেকে কনভেয়র বেল্ট বের করে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে।

ওপর দিকে তির্যক একটা পথ ধরে এগোচ্ছে বেল্ট, গতি খুব দ্রুত।

কান ফাটানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। রানার মনে হলো কেউ যেন চিৎকার করে উঠল। তারপর অকস্মাৎ দেখল যে একটা লোডিং বে-তে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ওকে, ফ্যাসিলিটির বাইরে, রানওয়ে থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। ছোট্ট স্টর্চ প্লেনটা টেক অফ করার জন্যে রওনা হয়েছে, তবে গতি এখনও খুব কম।

ওর পিছনে মাটির তলা থেকে প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। শক ওয়েভে প্রায় ছিটকে পড়ল রানা। এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবে ধরে নেয়া চলে যে কমপ্লেক্সটার ভেতর থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ বেরুতে পারবে না। কাজেই দৌড়াতে শুরু করল ও, ছুটল প্লেনটার দিকে।

বাঁক নিয়ে গতি বাড়াতে যাচ্ছে পাইলট, এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে প্লেনটার কাছে পৌঁছুল রানা। ওর পিছনে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। এবার মাটি থেকে আগুন, ধোঁয়া আর আবর্জনা উথলে উঠল। সামনে লাফ দিল ও, ডান হাত দিয়ে স্টর্চের উইং স্ট্রাট ধরে ফেলল। গতি বাড়িয়ে প্লেনটাকে সিধে রাখার কাজে ব্যস্ত ছিল পাইলট, রানাকে দেখতে পেয়ে পাওয়ার সাপ্লাই কমাল, টেক অফ করার প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ককপিটের দরজা রানার নাগালে চলে এসেছে। হাতলে হাত দিল ও।

ব্রেক কষল পাইলট, রাডার ঘোরাল বাঁ দিকে, প্লেন কাত করে রানাকে উইং স্ট্রাট থেকে ফেলে দিতে চাইছে। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় নিজের দিকের দরজাটা খুলে ককপিট থেকে গড়ান দিয়ে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে যাবার আগে ফুল পাওয়ারে ঠেলে দিল থ্রটল।

একটা দোল খেয়ে স্ট্রাট থেকে ডান দিকের সীটে পড়ল রানা, থ্রটল টানার জন্যে কাত হলো, সেই সঙ্গে সরে এল কন্ট্রোলের পিছনে।

প্লেনটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করছে, উঁচু-নিচু মাটির ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে ঘন ঘন, ডানা দুটো পালা করে কাত হয়ে পড়ছে দু'দিকে। রানা বুঝতে পারল, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যাবে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে থ্রটল ফিরিয়ে আনল ও, চাপ দিল রাডার পেডালে। পিছনে আরও একটা বিস্ফোরণ হলো। প্লেনের নাক রানওয়ের দিকে ঘোরাল রানা, তাক করল মধ্যরেখা বরাবর।

রানওয়ের দুই তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এসেছে, প্লেন এখন প্রায় স্থির। কন্ট্রোলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে ককপিটের চারদিকে অস্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রানা, এই সময় আরেকটা বিস্ফোরণ প্রবল ঝাঁকি দিল প্লেনটাকে।

ফ্ল্যাপ লিভার নামাল রানা, দেখল ডানার ট্রেইলিং এজ-এর চওড়া এক্সটেনশনস পুরোপুরি বিস্তৃত হয়েছে। থ্রটল ওপেন করে ফুল পাওয়ার দিল ও, পা সরিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল ব্রেক।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল প্লেন, গতি পাচ্ছে, হজম করে ফেলছে অবশিষ্ট রানওয়ে। মেটাল সেকশন ছাড়িয়ে আসার পর রানা অনুভব করল প্লেনের লেজ ওপরে উঠছে। সামনে বিশ-বাইশ গজ ঘাস ঢাকা জমিন, ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে প্লেন, সোজা এগোচ্ছে লম্বা ও চওড়া একটা খাদের দিকে। ফ্ল্যাপ পুরোপুরি বিস্তৃত

হলেও, রানা জানে প্লেনটাকে আকাশে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় গতি তুলতে পারেনি ও। এখন তাহলে কি ঘটবে?

স্টিক টানল রানা। নিরেট মাটি ছাড়ল প্লেন। এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল শূন্যে, তারপর খসে পড়তে শুরু করল, নেমে যাচ্ছে গভীর খাদে।

রানা দেখল পাথরের দেয়াল দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওর দু'পাশ দিয়ে। বিশাল আকারের অসংখ্য বোল্ডার ও একটা ঝর্ণা মাত্র দু'শো ফুট নিচে, প্রতি সেকেণ্ডে আরও কাছে চলে আসছে। ধীরে ধীরে আবার পাওয়ার দিল রানা, বাঁ দিকে কাত করল প্লেন, নাক সামান্য একটু তুলল, আশা–যথেষ্ট এয়ারস্পীড পেলে প্লেনের ভারটা বইতে পারবে ডানাগুলো।

থ্রটল খুব ধীরে ধীরে টানছিল রানা, মনে হলো এক যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে। অনুভব করল, নাকটা উঠছে, গোটা মেশিন বাতাসে ভেসে থাকছে। ধীরে ধীরে খাদ থেকে উঠতে শুরু করল ও, প্লেনের নাক ঘোরাল ফ্যাসিলিটির দিকে। ওদিকে এখন শুধু আবর্জনা দেখা যাচ্ছে, আবর্জনার ভেতর থেকে লাফ দিচ্ছে আগুনের শিখা।

চোখে ঘাম পড়ায় সামনেটা ঝাপসা হয়ে গেল। কি ঘটতে যাচ্ছিল ভেবে শিউরে উঠল রানা। শুধু যে ভাগ্যের জোর তা নয়, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখায় এ যাত্রা বেঁচে গেছে ও।

খাদ থেকে আরও ওপরে উঠে এল প্লেন। রানার মনে হলো বাঁধে একটা ফাটল দেখতে পেয়েছে। তারপর স্পষ্টই ধরা পড়ল চোখে। ফাটলটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, গোটা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ছে পানি।

এখন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয়ার সময় নয়। এসপিওনাজ জগতের যে-কোন এজেন্ট যে ঝুঁকি নিত, সেই একই ঝুঁকি নিয়েছে মুরেল। ভাগ্যের সামান্য আনুকূল্য না পেলে মুরেলের জায়গায় মাটির নিচে এখন ও-ই থাকত। মুরেলের বদলে ফুটো হত ওরই খুলি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। পানিতে সব ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাবে ওর প্রিয় বন্ধুও।

ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিলেও, মুরেলকে কোনদিন ভুলতে পারবে না রানা। আজ সে মারা যাবার পর বন্ধুত্বের সম্পর্কটা মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। কিছু দিন আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বিকট একটা সমস্যায় পড়েছিল। কয়েকজন অফিসার রাশিয়ায় মূল্যবান গোপন তথ্য পাচার করছে, এটা ফাঁস হবার পর যখন তদন্ত শুরু হলো, দেখা গেল কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, সন্দেহের তালিকায় সবাইকেই রাখতে হয়। বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সরকার বিসিআই-এর সাহায্য চায় ডাবল এজেন্টদের খুঁজে বের করার কাজে। বিসিআই রানাকে পাঠায়। মুরেলের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল ওর, তবু রানা তাকে বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করেনি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় মুরেল, রানা নিঃসন্দেহে জানতে পারে রাশিয়ানদের সঙ্গে তার গোপন কোন লেনদেন হয়নি। রানা তাকে বিশ্বাস করছে, এটা বোঝার পর মুরেলও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুরেল ছিল এসপিওনাজ জগতের ডাটা ব্যাংক। শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, কেজিবি এজেন্টরা গোটা ইউরোপে কে কোথায় কি করছে, সব ছিল তার নখদর্পণে। তার

কাছ থেকে এ-সব তথ্য পেয়ে কয়েকজন কেজিবি এজেন্টকে জেরা করে রানা, বেরিয়ে আসে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের লাখ লাখ পাউণ্ড ঘুষ খাবার ঘটনা। তারপর ধীরে ধীরে জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আবার হয়ে ওঠে নিষ্কলুষ। কৃতিত্বটা পাওনা হয় বিসিআই ও রানার, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টার পদ দেয়া হয় ওকে। তবে মুরেলের অবদানের কথা মনে মনে স্বীকার করে রানা, তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল ও। সে কৃতজ্ঞতা নানাভাবে প্রকাশও করেছে। ফিল্ডে দর্শনীয় কোন সাফল্য দেখাতে না পারায় মুরেলের পদোন্নতি ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে মুরেলকে নিজের সঙ্গে রাখে রানা, সাফল্যের কৃতিত্ব তার বলে চালিয়ে দেয়। ফলে দ্রুত কয়েকটা প্রমোশন পেয়ে কিংবদন্তীর নায়ক জেমস বণ্ডের সম পর্যায়ে উঠে আসে সে। ইদানীং তাকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড বেস্ট বলা হচ্ছিল।

যতটা সম্ভব নিচে দিয়ে প্লেন ওড়াচ্ছে রানা, লক্ষ রাখছে পাহাড় চূড়ার সঙ্গে যেন ধাক্কা না খায়। নির্দিষ্ট জায়গায়, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে, ওকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিতে একটা সাবমেরিন আসবে। অপারেশন ডেথট্র্যাপ সফল হয়েছে, তবে খুব চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

একটা কথা ভেবে স্বস্তিবোধ করছে রানা। কমপ্লেক্সটায় কোন কেমিকেল বা বায়োলজিক্যাল উইপন সত্যিকার অর্থে ছিল না। থাকলে ওই ফ্যাসিলিটি উড়িয়ে দেয়ার চিন্তা এক পাগল ছাড়া আর কারও মাথায় আসত না। তারমানে, রানা ধরে নিচ্ছে, মারভিন লংফেলো বা রাহাত খান আগে থেকেই জানেন যে মারাত্মক ভাইরাস বা টক্সিক কেমিকেল ওখানে নেই।

রানার জানার কোন উপায় নেই, এক যুগও পেরুবে না, নরক থেকে উঠে আসবেন কর্নেল কুরুনভ, পাঁজরে বেঁধা বিষাক্ত কাঁটার মত কষ্ট দেবেন ওকে, ফেলে দেবেন আরও ভয়ঙ্কর কোনও বিপদে।

তিন

রানা ভাবছে, দক্ষিণ ফ্রান্সের চেহারা অনেক বদলে গেছে। ট্যুরিস্ট মওসুমে সেন্ট-ট্রোপেজ থেকে ইটালিয়ান বর্ডার পর্যন্ত কোস্টলাইনে ট্রাফিক জাম নতুন কিছু নয়। তবে নিস-এর প্রমানাড দে অ্যাঙ্গলাইস কয়েক বছর আগেও অনেক নিরিবিলি ছিল। ইদানীং এদিকটায় গাড়ি আর ট্যুরিস্ট বাসের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে গোটা ব্যাপারটাকে মন্থরগতি পিঁপড়ের মিছিলের সঙ্গে শুধু তুলনা করা চলে। দেখে মনে হবে ঠিক যেন শেষ বিকেলের প্যারিস।

উনিশ শো পঁচানব্বুই সাল, গ্রীষ্মের শুরু। এই মুহূর্তে লোকজনের ভিড়, ট্রাফিক জাম, জ্বালাময়ী ধোঁয়া বিরক্ত করছে রানাকে একযোগে। পরিবেশ দূষণ শুধু শহরে নয়, সাগরের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এককালে স্বর্গ নামে

পরিচিত এলাকাটাকে গ্রাস করেছে কলুষ।

একটা অ্যাসটন মার্টিন ডিবিফাইভ চালাচ্ছে রানা, ভিড় আর কোলাহল নিচে ফেলে উঠে এসেছে পাহাড়ে, এ মুহূর্তে চুলের কাঁটার মত একটা বাঁক ঘুরছে। কোস্টলাইন ধরে যতগুলো রাস্তা এগিয়েছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে উঁচু, আল্‌প্‌স্‌মেরিটাইম্‌স্‌-এর গোড়া থেকে যার শুরু। সাপ যেমন এঁকেবেঁকে এগোয়, এই রাস্তাটাও এগিয়েছে সেভাবে। কখনও পাহাড়ের ঝুলে থাকা পাথরে নেমে এসেছে, কখনও ঢুকে পড়েছে পাথর ভেঙে তৈরি করা টানেলে। এই রাস্তায় লোকজনের ভিড় নেই, নেই ট্রাফিক জাম, অথচ বহুদূর পর্যন্ত কোস্টলাইন ও সাগরের মন ভোলানো দৃশ্য দেখা যায়।

নিচের রাস্তায় থাকার সময় গাড়ি চালাবার আনন্দ ভুলে ছিল রানা, ভুলে ছিল পাশে বসা সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য সুখ। 'কি হচ্ছে এটা?' একটা মাত্র প্রশ্নে সব আবার ফিরে এল, মনের বিরক্ত ভাব দূর হয়ে গেল এক নিমেষে। মনীষাকে দেখে মনে হয় না সহজে ভয় পাবার পাত্রী সে, তবে সামনে সরল পথ পেয়ে যখনই গতি বাড়াচ্ছে ও, প্রতিবার তার নার্ভাসনেস টের পাচ্ছে। কথা খুব কম বলে মনীষা, তার সব কথাই খুব স্পষ্ট, উচ্চারণ শুদ্ধ ও মার্জিত, হাবভাবে ইতস্তত কোন ভাব নেই।

'মানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'জানতে চাইছি, এত জোরে গাড়ি চালাবার সত্যি কি কোন দরকার আছে?' রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে আবার রাস্তার সামনে চোখ রাখল মনীষা, কারণ সামনের বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথে চলে আসছে একটা ট্রাক, অ্যাসটন মার্টিনকে যতটুকু জায়গা ছাড়া দরকার তার বেশিরভাগই নিজের দখলে রাখছে।

থার্ড গিয়ার দিল রানা, দুটো গাড়ি পরস্পরকে নিরাপদেই পাশ কাটাল, পাশ কাটানোর সময় মাঝখানে ফাঁক থাকল ইঞ্চিখানেকের মত। 'গতি, বুঝলে সুন্দরী, মানবজাতির জন্যে অল্প যে-ক'টা অ্যাফ্রোডিসিয়াক অবশিষ্ট আছে তার একটা।' মনীষার দিকে তাকাল ও, ঠোঁটে দুষ্ট হাসি ফুটে ওঠায় চেহারায় গম্ভীর বা নিষ্ঠুর ভাবটুকু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে, চোখের কালো তারায় কিসের যেন ঝিলিক।

'অ্যাফ্রোডিসিয়াকের মানে জিজ্ঞেস করোনি, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল মনীষা। 'তোমাকে জানিয়ে রাখতে আপত্তি নেই যে আমার পছন্দ কোমল আলো, সফট মিউজিক আর শ্যাম্পেন—শুধু এগুলোই জাগিয়ে তোলে আমাকে। আমি উগ্রতা পছন্দ করি না।'

'জানা থাকল।'

'রানা, যে-কোন মেয়ের মত আমিও জোরে গাড়ি চালানো উপভোগ করি, কিন্তু...।'

'ওদিকে ব্যাপারটা কি ঘটছে বলো তো?' উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা ফেরারির দিকে ঘুরে গেল রানার মাথা। ফেরারি ৩৫৫, এইমাত্র পিছন থেকে অ্যাসটন মার্টিনের পাশে চলে এসেছে, বিদ্রূপ মেশানো হাসি লেগে রয়েছে ড্রাইভারের ঠোঁটে।

ড্রাইভার মেয়েটার চেহারায় জিপসি সুলভ একটা ভাব সহজেই নজর কাড়ে।

সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল সে, তারপর গতি বাড়িয়ে ওদের সামনে চলে গেল।

'কে ওই আগুন?' বিস্মিত হয়েছে মনীষা, একটা হাত তুলে রানার বাহু ছুঁয়ে দিল, তবে আঙুলগুলো ওর গায়ে কিলবিল করল না বা থেকেও গেল না। যেন হঠাৎ খেয়াল হতে হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিল মনীষা। তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'অসম্ভব সুন্দরী, তাই না?'

'কি করে বলব কে,' জবাব দিল রানা, মনীষার দিকে তাকাল না। 'তবে হ্যাঁ, আগুনই বটে।'

'লেজও নাড়ছে,' বলল মনীষা। 'অবশ্যই তোমাকে উদ্দেশ্য করে।'

রানা কথা না বলে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। ফেরারির ঠিক পিছনে চলে এল অ্যাসটন মার্টিন।

'সত্যি চেনো না? না চিনলে ওভাবে হাসছিল কেন?'

'শুরু হলো মেয়েলি জেরা,' হাসি চেপে বলল রানা।

'যদি ভেবে থাকো আমি ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছি, ভুল করবে,' বলল মনীষা। 'আমি তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।'

'ধন্যবাদ, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি,' হাসি মুখে বলল রানা।

ফেরারির সঙ্গে একই লাইনে গাড়ি চালাচ্ছে ও, আরেকটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে গতি আবার বাড়াল, ফেরারির দেখাদেখি। পরবর্তী বাঁক ঘোরার সময় একটু পিছিয়ে পড়ল ওরা, সুযোগ পেতেই আবার ফেরারির পিছনে চলে এল। সামনে লম্বা সরল পথ, গতি বাড়িয়ে ইটালিয়ান গাড়িটাকে পিছনে ফেলে দিল রানা।

'রানা, বন্ধ করো এ-সব। তুমি...।'

'মৃত্যুর সঙ্গে খুনসুটি করছি?' ব্রেকে চাপ দিল রানা, সামনে দীর্ঘ ও বিপজ্জনক আরেকটা বাঁক।

'কিছু একটার সঙ্গে করছ,' শুরু করল মনীষা, পরমুহূর্তে কামানের গোলার মত ফেরারিকে সামনে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল।

ড্রাইভার মেয়েটা ওদের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত, তার চোখ রাস্তার ওপর নিবদ্ধ, গভীর মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

গিয়ার নামাল রানা, মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাকসিলারেটার, তারপর আবার গিয়ার তুলল, ফেরারির পিছনে চলে এল অ্যাসটন মার্টিনের নাক। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পথ আগলে থাকার চেষ্টা করল মেয়েটা, ডান দিক থেকে ঝট করে সরে গেল বাম দিকে। রানা ভান করেছিল বাম দিক দিয়ে পাশ কাটাবে, ডান দিক খালি পেয়ে কাজে লাগাল সুযোগটা। আবার পিছনে পড়ল ফেরারি। তবে পাশ কাটানোর সময় সাংঘাতিক একটা বিপদ ঘটতে গিয়েও ঘটল না। রাস্তার কিনারায় একটুর জন্যে ঝুলে পড়েনি একদিকের চাকা। পড়লে এতক্ষণে সাতশো ফুট খাদের তলায় পৌঁছে যেত ওরা।

'রানা, এ-সব বাদ দাও!' এবার মনীষার গলায় কর্তৃত্বের সুর।

'একটু মজা করলাম। এরকম থ্রিল কোথায় পাবে তুমি? চারদিকে কত সুন্দর সব দৃশ্য, তার ওপর আবহাওয়াটাও দারুণ।'

রানা। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে গত পাঁচ বছরে তোমার উন্নতি অবনতি কি দাঁড়িয়েছে তা মূল্যায়ন করতে। তুমি কি চাও, বসের কাছে আমি রিপোর্ট করি...' আবার আঁতকে উঠল মনীষা, কারণ ওভারটেক করার জন্যে পাশে চলে এসেছে ফেরারি।

এবার সামনে এগোতে মেয়েটাকে বাধা দিল রানা। দুটো গাড়ি পাশাপাশি ছুটল, কেউ পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। এভাবে যে বেশিক্ষণ চলতে পারে না, সেটা স্পষ্ট–সামনে ডান হাতি বাঁক।

রানা ও মেয়েটা, দু'জনেই ট্যুরিস্ট বাসের ফ্ল্যাশিং লাইট দেখতে পেল, হর্নও শুনতে পেল, তবে রানা দেখল মেয়েটার চেয়ে এক পলক আগে।

মনে হলো মুহূর্তটি স্থির হয়ে গেছে। ফেরারির সরাসরি সামনে ঝুলে থাকল প্রকাণ্ড বাসটা।

দাঁতে দাঁত পিষছে রানা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে কি যেন বলছে, গিয়ার বদলে চাপ দিচ্ছে ব্রেকে। কোন অঘটন না ঘটিয়ে গতি কমাল ও, পিছিয়ে পড়ে সামনে এগোবার জায়গা ছেড়ে দিল ফেরারিকে। 'লেডিস ফার্স্ট,' কৌতুক করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হলো পুরোপুরি।

'গাড়ি থামাও!' কঠিন সুরে বলল মনীষা। 'আই মীন ইট, রানা। স্টপ দিস কার অ্যাট ওয়ান্স!'

'ইয়েস, ম্যা'ম।' ব্রেক কষে রাস্তার মাঝখানেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা, পোড়া রাবারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। পাশেই একটা পাহাড়প্রাচীর, চূড়ার ওপর বিশাল একটা ট্যুরিস্ট ভিলা। 'মেনে নিলাম, মনীষা। ফিমেল অথরিটি নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই, আশা করি আমার মূল্যায়ন রিপোর্টে কথাটা তুমি উল্লেখ করবে।' ওর একটা হাত কনসোলের দিকে এগোল, আঙুলের চাপ পড়ল একটা সুইচে। ড্যাশ বোর্ডের নিচের একটা অংশ পিছিয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল শ্যাম্পেনের একটা বোতল ও দুটো গ্লাস। 'ওখানে সাধারণত অস্ত্র থাকে।' মনীষার চোখে চোখ রেখে হাসল ও। 'তবে, তুমি আসছ শুনে...।'

'ভেবে পাই না তোমাকে নিয়ে কি করব আমি!' অসহায় ভঙ্গি করল মনীষা। 'তুমি কি চাও, এই কথাটাও রিপোর্টে উল্লেখ করি? লিখব আমাকে প্লীজ করার জন্যে...'

হাতজোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করল রানা। 'প্লীজ! চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম। তবে মনে রেখো, গাড়িতে বসে ও-সব খাওয়া আমি পছন্দ করি না।'

আবার সুইচ টিপে বোতল ও গ্লাস গায়েব করে দিল রানা। 'অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে–ঠিক আছে?'

'তুমি আসলে বিপদে পড়তে ভালবাস, তাই না? তা না হলে এই বিপজ্জনক চাকরির ওপর এত কেন মায়া?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মনীষা, এ তোমার অন্যায়। তুমি দেশপ্রেমের কথা একদম ভুলে যাচ্ছ। ভুলে যাচ্ছ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন নামে যে নীতির

কথা বলা হয় তা পালন করার লোক এখনও আছে দুনিয়ার বুকে।'

'যেমন, মাসুদ রানা?'

'যেমন মাসুদ রানা।'

'শুনে খুশি হলাম,' আন্তরিক সুরে বলল মনীষা। 'সত্যি খুশি হলাম।' রানার দিকে ঝুঁকে হালকা একটা চুমো খেলো মনীষা। 'তোমরা আছ বলেই সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে দেশটা এখনও টিকে আছে।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। শেষ বিকেলের উত্তাপে বহু দূরে মোনাকো শহরটা কাঁপছে, হারবারে সারি সারি নোঙর ফেলেছে কয়েকটা মিলিয়ন ডলার ইয়ট। ইচ্ছে হলো এক ছুটে ওখানে চলে যায়, বেরিয়ে পড়ে খোলা সাগরে। গত একটা বছরের কথা মনে পড়ল ওর, কাজের চাপে দম ফেলারও অবসর পায়নি। মনটা বিদ্রোহ করে উঠতে চাইলেও, হাতে এত কাজ ছিল যে ছুটির দরখাস্ত করার সময় জানত ওটা মঞ্জুর করা হবে না। ছুটি পাবে না, তাই ছুটি কাটানোর কোন প্ল্যান করেনি ও। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো, তিন মাসের ছুটি দেয়া হয়েছে। ফ্রান্সের কয়েকটা বন্দর শহরের নাম জানিয়ে দেয়া হলো, শুধু এই সব জায়গায় বেড়ানো যাবে।

ছুটি শুরু হবার আগে লণ্ডনে ছিল রানা, লণ্ডন থেকে হুট করে বেরিয়ে পড়েছে। মাঝপথে জুটেছে মনীষা, বিসিআই-এর ইভ্যালিউয়েট অফিসার। তাকে রানা আগে থেকেই চেনে, বছরে দু'একবার দেখা হয়। সুন্দরী না বলে সুশ্রী বলাই ভাল তাকে, তবে অফিসার হিসেবে খুবই দক্ষ। যে ধরনের ঘনিষ্ঠতা থাকলে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয় সে-ধরনের ঘনিষ্ঠতা কোন কালেই ছিল না ওদের মধ্যে। দূর থেকে রানার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে মনীষা, বলা যায় এটা তার একটা শখই। দেখা হলে সে-সব তথ্য কিছু কিছু প্রকাশ করে সে, রানার বিস্ময় উপভোগ করে। মেয়েটার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, এ প্রশ্ন রানার মাথায় এলেও মনীষাকে বাজিয়ে দেখার সুযোগ বা সময় আগে কখনও পায়নি রানা। আজ দুটোই নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, কিন্তু কেন যেন আগ্রহ বোধ করছে না ও। এর জন্যে সম্ভবত মনীষার আচরণই দায়ী। ওর প্রতি যতই শ্রদ্ধাবোধ থাকুক মেয়েটার মনে, তার সংযত ও মার্জিত ব্যবহারই বলে দেয় যে রানা হাত বাড়ালেও সুবিধে করতে পারবে না। কে জানে, সেজন্যেই হয়তো আগ্রহ বোধ করছে না রানা।

ক্যাসিনোর পার্কিং এরিয়ায় অ্যাসটন মার্টিন পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ ফেরারিটা দেখতে পেল রানা। পাহাড়ী পথে একটা মেয়ের সঙ্গে বিপজ্জনক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল, এ-কথা মনেই ছিল না ওর। কারণ, মন জুড়ে রয়েছে শুধু মনীষা। নিস এয়ারপোর্টে বিদায় নেয়ার সময় ওকে ওভাবে আলিঙ্গন করল কেন মনীষা? এই ভাবাবেগের পিছনে কি শুধু শ্রদ্ধা, নাকি অন্য কিছুও আছে? ও কি সত্যি মনীষার চোখে পানি দেখেছে?

ফেরারিটাকে দেখে কৌতুক বোধ করল রানা, ভাবল শখের জুয়া খেলাটা আরও একটু বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

গোল্ডেন এগ ক্যাসিনোর প্রবেশ পথে সুবেশী ডিউটি ম্যানেজার উপস্থিত, অনেক দিন পর দেখলেও রানাকে চিনতে পারল সে। ছোট্ট বাউ করল, নামের সঙ্গে স্যার বলে সম্বোধন করল। সেই সঙ্গে জানাল, আজ সন্ধ্যায় সত্যিকার উত্তেজনা পাওয়া যাবে ব্যাকেরা টেবিলে।

ভেতরে ঢোকার পর দেখা গেল খেলাটা অনেকেই ভিড় করে দেখছে, সবার মনোযোগ উদ্ভিন্নযৌবনা সেই তরুণীর ওপর, আজ বিকেলে পাহাড়ী পথে যে ওকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। দূর থেকে মেয়েটাকে ভালভাবে লক্ষ করল রানা। অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'বার দেখা হয়ে গেল। এর মধ্যে কি নিয়তির কোন ইঙ্গিত আছে? প্রশ্নটা তেমন গুরুত্ব পেল না, তবে ঝেড়ে একেবারে ফেলেও দিল না রানা।

সাধারণ একটা কালো ড্রেস পরেছে মেয়েটা, গলায় একটা ডায়মণ্ড চোকার। হীরাগুলো খাঁটি হতে পারে, চেহারা ও আচরণ দেখে মিলিয়ন ডলার পুতুল বলেই মনে হয় তাকে। খেলা থেকে মুখ তুলে মাঝে মধ্যেই ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছে সে, তবে কারও ওপরই স্থির হচ্ছে না দৃষ্টি, শুধু দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। জিপসি সুলভ কিছুটা বুনো দৃষ্টি, খেয়াল করল রানা। ঘন কালো চোখের এই দৃষ্টি পাহাড়ী পথে প্রথমবারই লক্ষ করেছে ও। চোখ কালো, চুলও কালো। গায়ের চামড়া হলদেটে ও মসৃণ। হাই চীক বোন, খাড়া নাক, চওড়া মুখ–সব মিলিয়ে সত্যি আগুন।

এই মাত্র জিতেছে মেয়েটা, ক্রুপিয়েই লোকটা একগাদা চিপস ঠেলে দিল তার দিকে। মেয়েটা হাত বাড়ায়নি, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল তার অন্যান্য চিপসের সঙ্গে ওগুলোও যেন সাজিয়ে রাখা হয়। নির্দেশ পালন করল লোকটা। মেয়েটার সামনে চিপসের রীতিমত একটা পাহাড় তৈরি হয়েছে।

তার পাশে ছোটখাট এক জাপানী ভদ্রলোক বসে আছেন। মাথা নাড়লেন তিনি, শুদ্ধ উচ্চারণে ও স্পষ্ট ইংরেজিতে বললেন, এত বড় স্টেকে খেলা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। ঘেমে গেছেন তিনি, টাইয়ের নট ঠিক করার সময় হাত কাঁপছে। ভিড়ের ওপর চোখ বুলাল ক্রুপিয়েই, জানতে চাইছে মেয়েটার সঙ্গে কেউ খেলতে চায় কিনা। চারজন পুরুষ ও একটা মেয়েকে দেখে মনে হলো, এতক্ষণ খেলছিল তারাও, সবাই প্রায় একযোগে মাথা নাড়ল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ টেবিলে শুধু সুন্দরীর চিপস দেখা যাচ্ছে, আর কারও সামনে কিছু নেই। চিপসগুলো দেখে রানার মনে হলো, এক লাখ পাউণ্ডের বেশি হবে তো কম নয়।

একেবারে শেষ মুহূর্তে কথা বলল রানা, 'আছি।' ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ল ও, মেয়েটার মুখোমুখি খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল।

নড করল মেয়েটা, জবাবে রানাও। পকেট থেকে চিপস বের করে নিজের সামনে সাজাল ও। নিজের স্তূপ থেকে কয়েকটা চিপস টেবিলের মাঝখানে রাখল মেয়েটা। সমপরিমাণ রাখল রানাও।

স্যাবো থেকে দুটো কার্ড ঠেলে দিল মেয়েটা রানার দিকে। স্যাবোকে শূ বা জুতোও বলা হয়।

কার্ড দুটো তুলে দেখল রানা। ভাল কিছু নয়–একটা লাল দুই আর একটা

কালো পাঁচ। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'দেখা যাচ্ছে আমাদের নেশাগুলো মিলে যায়। মানে, অন্তত তিনটে আর কি...' মাথা নেড়ে তৃতীয় কার্ডটা নিতে অস্বীকার করল।

মেয়েটা কথা বলল নরম, খসখসে গলায়। ভাষাটা ইংরেজি, তবে উচ্চারণ ভঙ্গিটা ইংরেজদের নয়, অন্য কোন এলাকার টান আছে। ভুরু সামান্য কুঁচকে চিন্তা করছে রানা, কোথাকার বাচন ভঙ্গি? কানে এখনও লেগে রয়েছে মেয়েটার কথাগুলো, 'নেশা বলতে আমার মাত্র দুটো। মোটরিং আর ব্যাকেরা।'

ইঙ্গিত করল রানা, মেয়েটা তার কার্ড দেখাল। দেখে রানা অবাক হলো না– একটা টেক্কা ও একটা সাত। 'আ ন্যাচারাল এইট।'

'এবার স্যার আপনি আপনার কার্ড দেখান,' অনুরোধ করল ক্রুপিয়েই।

রানা টের পেল, দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ও জানে, ব্যাকেরা এমন একটা তাস খেলা, যে খেলায় কৌশল বা দক্ষতার কোন ভূমিকা নেই, স্রেফ ভাগ্য মানুষকে জেতায় বা হারায়। কথা বলে শুধু কার্ড।

নিজের কার্ডগুলো টেবিলে ছুঁড়ে দিল রানা, দেখল ওর চিপসগুলো ঝেঁটিয়ে সব সরিয়ে নিল ক্রুপিয়েই।

'তোমার বোধহয় তৃতীয় নেশা নিয়ে পড়ে থাকা উচিত, ওটাতে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারে,' বিদ্রূপ করল মেয়েটা।

'যে কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমি প্রস্তুত।' হাসল রানা, দেখল ওর চিপসগুলো মেয়েটার স্তূপে সাজিয়ে রাখছে ক্রুপিয়া।

হাসল মেয়েটাও। বলল, 'দ্বিগুণ?'

'না,' বলে মাথা নাড়ল রানা। 'চার গুণ।'

কিন্তু প্রথমবার হারার পর রানার কাছে অত চিপস নেই। হেড ক্রুপিয়েই বসে আছে উঁচু একটা চেয়ারে, ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল ক্রুপিয়েই। সে এমন কি ডিউটি ম্যানেজারের দিকেও তাকাল একবার। হেড ক্রুপিয়েই ও ডিউটি ম্যানেজার, দু'জনেই ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল যে রানাকে ধার দিতে অসুবিধে নেই।

আগ্রহ ও উৎসাহে চকচক করে উঠল মেয়েটার চোখ। সে কি চিন্তা করছে বলে দিতে পারে রানা–লোকটা কি আসলেই বোকা, নাকি সত্যিকার ধনী?

মাথা ঝাঁকিয়ে কার্ড বাঁটল মেয়েটা।

নিজের কার্ড দেখল রানা, তারপর তৃতীয় কার্ড চাইল।

ওর দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, যেন সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে। তারপর সে তার কার্ড উল্টো করল। একটা পাঁচ ও একটা রানী। এরপর সিধে করা একটা কার্ড দিল রানাকে–ছয়।

'দেখান, প্লীজ,' রানাকে অনুরোধ করল ক্রুপিয়েই।

রানা দুটো ছবি দেখাল–একটা রাজা ও একটা গোলাম।

'সিক্স,' ক্রুপিয়েই থমথমে গলায় বলল, 'দা ব্যাংক লুজেস।' ছড়ি দিয়ে সমস্ত চিপস রানার দিকে ঠেলে দিল সে।

সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা, ভাবটা যেন খেলতে গেলে হারজিত

আছেই। টেবিল ছাড়ার জন্যে দাঁড়াল সে, আরেকবার মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে, বলল, 'টাকা জিনিসটা উপভোগের জন্যে, যতক্ষণ আছে খরচ করো।'

'কেউ সঙ্গে থাকলে তবেই না টাকা খরচ করে মজা,' রানার কথায় পরিষ্কার আমন্ত্রণ।

হেসে উঠে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল মেয়েটা, তার দৃষ্টিতে একটু যেন তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল। মুখের হাসি হঠাৎই দপ করে নিভে গেল। ঘুরল সে। হেঁটে চলে যাবার সময় একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

মেয়েটার পা ফেলার ভঙ্গি বিড়ালের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। নরম পদক্ষেপ, ব্যস্ততার কোন ছাপ নেই, একটা গন্তব্যের দিকে উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটছে।

এক মুঠি চিপস তুলে গুণল না রানা, ছুঁড়ে দিল ক্রুপিয়ার দিকে। এটা এখানকার রীতি। ইঙ্গিতে জানাল, ওর সব চিপস যেন হেড ক্রুপিয়েই ক্যাশ করে রাখে। তারপর টেবিল ছেড়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল ও। এক সময় ক্যাসিনোর 'কিচেন' নামে পরিচিত একটা এলাকায় ঢুকে পড়ল। এখানে কালো টাকার খেলা হয়, পাশেই রয়েছে বার।

খালি একটা টেবিলের দিকে এগোচ্ছে মেয়েটা, পিছন থেকে তার পাশে চলে এল রানা। 'তুমিও বুঝি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করো?' জিজ্ঞেস করল ও। 'টাকা ওড়াও দু'হাতে?'

ঘাড় ফেরাল মেয়েটা, রানাকে দেখে কুঁচকে উঠল ভুরুজোড়া। 'কি? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি আবার এগিয়ে থাকা অবস্থায় ক্ষান্ত হতে জানি।'

'আমিও তো, যদিও কৌশলটা কোনদিনই ভালভাবে রপ্ত করতে পারিনি।' একজন ওয়েটারকে ডাকল রানা। 'আমার জন্যে একটা ভদকা মার্টিনি—ঝাঁকাবে নাড়বে না। আর তোমার জন্যে?'

'আমার জন্যে?' মেয়েটাকে ইতস্তত করতে দেখা গেল।

'পথে-ঘাটে মানুষের পরিচয় হয় না? তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করে না?' রানা হাসছে।

'ঠিক আছে।' জোর করে একটু হাসল মেয়েটা। 'আমার জন্যে…ঠিক আছে, ওই একই জিনিস। ভদকা আমার পছন্দ, তবে এক্সপার্টরা বলেন এটা ঠিক নয়।'

'এক্সপার্টরা সব সময় ঠিক কথা বলেন না।'

ওদের অর্ডার পুনরাবৃত্তি করল ওয়েটার, তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল তার মার্টিনি কিভাবে চায় সে।

'স্ট্রেইট আপ, উইথ আ টুইস্ট,' জবাব দিল মেয়েটা। ওয়েটার চলে যেতে রানার দিকে তাকাল সে। 'ধন্যবাদ, মি…'

'নামটা রানা। মাসুদ রানা।'

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল মেয়েটা, হ্যাণ্ডশেক করল রানার সঙ্গে। 'ওলগা পলিয়ানা।'

'পলিয়ানা?'

'পলিয়ানা।' মাথা ঝাঁকাল সে।

'আর বাচনভঙ্গি? আমি কি···জর্জিয়ান কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম?'

'দারুণ, রানা। দেখা যাচ্ছে দুনিয়াদারির খবর রাখো তুমি। হ্যাঁ, জর্জিয়ান।'

রানার মাথার ভেতর এক কোণে বিপদ সঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে। মেয়েটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। তার বাচন ভঙ্গি নির্ভেজাল মস্কোবাসীদের সঙ্গে মিলে যায়। সন্দেহ নেই মস্কোয় ইংরেজি শিখেছে সে, জন্মের পর ওখানেই বড় হয়েছে। শিখেছে কোন স্কুলে। নাকি কেজিবিতে?

ওয়েটার ফিরে না আসা পর্যন্ত কথা বলল না পলিয়ানা। সার্ভ শেষ হতে জানতে চাইল, 'তুমি কি রাশিয়ায় কখনও গেছ?'

'বেশ কিছুদিন হলো যাওয়া হয়নি। তবে এক সময় যেতাম। সাধারণত প্লেনে করে যেতাম, কাজ সেরে আবার ফিরে আসতাম। মানে, রাশিয়াকে ভালভাবে চেনার সুযোগ হয়নি আর কি।'

'এখন দেশটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সত্যিকার অর্থে সুযোগ-সুবিধের উৎস বলতে পারো।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনছি বটে। সত্যি নাকি, প্রতিটি গ্যারেজে একটা করে নতুন ফেরারি?'

ছোট্ট করে হেসে উঠল পলিয়ানা। উদ্দেশ্য ছিল কানে জলতরঙ্গের মধু বর্ষণ করবে, কিন্তু জলাধার পাত্রটি ফাটা বলে মনে হলো। 'ফেরারি। ওটা আসলে আমার এক বন্ধুর।'

'তাহলে তোমার বন্ধুকে একটা টিপ দিই, যদি অনুমতি দাও। চলতি বছরের মডেলে ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার শুরু হয়েছে এল অক্ষরটা দিয়ে, এমনকি জালগুলোও।'

পলিয়ানার কালো চোখের গভীরে কি যেন একটা নড়ে উঠল, এত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে রানার ভুলও হতে পারে। 'তাহলে তো জানতে হয় মোটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্টের কোন পদে আছ তুমি!'

'ডিরেক্টর।'

'আচ্ছা।' পলিয়ানা তাকিয়ে আছে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে দূরে কোথাও। কাউকে লক্ষ করে হাসছেও সে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে তাকাল রানা। দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে। আনুষ্ঠানিক ইউনিফর্ম পরে আছেন। ইউএস নেভির একজন অ্যাডমিরাল। তাঁর মুখ যেন রোদে পোড়া শক্ত লেদার দিয়ে তৈরি, সেখানে ঝড়-ঝাপ্টার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে আছে। রানা জানে, এ-ধরনের চেহারা মেয়েরা খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোকের হাঁটার মধ্যে পরিচিত একটা ভঙ্গি আছে, মনে করিয়ে দেয় প্রতিটি জাহাজের ব্রিজে নৌ অফিসাররা এভাবেই হাঁটেন। তার মধ্যে সৌখিন একটা ভাব লক্ষ করার মত। কৃতিত্বটা সুন্দর করে ছাটা দাড়িরও হতে পারে। ভদ্রলোককে রানার কৌতুকপ্রিয় বলে মনে হলো না, হাসি হাসি ভাবটুকু অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়। চোখ দুটো ধোঁয়াটে, দূর দিগন্তে বছরের পর বছর তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওগুলো যেন স্থির হয়ে গেছে বা মরে গেছে।

'তুমি রেডি, পলিয়ানা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, রানাকে গ্রাহ্যই করলেন না।

মিষ্টি করে হাসল পলিয়ানা। 'ইনি একজন অ্যাডমিরাল। অ্যাডমিরাল কপারফিল্ড, ডিরেক্টর রানা।'

রানার সঙ্গে শক্ত হ্যাণ্ডশেক করলেন অ্যাডমিরাল, তবে রানার চোখে ঠিক তাকালেন না। 'ডেভিড কপারফিল্ড, ইউএস নেভি।'

'মাসুদ রানা, রানা এজেন্সি।'

চেয়ার ছাড়ল পলিয়ানা, অ্যাডমিরালের হাতের সঙ্গে নিজের হাতটা সাপের মত পেঁচাল।

'কেউ আমার পদ ধরে সম্বোধন করলে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়,' বলল রানা, হাসছে না।

'ইট'স বীন নাইস মীটিং ইউ, ডিরেক্টর রানা।'

'মাই প্লেজার।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা দু'জন, রানার চেক নিয়ে হাজির হলো হেড ক্রুপিয়েই। 'আজ রাতে আপনি ভাগ্যবান, মি. রানা।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' কি বলছে সেদিকে খেয়াল নেই রানার, পলিয়ানাকে নিয়ে অ্যাডমিরালের বিদায় নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ও। মেয়েটা ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘাপলা আছে কোথাও। ওর বোধহয় হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। তবে পলিয়ানা বা অ্যাডমিরাল কপারফিল্ড সম্পর্কে হেডকোয়ার্টার থেকে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। নাকি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে? ব্যাপারটা জরুরী বলে মনে হচ্ছে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তাতে এমনকি ওর জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

চার

পাথুরে মোনাকার চূড়ায় ছোট চৌরাস্তা, উল্টোদিকে রেনেসাঁ রয়্যাল প্যালেস। কয়েক গজ দূরেই ক্যাথেড্রাল, চৌরাস্তা থেকে অনেকগুলো গলি ভেতর দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব গলিতে ছোটখাট ভাল রেস্তোরাঁ আছে। তাই চৌরাস্তার মত ভেতর দিকেও ট্যুরিস্টরা ভিড় করে।

চৌরাস্তার প্রধান আকর্ষণ প্রাসাদ গার্ডদের পালা বদল। প্রহরীদের মনে হয় নিষ্প্রাণ পুতুল, কিংবা রোবট, শুধু নির্দিষ্ট সময়ে নড়াচড়া করে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসে, মুখ ভেঙচায়, আবার কেউ কেউ সমীহের সঙ্গে স্যালুটও করে। যাই করা হোক, প্রহরীদের চোখের পাতা পর্যন্ত এক চুল নড়ে না। এমন কিছু ব্যাপার নয়, তবু দেখার জন্যে ভিড় করে মানুষ।

সেন্ট্রি বক্সগুলো লাল আর সাদা রঙ করা, প্রহরীদের পোশাকও প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ বহন করে। ট্যুরিস্টরা ব্যাপারটা পছন্দ করলেও, স্থানীয় লোকজন তাদের এই রঙচঙে বাহারী পোশাককে ভালগার বলে গাল দেয়।

চৌরাস্তার যেদিকটায় ভূমধ্যসাগর সেদিকে একটা কামান আছে, পানির দিকে তাক করা। ওখান থেকে হারবার আর মণ্টি কার্লোর ইয়ট বেসিন পরিষ্কারই দেখা যায়।

আজকের এই মখমল রাতে ট্যুরিস্টদের একটা অংশ চৌরাস্তায় নিত্যদিনের মাইম উপভোগ করছে, অপর একটা দল ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হারবারের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দলে রানা থাকলেও, ও শুধু তাকিয়ে নেই।

পা দুটো একটু ফাঁক করে রেখেছে ও, যেন দাঁড়িয়ে আছে কোন যুদ্ধজাহাজের ব্রিজে, চোখে সাঁটা বড় আকৃতির এক জোড়া নাইট গ্লাস।

এগুলো সাধারণ নাইট গ্লাস নয়, সুলতানা পারভিনের উর্বর ডিপার্টমেন্ট এটার আবিষ্কারক। এই মুহূর্তে একজোড়া নরনারীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে রানা। গ্লাসগুলোর ইমেজ কোয়ালিটি এতটা ভাল, যেন ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ও। এই বিনকিউলারের আসল গুণ, ও যা দেখছে তার হুবহু ছবি তোলা যায় এটা দিয়ে। যে ছবি তোলা হয়, তোলার পর সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা কমপিউটার ডিস্কে জমা পড়ে।

নোঙর ফেলা ইয়টগুলোর কাছাকাছি, ক্লোজ আপে দু'জনকে ধরে রেখেছে রানা। একহারা ও হলুদ বরণ ওগলা পলিয়ানা এবং দীর্ঘদেহী অ্যাডমিরাল কপারফিল্ড। অ্যাডমিরালের সঙ্গে বহু আগে নিহত জার নিকোলাসের মিলটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

উপাদেয় ও রহস্যময় উপাদানে ভরপুর পলিয়ানাকে একটা মোটর বোটে উঠতে সাহায্য করছেন অ্যাডমিরাল কপারফিল্ড। ক্যামেরার বোতামে দু'বার চাপ দিল রানা–প্রথমবার অ্যাডমিরালের পুরো মুখ পাবার আশায়, দ্বিতীয়বার পলিয়ানার। সাবধানের মার নেই ভেবে আরও একবার চাপ দিল বোতামে। লঞ্চটার ওপর ফোকাস ঠিক করার জন্যে সামান্য একটু সরে দাঁড়াল রানা, লঞ্চের নামটা, মিডনাইট সান, স্পষ্টভাবে ক্যামেরায় বন্দী করতে চায়।

জেটি থেকে রওনা হলো লঞ্চ, পিছনে সাদা ফেনা ছড়িয়ে হারবারে নোঙর করা অত্যন্ত দামী একটা ইয়টের দিকে যাচ্ছে। লঞ্চের পিছন দিকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, পলিয়ানার সরু কোমরটা একহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন অ্যাডমিরাল, তাঁর কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে পলিয়ানা। বয়েসে একদমই মেলে না, অথচ প্রেমিক-প্রেমিকার মত আচরণ করছে ওরা। তবে বেমানান বলা যাবে না, এধরনের দৃশ্য ইউরোপে অহরহ দেখা যায়।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, ইনশোর আর হারবারে নোঙর ফেলা অন্যান্য জলযানগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল। ওগুলোর মধ্যে একটা ফরাসী যুদ্ধজাহাজও রয়েছে। ফ্রেঞ্চ ওঅরশিপের স্টার্ন প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছে বড় আকৃতির একটা হেলিকপ্টার। ছায়ার ভেতর সেটাকে গাঢ় আর ভীতিকর লাগল রানার।

ওর মনের গভীরে কি যেন একটা নড়ে উঠল, তলা থেকে ভেসে উঠতে চেষ্টা করে আবার তলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সেটাকে তুলে আনতে ব্যর্থ হলো

রানা, ভাবল পরে মনে পড়বে। কোন কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে না পড়লে ধরে নিতে হবে এই মুহূর্তে সেটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তাছাড়া, চিন্তা করার সময় কোথায়, হাতে এখন অনেক কাজ।

পাহাড় চূড়া থেকে নিচে নামতে দশ মিনিট লাগল রানার, আরও পাঁচ মিনিট হেঁটে চলে এল ডিবিফাইভের কাছে। সগর্জনে মোনাকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার, যাচ্ছে নিচু পাহাড়শ্রেণীর দিকে।

এক সময় প্রাচীন গ্রাম লা টারবির নিচে থামল গাড়ি, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রোমান ধ্বংসাবশেষ আর মনুমেন্ট। এখান থেকেই, ওকে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ভাল রিশেপসন পাবার কথা।

রেডিও অন করে দ্রুত হাতে বিনকিউলার থেকে কমপিউটর ডিস্ক খুলে নিল রানা; ঢোকাল সিডি প্লেয়ারের ভেতর, তারপর প্রিসেট রেডিও বাটনে চাপ দিল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, ডিস্কের ডাটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে লণ্ডনে পৌঁছে যাচ্ছে।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার বা বিএসএস হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে নয়, রানা যোগাযোগ করছে ওর এজেন্সির লণ্ডন শাখার সঙ্গে। মেসেজ পাঠাতে সময় লাগল প্রায় দশ মিনিট। এজেন্সির আবাসিক প্রতিনিধি কথা বলল, তার নাম রীতি। প্রথমেই সে জানাল, কোন একটা কাজে লণ্ডনে এসেছেন বস্, তবে এজেন্সির অফিস ভিজিট করার কোন পরিকল্পনা তাঁর নেই। না, রানা সম্পর্কে কাউকে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তবে রানা যে মেসেজ পাঠাচ্ছে, বিসিআই লণ্ডন শাখাও সেই মেসেজ একই সঙ্গে রিসিভ করছে।

তারপর কাজের কথায় চলে গেল রীতি, আটটা স্পীকারের মাধ্যমে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ভেসে আসছে গাড়ির ভেতর, একই সঙ্গে সিডি পট থেকে রঙিন ফ্যাক্সও বেরিয়ে আসছে।

প্রথমে পলিয়ানার ছবি প্রসঙ্গে বলল রীতি। সে কথা বলছে দ্রুত, একটু যেন হাঁপাচ্ছে। 'আইডি কনফার্মড। পলিয়ানা, ওলগা। সাবেক সোভিয়েত ফাইটার পাইলট। এক বছর কাজ করে, একানব্বুই সালের ক্যু পর্যন্ত–কেজিবির সাধারণ একজন পাইলট হিসেবে। ইদানীং সন্দেহ করা হচ্ছে রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেটের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

এরপর দ্বিতীয় ছবি সম্পর্কে বলল রীতি, 'আইডি কনফার্মড। রিয়ার অ্যাডমিরাল ডেভিড কপারফিল্ড, ইউএস নেভী। তাঁর ক্যারিয়ার গড়ে উঠেছে ন্যাভাল হেলিকপ্টার চালানোর দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে। ক্যারিয়ারে একমাত্র খুঁত বলতে মেয়ে ঘেঁষা বলে গুজব। উনিশশো তিরানব্বুইয়ে একটা স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, ঘটনাটা নেকহক স্ক্যাণ্ডাল নামে পরিচিতি পায়। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় কোথাও নিন্দিত হননি। এখন ইউএস নেভির বহু অফিসারের সঙ্গে মোনাকায় আছেন টপ সিক্রেট একটা প্রদর্শনী বা মহড়ায় অংশগ্রহণ করার জন্যে।'

সবশেষে মোটর লঞ্চ মিডনাইট সান প্রসঙ্গ।

'ইয়ট, মিডনাইট সান। রবিন হুড করপরেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান ওটা লিজ নিয়েছে। একটু অপেক্ষা করো, প্লীজ, বিসিআই লণ্ডন ব্রাঞ্চ তোমাকে মেসেজ

দিতে চায়।'

মাত্র-কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো রানাকে, তারপর আবার রীতির গলা শুনতে পেল ও, 'বস্ বলছেন, সাবজেক্ট পলিয়ানার ওপর নজর রাখতে হবে তোমাকে। তবে, কোন অবস্থাতেই, রিপিট, কোন অবস্থাতেই তাঁর ব্যক্তিগত অনুমতি ছাড়া কনট্যাক্ট করা যাবে না।'

রীতি কনট্যাক্ট শব্দটা এমন সুরে উচ্চারণ করল, যেন আরও তাৎপর্যপূর্ণ কোন বিষয়ের কোড ওয়ার্ড ওটা। রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট, রানা জানে, রুশ মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সোভিয়েত রাশিয়া ধসে পড়ার সময়। কিংবদন্তীর রবিন হুডের একটা মহান আদর্শ ছিল, আধুনিক রুশ সংস্করণ সে-সবের ধার ধারে না। ড্রাগ, অবৈধ অস্ত্র, নারীব্যবসা, গোল্ড স্মাগলিং, এমন কোন অপরাধ নেই যা ওরা করে না। নতুন রাশিয়ায় এখন গুণ্ডামি-পাণ্ডামিই সবচেয়ে বড় ব্যবসা।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, মিডনাইট সানে একবার যাওয়া দরকার ওর। ভাবা সহজ, কাজটা কঠিন। তবে কঠিন কাজেই ওর উৎসাহ বেশি।

*

মিডনাইট সানের মেইন স্টেটরুমটা বিশাল, ওটার ডিজাইন করা হয়েছে বিশেষভাবে ফিজিকাল প্লেজারের কথা মনে রেখে। কেবিনটা তো বড়ই, লাগোয়া বাথরুমটাও ছোট নয়—বাথটাবটাকে খুদে সুইমিং পুল বললে অত্যুক্তি হবে না। দেয়ালে, নাগালের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির শেলফ, সেগুলোতে সাজানো আছে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের তেল ও অয়েন্টমেন্ট ভর্তি রঙিন বোতল। তার মধ্যে একটা তেল, সরাসরি বোতল থেকে খাওয়া যায়, বাজারে বিক্রি হয় সেক্সুয়াল এইড হিসেবে, পাওয়া যায় বিভিন্ন ফ্লেভারে। এই তেলটা সাধারণত পার্টনাররা প্রথমে গায়ে মাখে, তারপর জিভ দিয়ে পরস্পরের গা থেকে চেটে নেয়।

কেবিনের দেয়ালে রয়েছে উত্তেজক পেইন্টিং ও ড্রইং। বিছানা থেকে দেখা যায় দেয়ালে বিশাল একটা অয়েল পেইন্টিং, প্রাচীন রোমান এলিটরা দলবেঁধে যৌনকেলীতে মগ্ন। ভেতরে আলো খুব কোমল, মৃদু বাতাসে সুগন্ধ পাওয়া যায়। আড়াল থেকে ভেসে আসে মধুর ও নরম সুর ঝংকার, যেন হাজারটা সূক্ষ্ম সুরেলা তারে হালকা ছোঁয়া লাগছে আঙুলের।

এই মুহূর্তে বিছানার ওপর পলিয়ানার সঙ্গে শুয়ে আছেন অ্যাডমিরাল ডেভিড কপারফিল্ড। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছেন, এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি তাঁর।

স্টেটরুমের দরজা তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, পরিবেশটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে পলিয়ানা। দরজায় তালা দিয়ে ফিসফিস করে জানিয়ে দিয়েছে, কেউ তাদেরকে বিরক্ত করবে না।

নিজের হাতে অ্যাডমিরালকে বিবস্ত্র করেছে সে। ঠেলে ফেলে দিয়েছে বিছানার ওপর। ভাবাবেগ বর্জিত সুরে বলেছে, 'শুধু আজকের এই রাতটা, ডেভিড, আমি চাই তুমি যেমন খুশি মনের সাধ মিটিয়ে উপভোগ করো। যত উদ্ভট সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসীই থাকুক তোমার, সব তুমি আমাকে দিয়ে আজ পূরণ করিয়ে

নিতে পারবে।'

নিজে সে কাপড় খুলছে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে উন্মুক্ত করছে নিজেকে—স্ট্রিপটিজ আর্টিস্টদের মত অশ্লীল ভঙ্গিতে নয়, ব্যালেরিনাদের মত নৈপুণ্য ও পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে। তার প্রতিটি নড়াচড়ায় শিল্পীসুলভ সৌন্দর্য থাকল। অ্যাডমিরালের মনে হলো, তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে পলিয়ানা, যথেষ্ট সময় দিচ্ছে, কষ্টও স্বীকার করছে। আনন্দে, আবেগে আপ্লুত হলেন তিনি।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় হাঁপিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। টের পেলেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। না মিলনানন্দে নয়, কি করে যেন চলে এসেছেন তিনি পলিয়ানার দুই উরুর মাঝখানে, দু পায়ে পেঁচিয়ে ধরে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে সে তাঁর বুকের পাঁজরে।

ককিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। তারপর চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'পলিয়ানা··· না। আমি শ্বাস নিতে পারছি না। আমি···না···।'

পলিয়ানা এখন অ্যাডমিরালের কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। সে তার উরুর পেশী আরও শক্ত করতে ব্যস্ত। এটা বিশাল আকৃতির বোয়া কনস্ট্রিকটর-এর টেকনিক। পলিয়ানা অনুভব করল, অ্যাডমিরালের বুকের হাড় ভাঙতে শুরু করেছে। মট মট করে পাঁজর ভাঙার এই শব্দ যেন মধু বর্ষণ করছে তার কানে।

দম আটকে অ্যাডমিরাল যখন মারা যাচ্ছেন, পলিয়ানা তখন ও-হ্ ই-য়ে-স বলে চিৎকার করে উঠল। এই মৃত্যুফাঁদ সে তার জীবনে বহুবার ব্যবহার করেছে, তার মনিবরা ভাল করেই জানে কি রকম কাজের জিনিস এটা।

আগুপিছু দুলছে পলিয়ানা, গোঙাচ্ছে নরম সুরে, চেহারায় পরিতৃপ্তির রেশ। একটা ঝাঁকি দিয়ে লাশটা ফেলে দিল সে, ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল। দেখে মনে হলো, এইমাত্র একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে।

আর ঠিক তখুনি নক হলো স্টেটরুমের দরজায়।

দরজা খুলল পলিয়ানা, এখনও কাপড় পরেনি। পরিচিত এক লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। 'দা স্পাইডার অ্যাণ্ড দা অ্যাডমিরাল, তাই না?' সহাস্যে কথাটা বলে পলিয়ানাকে আলিঙ্গন করল লোকটা, তারপর এমনভাবে দোল দিতে লাগল, পলিয়ানা যেন ছোট্ট একটা শিশু, অভয় দিচ্ছে বা ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে।

ছোট একটা সেইলিং বোট নিয়ে এরইমধ্যে কোস্টলাইন ধরে রওনা হয়ে গেছে রানা। বোটটা ভাড়া করা হয়েছে দু'দিন আগে, মেজর জেনারেলের প্রতিনিধি মনীষা তখনও ওর সঙ্গে ছিল। তীর ঘেঁষা ভিলা আর বোট একই সঙ্গে ভাড়া নেয় ও। সাগরে বেড়ানোর শখ ছিল মনীষার, যদিও সে-কথা সরাসরি প্রকাশ না করে রানাকে সে নির্দেশের সুরে বলে, 'এ-ধরনের ছোট বোট কি রকম চালাও তুমি আমার তা দেখা দরকার। এ-ব্যাপারে তোমার দক্ষতার অভাব থাকলে আমাকে তা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে হবে।' গভীর রাত পর্যন্ত, বলা যায় পুরো রাতটাই, মনীষাকে নিয়ে সাগরে বেড়িয়েছে রানা। খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়

মেয়েটা, সময়টা কেটেছে ভালই।

আজ সকালে আবার বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রানা। ঘুম ভাঙার পর প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শাওয়ার সেরেছে ও। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ব্যায়াম করেছে। এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় সাধারণত হয় না। কাল সারারাত জেগে ছিল, তাতে কিছু আসে যায় না। ব্যায়াম কখনোই ক্লান্তিকর নয়, বরং ক্লান্তি দূর করে। আধ ঘণ্টা পর মনে হলো শরীরটা তাজা হয়ে গেছে, ফিরে এসেছে হারানো সব শক্তি। এর মধ্যে অবশ্য আধ ঘণ্টার একটা পিচ্চি ঘুমের অবদানও আছে। বহু বছরের অভ্যাস থেকে কিভাবে ঘুমালে বেশি বিশ্রাম পাওয়া যায় তা শিখে নিয়েছে রানা। ও এমনকি দাঁড়ানো অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে, ঘুমাতে পারে ঘড়িতে বাঁধা নির্দিষ্ট সময় ধরে। এভাবে যদি আধ ঘণ্টাও ঘুমায়, মনে হবে আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে শরীরটা সতেজ হয়ে উঠেছে।

তারপর দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরেছে রানা। প্যাকস, সাদা সী আইল্যাণ্ড কটন শার্ট, ব্লেজার। ছোট লিভিং রুম হয়ে চলে এসেছে খুদে কিচেনে, তৈরি করেছে নিজের ব্রেকফাস্ট। সকালের নাস্তাটাকেই দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আহার বলে বিবেচনা করে ও।

কফির স্বাদ অনেক বেড়ে যায় পানিটা যদি মাটির পাত্রে ফোটানো হয়। কিচেনে মাটির একটা জগ থাকায় কাজে লাগাল ও। সব কাজই পারে ও, এমন কি রুটি বেলতেও। ফার্মের ডিম পছন্দ করে না, দেশে থাকলে দেশী ডিম খায়। কিচেনে ফরাসী ডিম যা পাওয়া গেল, দেখে মনে হলো ফার্ম থেকে আসেনি, কৃষকদের বাড়ি থেকে এসেছে। ওর পছন্দ ঘন হলুদ মাখন, তবে স্থানীয় মাখনের রঙ যাই হোক স্বাদটা ভালই লাগল।

দু'কাপ কফি খেতে প্রচুর সময় নিল রানা। খাওয়া শেষ হতে এক ঘণ্টা বসে থাকল মনটাকে পুরোপুরি ফাঁকা করে দিয়ে। এ এক ধরনের ধ্যানই। এক ঘণ্টা পর ঘড়ি দেখল। ভোর চারটে বাজে।

রানার মনে হলো, দিনটা আজ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। অন্তত কিছু অ্যাকশন থাকবে। ওর মনের একটা অংশ খুঁত খুঁত করছে এখনও–কি যেন মনে পড়ার কথা, অথচ মনে পড়ছে না। কাল রাতে বিষয়টা নিয়ে দু'একবার ভেবেছে ও, কোন লাভ হয়নি।

ভিলা ছাড়ার আগে নিজের জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে রাখল রানা, প্রয়োজনে দ্রুত কেটে পড়তে পারবে। ওর প্রায় নিশ্চিত ধারণা, আজ এখানে যা-ই ঘটুক না কেন, লণ্ডনে ওকে শিগ্গির ডেকে পাঠাবেন রাহাত খান।

ভিলা থেকে বেরিয়ে কাঠের জেটিতে চলে এল রানা, বোট খুলে রওনা হবার প্রস্তুতি নিল। সময়ের হিসাবটা যতটা সম্ভব নিখুঁত রাখতে চায় ও, কারণ প্ল্যান করেছে অন্যান্য ইয়ট ও ছোটখাট ক্র্যাফটের ভিড়ে, সবার চোখের সামনে, সেইলিং বোট নিয়ে থাকবে ও। ইয়ট আর ছোট বোটগুলো মন্টি কার্লোর পানিতে ঘোরাফেরা শুরু করে দিনের প্রথম আলো ভাল করে ফোটার আগে থেকেই। ট্যুরিস্টরা সূর্যোদয় দেখতে আসে, কেউ কেউ মাছ ধরা দেখতে। অনেক বোটের

মাঝখানে ওর বোটটা থাকবে।

রানা রওনা হলো পাঁচটায়। সরাসরি বেরিয়ে এল খোলা সাগরে, বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে শেষ মুহূর্তে তীরের দিকে ফিরছে।

পথে কিছু ঘটল না। যেমন আশা করেছিল, তীরে গিজগিজ করছে নানা ধরনের জলযান। ইয়ট, মোটর লঞ্চ, সেইল বোট, কি নেই। ইতিমধ্যে সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। মিডনাইট সানকে কাল সন্ধ্যায় নোঙর ফেলা অবস্থায় যেখানে দেখেছিল আজও সেখানে দেখল। দূর থেকে ওটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমুদ্রগামী জলযানের ওপর প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। ন'টা পঁয়তাল্লিশে দেখল স্টারবোর্ড সাইডে টেণ্ডার রেডি করা হচ্ছে–ওই দিকটা হারবার থেকে সাগরে বেরিয়ে যাবার পথ। আরও লক্ষ করল, মিডনাইট সানের দ্বিতীয় একটা মোটরবোট রয়েছে, স্টার্নের দিকে পানিতে ভাসছে।

ধীরে ধীরে নিজের বোটটা পোর্ট সাইডে নিয়ে এল রানা, যতটা সম্ভব ইয়টের কাছাকাছি। ইয়টের মাঝামাঝি জায়গায়, একদিকের গায়ে একটা লাইন ঝুলছে। কারণটা রানা আন্দাজ করতে পারল, টেণ্ডার বা মোটরবোট পোর্ট সাইডে এসে ভিড়তে চাইলে আগেই তার প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে।

আরও একটু এগিয়ে লাইনটা ধরল রানা, টান দিয়ে দেখল। ডেকে শক্ত ভাবে আটকানো আছে, কাজেই এটা ধরে অনায়াসে ইয়টে চড়তে পারে ও। ব্যস্ত হলো না, বোটটা ধীরে সুস্থে বাঁধল। একটা চোখ রেখেছে ইয়টের ওপর। আগেই লক্ষ করেছে, কোন রকম নড়াচড়া নেই। বোট বাঁধার পর লাইন ধরে উঠতে শুরু করল।

মিডনাইট সানের রেইলিং টপকে ডেকে নামল রানা, কোন শব্দ করছে না। ইয়টে মানুষ নেই, এটা ওর ভুল ধারণা। নির্দেশের সুরে কথা বলছে কে যেন। তারপরই স্টারবোর্ডের দিক থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। ভেসেলটায় যারাই থাকুক নিজেদের কাজে ব্যস্ত তারা। কাজেই সাহস করে সামনে এগোল রানা, যাচ্ছে মেইন সেলুনের দিকে। এখন যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে কি হবে সে-কথা ভাবছে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যায়ই।

কেউ বাধা দিল না, কারও সঙ্গে দেখাও হলো না, মেইন সেলুনে ঢুকে পড়ল রানা। সেলুনের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় স্টাইল আছে, ফার্নিচারগুলো আরামপ্রদ। একদিকে পুরোটা পাশ দখল করে রেখেছে লম্বা একটা বার। কামরার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে লেদার মোড়া আর্মচেয়ার। দেয়ালে, আলোর নিচে, দামী পেইন্টিং। একটা চওড়া প্যাসেজ দেখা গেল, সেলুন থেকে বেরিয়েছে।

প্যাসেজটা ধরে নিঃশব্দে এগোল রানা, থামল কারুকাজ করা একটা কাঠের দরজার সামনে। মৃদু চাপ দিল হাতলে, কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল। এটা একটা বেডরুম। ছাদে আয়না, দেয়ালে উত্তেজক ছবি। সেই সঙ্গে মৃত্যুর গন্ধও পেল রানা, লাশটা দেখার আগেই।

বিছানার ওপর মরে পড়ে আছেন অ্যাডমিরাল কপারফিল্ড।

পোর্টগুলো খোলা, তাসত্ত্বেও গন্ধটা পেয়েছে রানা। এই গন্ধের সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়, চিনতে ভুল হয় না। অ্যাডমিরাল সম্পূর্ণ নগ্ন পড়ে আছেন,

শরীরটা ভাঙাচোরা। মৃত্যুর সময় তাঁর চেহারায় স্বাভাবিক শান্ত ভাব ছিল না। বিছানার ওপর আয়নায় স্থির হয়ে আছে বিস্ফারিত চোখ, মুখ যতটা সম্ভব হাঁ করা, যেন মারা গেছেন বেদম উল্লাস বা হাহাকার করার মাঝখানে।

যেন এই দৃশ্যটাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যেই কেউ কোথাও বাজনা বাজাচ্ছে, আওয়াজটা ভেসে আসছে হালকা বাতাসের সঙ্গে। শব্দটা কোত্থেকে আসছে বোঝার জন্যে কান পাততে হলো রানাকে, তারপর ধরতে পারল। কাল সন্ধ্যার দিকে এবং আজ এখানে আসার পথে যুদ্ধজাহাজটা দেখেছে ও। ফ্রেঞ্চ ওঅরশিপ। ওটা থেকেই বাজনার আওয়াজ আসছে।

পোর্টে চোখ রাখল রানা। নতুন রঙ করা ঝকঝকে যুদ্ধজাহাজ, সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। মিডনাইট সানের টেণ্ডারটাকেও দেখতে পেল ও, ফরাসী জাহাজের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

টেণ্ডারে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে রানা। একজন ওলগা পলিয়ানা, অপরজন অ্যাডমিরাল ডেভিড কপারফিল্ড। ডেভিড কপারফিল্ড?

ঘাড় ফিরিয়ে লাশটা আরেকবার দেখল রানা। তারপর আবার পোর্ট দিয়ে যুদ্ধজাহাজের দিকে তাকাল। ফ্রেঞ্চ ন্যাভাল ভেসেল থেকে নাবিকদের প্রিয় গানের সুর ভেসে আসছে। হেলিকপ্টারের কাঠামোটাও দেখতে পেল রানা। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারল কাল থেকে কেন ওর মনটা খুঁত খুঁত করছিল।

রানা অনুভব করল, সমস্ত রক্ত দ্রুত নেমে যাচ্ছে মুখ থেকে। নিজের অজান্তেই একটা শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, 'টাইগ্রি!'

এক নিমেষে সব যেন খাপে খাপে মিলে গেল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই! টাইগ্রি!' আপনমনে বিড়বিড় করল ও। বিদ্যুৎবেগে চিন্তা চলছে মাথার ভেতর, ওর পিছনে দরজা খোলার শব্দটা কানেই ঢুকল না।

পাঁচ

ওরা দু'জন। ডোরাকাটা টি-শার্ট পরে আছে, বুকের কাছে মিডনাইট সান লেখা। কোমরে বেলবটম পাকস, পায়ে নরম জুতো। দেখে মনে হবে ডেক হ্যাণ্ড, যদিও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই রানা ওদেরকে গুণ্ডা বলে চিনতে পারল। সাধারণ নয়, ট্রেনিং পাওয়া গুণ্ডা। মনে পড়ল, এক সময় এদেরকেই ব্যবহার করত কেজিবি, নাম দেয়া হয়েছিল কমব্যাট গ্যাং। ওদের কাজ ছিল লোকজনের পা ভাঙা, মাথার পিছনে গুলি করা।

দু'জনের একজন স্টেটরুমের ভেতর তিন পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, অপরজন ভেতরে ঢোকার পর মাত্র এক পা এগিয়েছে, তারপর সরে দাঁড়িয়েছে সঙ্গীর বাম দিকে। বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে নাম দিয়ে ফেলল রানা। তিন পা এগিয়েছে ঘাতক, তার পিছনে আততায়ী।

'লাশ নিতে এসেছ বুঝি?' কথা বলার সময় ডান দিকে সরে যাবার ভান করল

রানা, চেষ্টা করছে আততায়ীকে সামনে আনতে। ওর আশা পূরণ হলো, লোকটা ছুটে এল ওর দিকে। তৈরিই ছিল রানা, লাফ দিল বাম দিকে, সেই সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়েছে ডান পা–লোকটার গোড়ালি তাতে বাধা পেল।

ঝোঁকটা সামনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল আততায়ীকে, বিছানার পায়ার সঙ্গে সবেগে ঠুকে গেল তার মাথা। ইতিমধ্যে ঘাতকের দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা। আততায়ীর চেয়ে খাটো সে, সেই তুলনায় মোটা ও ভারি। তার খুব কাছে চলে এল রানা, দু'হাতে বাম কব্জিটা ধরল, বাম হাঁটু তুলে গুঁতো মারল উরুসন্ধিতে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ঘাতক, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা।

'চোখে পানি বেরিয়ে পড়ছে, তাই না?' সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘাতকের বাম হাতে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, শুনতে পেল কাঁধের জয়েন্ট থেকে আলগা হয়ে গেল হাড়। টান দিয়েই অসাড় হাতটার নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে ও, সেটাকে ঘুরিয়ে তার শিরদাঁড়ায় নিয়ে এল, সামনের দিকে আরও একটু ঝুঁকতে বাধ্য করল।

ইয়টে এদের মত আর কেউ থাকলে অসুবিধে আছে, ঘাতকের আর্তচিৎকার শুনে ভাবল রানা। শুধু চিৎকার করছে না, রুশ ভাষায় খিস্তিও করছে।

ঘাতককে একটা পজিশনে নিয়ে এল রানা, লোকটা যাতে তার সঙ্গীর দিকে তাক করা অবস্থায় স্থির থাকে। আততায়ী ইতিমধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, দেখে মনে হলো এখনও কিছুটা আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে। তা সত্ত্বেও রানার দিকে ঘুরে মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে।

ঘাতকের কব্জিটা ছেড়ে দিল রানা, পিছিয়ে এল, তারপর ডান হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড কোপ মারল ঘাড়ে। লোকটার গভীর কোথাও থেকে বাতাস ছাড়ার শব্দ বেরিয়ে এল। ঢলে পড়েই যাচ্ছিল, বেল্ট আর ঘাড়ের কাছে টি-শার্টটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, আলুর বস্তার মত ছুঁড়ে দিল সরাসরি আততায়ীর দিকে।

ঘাতকের মাথাটা আততায়ীর বুকে লাগল। কয়েকটা শব্দ তৈরি হলো, তার একটা নাক ভাঙার, দ্বিতীয়টা ডান চোয়াল ভাঙার। বেশ অনেকটা রক্তও দেখা গেল। আর বলাই বাহুল্য, দু'জনেই চৈতন্য হারিয়েছে।

কি করতে হবে আগেই ভেবে রেখেছে রানা, কাজেই সময় নষ্ট করল না। এক ছুটে স্টেট রুম থেকে বেরিয়ে এল ও। গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে যদি ফরাসী যুদ্ধজাহাজের স্টার্নে বসে থাকা টাইগ্রি হেলিকপ্টারের সম্পর্ক থাকে, এরইমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছে ও।

মিডনাইট সানের ক্রু সংখ্যায় হয়তো এমনিতেই কম, কিংবা তারা তীরে বেড়াতে গেছে। ডেকে কাউকে দেখল না রানা। এক ছুটে স্টার্নে চলে এল ও, লাইনটা ধরে টান দিল। এই লাইন নিচে মোটরবোট পর্যন্ত নেমে গেছে, আসার পথে দেখেছে ও।

ছোট্ট জলযানটাকে স্টারবোর্ড সাইডে সিধে অবস্থায় আনতে বেশ কিছুটা সময় ও শ্রম দিতে হলো। অবশেষে মই বেয়ে নিচে নামল রানা, লাফ দিয়ে ককপিটে পৌঁছুল।

প্রথম চেষ্টাতেই সচল হলো এঞ্জিন, মিডনাইট সান থেকে দূরে সরে এল মোটরবোট। নাক ঘুরিয়ে নিল ফরাসী যুদ্ধজাহাজের দিকে। থ্রটল খুলে ফুল

পাওয়ার দিল রানা, পানির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল বোট।

যুদ্ধজাহাজের কাছাকাছি এসে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। স্টার্ন ও হেলিকপ্টারের দিকে মুখ করে বসে আছে লোকজন। একটা সভা বা অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। চেয়ারগুলো জাহাজের সম্পত্তি নয়, অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমদানী করা হয়েছে। কয়েক সারিতে ফেলা হয়েছে সেগুলো। হেলিকপ্টারটা দেখামাত্র যে-কোন লোকের গা শিরশির করে উঠবে, সেজন্যে শুধু যে ওটার ভীতিকর চেহারা দায়ী তা নয়, দায়ী অস্ত্রসজ্জাও। কপ্টারের নাকটা চ্যাপ্টা ও ভোঁতা। ককপিট লম্বাটে, পিচ্ছিল একটা ভাব আছে। উইংগুলোও ভোঁতা চেহারার, ওগুলো থেকে ঝুলছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র–বেশিরভাগই রকেট, যদিও উইং-এর ওপর একজোড়া লার্জ ক্যালিবার মেশিন গান দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি টার্গেটে আঘাত হানার জন্যে।

এই উপলক্ষ সম্পর্কে আরও আগে চিন্তা করা উচিত ছিল, ভাবল রানা। ছুটির দরখাস্ত করার সময়ই জানত, ছুটি না পেলে ইভ্যালুয়েশন-এর জন্যে ফিল্ডে থাকতে হবে ওকে। তখন একবারও মনে হয়নি যে ছুটি পেলেও ইভ্যালুয়েশনের কাজটা স্থগিত করা হবে না। লণ্ডন থেকে যখন রওনা হলো ও, টাইগ্রি হেলিকপ্টারের ফাইলটা তখন ওর টেবিলে।

টাইগ্রি হেলিকপ্টার অফিশিয়ালি এখনও ক্লাসিফায়েড, ফরাসীদের বহু বছরের সাধনার ফল, ফ্লাইং হার্ডওয়্যারের অত্যাধুনিক নমুনা। সমরবিদ ও রাজনীতিবিদদের মন্টি কার্লোতে দাওয়াত দিয়েছে ফ্রেঞ্চ নেভী, নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বিদেশীরা আছেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বক্তৃতা দেয়া হবে, পানাহারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সবশেষে আকাশে তোলা হবে টাইগ্রিকে।

যুদ্ধজাহাজের গায়ে পৌঁছুল রানা, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠতে পারল না। লাইনে আরও দুটো টেণ্ডার রয়েছে, ওগুলো থেকে ধীরেসুস্থে নামছেন সস্ত্রীক অফিসাররা। অফিসাররা প্রায় সবাই ইউনিফর্ম পরা, হয় ন্যাভাল নয়তো এয়ার অ্যাটাশে। বাকি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিক।

অবশেষে মই বেয়ে ওপরে উঠল রানা, তরুণ এক সাব-লেফটেন্যান্টকে পরিচয় পত্র দেখাল। এ-ধরনের পরিস্থিতির কথা ভেবেই বিভিন্ন ধরনের আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হয়। ওর আসল পরিচয় বিসিআই এজেন্ট, রানা এজেন্সির ডিরেক্টরের পদটা কাভার। আরও অনেক পরিচয় আছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির কমাণ্ডার। এই মুহূর্তে যে পরিচয়টা ওজন বহন করবে, বেশি কাজ দেবে, সেটাই প্রকাশ করল রানা। 'কমাণ্ডার রানা, রয়্যাল নেভি ইন্টেলিজেন্স,' এমন ধমকের সুরে কথাগুলো বলল, যেন কেউ সন্দেহ করলে ঘুসি মেরে তার নাক ভেঙে দেবে। কথা শেষ করে অনুমতির অপেক্ষায় থাকল না, হাঁটা দিল কোয়ার্টার ডেকের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সাব-লেফটেন্যান্ট, এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে স্যালুট ঠুকল।

স্টার্নের দিকে এগোচ্ছে রানা, চারদিক চোখ বুলিয়ে পলিয়ানা আর তার 'অ্যাডমিরাল'-কে খুঁজছে। কে জানে কোথায় তারা অদৃশ্য হয়েছে, সম্ভবত পোর্ট সাইডে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। সেদিকে যাবে কিনা ভাবছে ও, হেলিকপ্টার

প্যাড থেকে স্টার্ট নিল টাইগ্রির এঞ্জিন। এঞ্জিন সচল হলেও, অলস হয়ে থাকল, মেইন রোটর ব্লেড মন্থরবেগে ঘুরছে। উঁচু ককপিট থেকে নিচে নেমে এল গ্রাউণ্ড ক্রুদের একজন।

প্যাডের দিকে যাবার একটা পথ দরকার, সেটা খুঁজছে, এমন সময় পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে এল।

এক অফিসার কথা বলছেন। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এবার আমরা এই অসাধারণ এয়ারক্রাফটের উৎকর্ষতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।' ঘোষণাটা ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষায় প্রচার করা হলো, সবশেষে ইংরেজিতে পুনরাবৃত্তি।

আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড় ঠেলে সাবধানে এগোল রানা, ভিউইং প্ল্যাটফর্মের একবারে কিনারায় একটা সীট ম্যানেজ করল। লাউড-স্পীকার থেকে কমেণ্ট্রি ভেসে আসছে এখনও।

'এখন আপনারা আধুনিক সমরসজ্জায় ইউরোপের অবদান প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছেন—টাইগ্রি হেলিকপ্টারের প্রথম ওয়ার্কিং প্রোটোটাইপ। টেক-অফ বা ল্যাণ্ড করার মধ্যে এর যে গোপন বৈশিষ্ট্য আপনারা দেখবেন, আগে কেউ কখনও তা দেখেননি। শুধু যে ডিটেকশন এড়াবার লেটেস্ট টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, যে-কোন ইলেকট্রনিক বাধা, রেডিও জ্যামিং ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক র‍্যাডিয়েশন প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই মুহূর্তে টাইগ্রির টেস্ট ক্রুরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন। অনুমতি দিন, লেফটেন্যান্ট-কমাণ্ডার বার্নাড মোপার্ট ও লেফটেন্যান্ট জাঁ বুকানি-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের।'

ব্যাণ্ড বেজে উঠল, বিখ্যাত গানের সুর—দোজ ম্যাগনিফিশেন্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিন। সেই সঙ্গে ক্রু রুম থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। কামরাটা তাদের ডান দিকে কোথাও হবে, পোর্ট সাইডে।

এরইমধ্যে ফ্লাইং ওভারঅল পরে নিয়েছে তারা, মাথায় হেলমেট। রানার দৃষ্টি পথে রয়েছে হেলিকপ্টারটা, ওখানে পৌঁছুনোর পর তাদেরকে দেখতে পেল ও। দেখেই চিনতে পারল।

পাইলট রোগাটে, হালকা-পাতলা গড়ন; হাঁটার ভঙ্গিটা পরিচিত। বিড়ালের মত সতর্ক পদক্ষেপে মইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ওলগা পলিয়ানা।

মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে তারা। সম্ভবত তিন সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল রানা। গম্বুজ আকৃতির ককপিট ও ইলেকট্রনিক স্টেশনে ঢুকতে যাচ্ছে পলিয়ানা আর তার 'অ্যাডমিরাল', এই সময় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, ছুটল হেলিকপ্টারের দিকে।

দু'জন লোক চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তাদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন চিৎকার জুড়ে দিল। রানাকে বাধা দিল একজন লোক, তার বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রানা। ব্যাণ্ডপার্টির লোকজন ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে। রানার খেয়াল নেই ন্যাভাল পুলিসের একটা দল ওর পিছু নিয়েছে। প্যাডের কিনারায় পৌঁছে গেছে ও, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

'স্টপ দেম!' রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করছে রানা। 'ওরা তোমাদের ক্রু নয়! ওদের থামাও···!' চার-পাঁচজন লোক মিলে ডেকের ওপর ফেলে দিল ওকে, হাত ও পা

চেপে ধরেছে। ধস্তাধস্তি করছে রানা, এখনও সাবধান করছে। কিন্তু টাইগ্রির এঞ্জিন হঠাৎ গর্জন করে ওঠায় ওর গলা চাপা পড়ে গেল। ন্যাভাল পুলিসের একজন অফিসার ছুটে এলেন, চোখ গরম করে রানাকে গালমন্দ করছেন, যদিও কপ্টারের আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু রানার কানে ঢুকছে না।

হাত-পা ছুঁড়ে পুলিসদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, লাফ দিয়ে সিধে হলো। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ছেঁকে ধরল লোকগুলো। ধস্তাধস্তি করছে রানা, তারই ফাঁকে দেখতে পেল মেশিনটা টেক অফ করল, এক নিমেষে শূন্যে উঠে পড়ল সরাসরি খাড়াভাবে, প্রায় অসম্ভব রেট ফাইভ টার্ন নিচ্ছে–সাধারণ নিয়মে কোন হেলিকপ্টারকে এ কাজ কখনও করতে দেখা যায় না। হাততালি দিচ্ছে দর্শকরা। হেলিকপ্টারের নাক এখন সরাসরি আকাশের দিকে তাক করা, ওপরে উঠে যাচ্ছে ঠিক যেন একটা জেট ফাইটারের গতিতে। তারপর খসে পড়া বা পতন শুরু হলো, সেই সঙ্গে নিখুঁত ইমেলম্যান টার্ন নিচ্ছে। এই সময় রক্তশূন্য এক পুলিস ছুটে এল, অফিসারের উদ্দেশে কথা বলার সময় তোতলাতে লাগল। 'ও-ওরা মা-মারা গেছে, স্যা-স্যার! ক্রু রুমে, স্যা-স্যার! আ-আমি নিজে দেখ-দেখলাম। ফ্লাইট ক্রুদের কথা ব-বলছি, স্যার। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডারকে গুলি করা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট বুকানি-কে জবাই করা হয়েছে!'

নিজের চারদিকে তাকাল অফিসার, যেন যে ঘটনার কথা শুনছে তা উল্টে দেয়ার উপায় খুঁজছে। দূরে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে টাইগ্রির আওয়াজ। 'আপনি কোন ষড়যন্ত্রের অংশ!' রানার বুকে একটা আঙুল ঠুকল। 'কে আপনি?'

'কমাণ্ডার রানা, রয়্যাল নেভি। ইন্টেলিজেন্স।' রানা জানে, খোঁজ নিলে রয়্যাল নেভি ওর এই পরিচয় স্বীকার করবে, এটা ওর একটা নির্ভেজাল কাভার। 'আমি আপনাদেরকে সাবধান করতে চেয়েছি।'

'কিন্তু কার এত সাহস…?'

'রবিন হুড,' কঠিন স্বরে বলল রানা। 'রাশিয়ান রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট।'

'তুমি তাহলে বলছ, রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট?' ডেস্কের ওদিক থেকে রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রাহাত খান, কাঁচা-পাকা একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো।

রানা এজেন্সি নয়, বিসিআই-এর লণ্ডন শাখায় আলোচনা হচ্ছে। এটা বিসিআই চীফের খাস কামরা, বাংলাদেশ দূতাবাসে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দামী টোবাকোর সুগন্ধ, পাইপটা এইমাত্র জ্বেলেছেন তিনি। কামরার ভেতর ফার্নিচার খুব কম, সাজানো হয়েছে হাই টেক অফিস ফিটিংস দিয়ে। কালো ডেস্কটা বিরাট, তাতে একটা মুভেবল ল্যাম্প প্লাস, কমপিউটর মনিটর ও কয়েকটা কালার কোডেড টেলিফোন।

কমপ্লিট সুট পরে আছেন বিসিআই চীফ, মাথায় পরেছেন হ্যাট, হাতে দামী রোলেক্স ঘড়ি।

'আমার তাই ধারণা, স্যার,' বলল রানা। 'পলিয়ানাকে আমরা রবিন হুড

ক্রাইম সিন্ডিকেটের মেয়ে বলে চিনি। ইয়টটাও ওদের একটা ফ্রন্ট ভাড়া করেছে। তারপর, আমেরিকান অ্যাডমিরাল...।'

'তুমি বলছ, তিনি মারা গেছেন।'

'আমি তাঁর লাশ দেখেছি, স্যার।'

'ওদেরকে আমার দারুণ অসতর্ক মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান। 'শোনা যাচ্ছে, ওরা খুব কুখ্যাত। খ্যাতির মত কুখ্যাতি অর্জন করতেও যোগ্যতা লাগে। যা ঘটেছে, তার মধ্যে কৌশল কোথায়? বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেই কেন? আমি তো কোন দক্ষতাও দেখছি না।'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন, নিজেদের কুকর্মের চিহ্ন চারদিকে ছড়িয়ে রেখে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। কি কারণ? এতটা কাঁচা, এ বিশ্বাস করা যায় না। ওরা যেন কাকে আকৃষ্ট করতে চাইছে।'

বসের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি রানার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর-ভয়ও পাচ্ছে, আবার রোমাঞ্চিতও হচ্ছে। বসের ধারণা ভুল হবার সম্ভাবনা কম। রবিন হুড ক্রাইম সিন্ডিকেট কাউকে যদি আকৃষ্ট করতে চায়, সম্ভাব্যদের তালিকায় ও-ও থাকতে পারে। ব্যাপারটা তো মিলেও যায়। রাস্তায় পলিয়ানার সঙ্গে ওর সাক্ষাতের ঘটনাটা কাকতালীয় নয়। ওর জন্যে পলিয়ানা ছিল টোপ বিশেষ। কিন্তু সত্যি কি তাই? ও জানতে চাইল, 'স্যার, ইয়টটা সম্পর্কে...?'

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'কর্তৃপক্ষ সচেতন হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা। নেই।'

'কিন্তু ওটা যে ওখানে ছিল তা তো হারবার রেকর্ডই বলবে।'

'রেকর্ড বুকে কিছু পাওয়া যায়নি,' বললেন রাহাত খান। 'শুধু তাই নয়, টাইগ্রিও হারিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তুমি কোন ধারণা করতে পারো, রানা? ওটার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে?'

'ওটাই তো বৈশিষ্ট্য, স্যার। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা।'

'কিন্তু কিভাবে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্স ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিটি ট্র্যাকিং স্টেশনকে সতর্ক করা হলো...।'

রানা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু ওটা চুরি যাবার বিশ মিনিট পর, স্যার। কাজটা কিভাবে করা হয়েছে, আমি আন্দাজ করতে পারি।'

'কিভাবে?'

'ওটায় যে-সব যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, ইলেকট্রনিক চোখকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারবে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, চোরেরা ওটাকে নির্জন কোন জায়গায় নামাবে, আল্পসে সেরকম জায়গা পাওয়া কঠিন নয়। নামাবার পর ঢেকে রাখবে, অপেক্ষা করবে রাতের জন্যে। সার্চ স্থগিত রাখা হলে আবার আকাশে উঠবে ওরা, নিরাপদে আবার কিছুদূর যাবে।'

ব্যাপারটা নিয়ে দু'তিন সেকেণ্ড চিন্তা করলেন রাহাত খান, তারপর মুখে পাইপ তুললেন। 'শুধু ফ্রান্স নয়, ব্রিটেনও সাধ্যমত চেষ্টা করছে। প্রতিটি ইলেকট্রনিক লিসেনিং ও স্যাটেলাইট সার্ভেইল্যান্স স্টেশনে প্রোফাইল পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ওটা চিরকাল নিখোঁজ থাকতে পারে না।'

রানার ইচ্ছে হলো বলে, 'আপনি বাজি ধরতে চান?' পরমুহূর্তে 'চোপ শালা' বলে গাল দিল নিজেকে। যেন রানার মনের কথা ধরতে পেরেই ঝট করে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান–চোখের সামনে থেকে দূর হতে বলছেন।

ভিজে বেড়ালের মত চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল রানা।

'তুমি কোথাও যেয়ো না,' পিছন থেকে বললেন রাহাত খান। 'যে-কোন মুহূর্তে ভাল কোন খবর আসতে পারে। আমাদের ইলেকট্রনিকস অপারেটররা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আমাদের অপারেশনস রুম কি ওদের স্যাটেলাইট মনিটর করছে, স্যার?' এই সুবিধেটা সম্প্রতি পাওয়া গেছে। বেশ ক'বছর ধরে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বিসিআই-এর কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে। রানাকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে ওর ব্যক্তিগত পরামর্শ থেকেও লাভবান হচ্ছে ওরা। বিনিময়ে রানার দাবি ছিল, ওদের স্যাটেলাইট মনিটর করার সুযোগ।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিলেন রাহাত খান, তারপর হাত নাড়লেন।

দরজার দিকে এগোল রানা, এই সময় ডেস্কের ইন্টারকম বেজে উঠে আবার ওকে থামিয়ে দিল।

'টাইগ্রি হেলিকপ্টার খুঁজে পেয়েছে ওরা, স্যার!' তাসমিনা হক তুলি, রাহাত খানের পার্সোনাল সেক্রেটারির উত্তেজিত গলা ভেসে এল। 'এখুনি আপনার একবার অপারেশনস রুমে আসা দরকার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বলছেন, ব্যাপারটা জরুরী।'

'তুমি আগে যাও, রানা।' রাহাত খান এরইমধ্যে ডেস্কের কাগজ-পত্র গুছাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। 'একটু পরই আসছি আমি।'

বসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। ভাবছে, হেলিকপ্টারটা কোথায় পেল ওরা? মনে হলো, অপারেশনস রুমে ওর জন্যে খারাপ কোন খবর অপেক্ষা করছে। তবে পরিস্থিতি যে কতটা খারাপ হতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই।

ছয়

উত্তর রাশিয়ার সর্বশেষ প্রান্তে আর্কটিক ওশন, ওখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভেতরে একটা ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় ওটা ছিল সেভারনায়া স্টেশন, পাইকারী হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড ঘটানোর উদ্দেশ্যে ভীতিকর যে-সব অস্ত্র সোভিয়েত রাশিয়া তখন বানাত সেগুলোর একটা অপারেশনাল কন্ট্রোল পোস্ট

হিসেবে ব্যবহার করা হত স্টেশনটাকে। এলাকার চারপাশের মাটি বেশিরভাগই সমতল, প্রায় সারা বছরই বরফ আর তুষারে ঢাকা থাকে।

বিসিআই লণ্ডন শাখার অপারেশনস রুমে রানাকে যখন যেতে বললেন রাহাত খান, তার আধ ঘন্টা আগে ওই ধ্বংসাবশেষের দিকে এগোতে দেখা গেল একটা স্লেজকে, টেনে আনছে চারটে কুকুর। কুকুরগুলো বেশ জোরেই ছুটছে, ফলে ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে স্লেজ। স্লেজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা একজন এস্কিমো, সে সেভারনায়া স্টেশন থেকে দু'মাইল দূরের একটা ছোট সেটলমেন্টে থাকে। ওই সেটলমেন্টের কাছাকাছি এক সময় একটা গ্রাম ছিল, আজ আর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনেক দিন আগের কথা, স্টেশনটা তখন তৈরি হতে যাচ্ছে। নানা ধরনের বহু লোকজন এল, সঙ্গে করে নিয়ে এল বিচিত্র সব রোগ। বিচিত্র এই অর্থে যে এ-সব রোগে স্থানীয় লোকজন আগে কখনও ভোগেনি। এস্কিমোদের অনেকেই মারা পড়ল, বেঁচে থাকল শুধু অসম্ভব প্রাণশক্তির অধিকারী অল্প কিছু লোক। এখন সেটলমেন্টে টিকে আছে মাত্র চারটে পরিবার। তারাও তাদের পূর্ব-পুরুষদের জীবন ধারা অনুসরণ করে। আগন্তুকদের উপকার করাই তাদের পেশা, নানা ধরনের সেবা দান করে নিজেদের পেট চালায়। এই লোকটাও ঠিক তাই করছে। কাছাকাছি শহর থেকে আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে সেটলমেন্টে ফিরছে সে। বিক্রি করবে ছ'মাস পর পাতালবাসীরা মাটির ওপর বেরিয়ে এলে। প্রতি ছ'মাস পর পর বেরোয় তারা।

লোকটা খুব ক্লান্ত। প্রায় এক হপ্তা হলো পথে বেরিয়েছে, ফলে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে মনটাও তার খুব অস্থির হয়ে আছে। যদিও কোন দিন জানতে পারবে না, তবে যে দুর্ঘটনাটা ঘটল সেজন্যে দায়ী তার ক্লান্তি আর অস্থিরতা। কুকুরগুলোকে সে খুব জোরে ছোটাচ্ছিল। পিচ্ছিল পথের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা বোল্ডারটা সে দেখতেই পায়নি। সামনের কুকুরটা দেখতে পেল ঠিকই, তবে একটু দেরিতে। বাধাটা এড়াবার জন্যে আরেক দিকে ঘুরে গেল সে, দেখে মনে হলো স্লেজটা অসম্ভব একটা বাঁক ঘোরার চেষ্টা করছে। বোল্ডারের কিনারায় ধাক্কা খেলো রানারগুলো, স্লেজ থেকে ছিটকে বরফ আর পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ড্রাইভার।

গায়ে মোটা ফার ও মাথায় বড় আকৃতির হুড থাকলেও, লোকটার ঘাড় ছাড়াও হাত-পায়ের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেল। উঠতে চাইল সে, কিন্তু ব্যথার জন্যে এমন কি নড়তেও পারল না। বরফের ওপর অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকল, কুকুরগুলো তাকে ঘিরে ধরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে। লোকটা তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে শেষ বারের মত উঠে বসতে চাইল। তা করতে গিয়ে মারা গেল বেচারা, ঢলে পড়ল বরফের ওপর।

কুকুরগুলো তখনও ব্যাপারটা বোঝেনি, মনিবের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল তারা, যেন খানিকটা উত্তাপ দিয়ে চাঙা করতে চাইছে। এভাবে তারা প্রায় দশ মিনিট বসে থাকল। এক সময় সর্দার ওদেরকে পথ দেখিয়ে সেটলমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তবে আপাতত মনিবকে ছেড়ে নড়তে চাইছে না। কারও জানা হবে

না এই দুর্ঘটনা ও অনিয়ন্ত্রিত কুকুরের দলটা পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিভাবে আরেক মানুষের প্রাণ বাঁচাবে।

প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের খানিক পরই টাইগ্রি হেলিকপ্টার পৌঁছুবে এদিকে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে অনাহূত দু'জন অতিথিকে।

দেখে পরিত্যক্ত বলে মনে হলেও, সেভারনায়া স্টেশন সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্সের অ্যানালিস্টরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচুর ছবি তুলেছে তারা, সে-সব ছবি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষাও করিয়েছে। রাশিয়ানরা প্রচার করছে, গত দু'বছর থেকে অপারেশনাল লিস্ট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে সেভারনায়া স্টেশনকে। ছবিতে ভাঙা-চোরা কাঠামো আর আবর্জনা দেখা গেছে, শুধু একটা জিনিস···সেটা হলো প্রকাণ্ড আকারের রেডিও টেলিস্কোপ ডিশ। দেখে মনে হবে মাটি থেকে গজিয়েছে ওটা। জিনিসটা ওখানে আছে বেশ ক'বছর ধরে, আর বিভিন্ন সময়ে তোলা ছবি থেকে বোঝা যায়, ডিশের আকার-আকৃতি মাঝে মধ্যে বদলায়। বিশ্লেষকরা বলেছেন, খুব অল্প সময়ের ভেতর ডিশটা অনেক বড় হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে-মধ্যে ওটা স্থানও বদল করে। কেন এরকম ঘটে, তার অনেক ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়েছে, বলাই বাহুল্য। সর্বশেষ ব্যাখ্যা হলো, ওটাকে এদিক ওদিক সরিয়ে দেয় বাতাস। আর আকার ছোট বড় হবার জন্যে দায়ী করা হয়েছে অপটিকাল ভ্রমকে–এক এক সময় আবহাওয়া থাকে এক এক রকম, ছবি তোলার সময় সূর্যও একই জায়গায় থাকে না।

আসলে ডিশটা সত্যি আগের চেয়ে বড় হয়ে গেছে, স্থানও পরিবর্তন করেছে, এবং সেজন্যে দায়ী মাটির নিচে পাতালে লুকিয়ে থাকা একদল পুরুষ ও নারী। সারফেস থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে রয়েছে ওরা। সেভারনায়া স্টেশন আসলে পরিত্যক্ত নয়, সমস্ত তৎপরতা লোকচক্ষুর আড়ালে বজায় রাখা হয়েছে আগের মতই।

ডিশটা এই মুহূর্তে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার এক টুকরো মহাশূন্য আবর্জনার সঙ্গে সংযুক্ত। আবর্জনা বলার কারণ, বাতিল লোহার মত আকৃতি নিয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা, দেখে বোঝার উপায় নেই যে আসলে পুরোপুরি কর্মক্ষম একটা স্যাটেলাইট ওটা। এই মুহূর্তে ওই স্যাটেলাইট মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ঝুলছে। সেভারনায়া স্টেশনের তলায়, ওঅর্ক-স্টেশনে, জানালাবিহীন আলোকিত একটা কমপিউটর রুম আছে, সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে ওটাকে খুবই সুন্দরী এক তরুণী।

সব মিলিয়ে কমবেশি বারোজন পুরুষ ও মেয়ে রয়েছে এখানে, সবাই কমপ্লেক্সের এই সেকশনে কাজ করছে। ওদের কারও বয়েসই চল্লিশ ছাড়ায়নি। প্রথমে রুশ ফেডারেশনের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত কয়েকশো কমপিউটর বিজ্ঞানীদের তালিকা তৈরি করা হয়, সেই তালিকা থেকে এদেরকে বাছাই করা হয়েছে।

এটা টেকনিকাল এরিয়া। এখান থেকে কিচেন, রেস্ট রুম, ডাইনিং ও স্লীপিং ফ্যাসিলিটিতে যাবার দরজা আছে। পাশেই একটা কন্ট্রোল রুম, মোটা কাচের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। কাচের ওদিকে ইউনিফর্ম পরা পুরুষ ও মেয়েরা কাজ

করছে। এই দ্বিতীয় সেকশনে লম্বা একটা কনসোল আছে, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেন্ট আর সুইচে বোঝাই, মাথার দিকে বিশাল এক স্ক্রীন। এই মুহূর্তে খালি সেটা। কমপ্লেক্স কন্ট্রোল এরিয়ার পিছনে, দেয়ালের গভীরে খোদাই করা লাল একটা সেফ আছে। সেফের পাশে লাল হরফে রুশ ভাষায় লেখা– 'তালা দেয়া। খুলতে হলে অথোরাইজেশন কোড দরকার হবে।' অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যে সেফের সরাসরি সামনে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি একটা ইলেকট্রনিক গেট।

সারি সারি কমপিউটরের সামনে বসে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ করছে যে সুন্দরী মেয়েটা, হালকা-পাতলা গড়ন তার, স্বচ্ছ নীল চোখ, গায়ের রঙ দুধে-আলতা, সাধারণ গড়পড়তা মেয়ের চেয়ে লম্বাও একটু বেশি। অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়ার পার্থক্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রবণতায় ও বেশভূষায়। আজ সে লম্বা কালো স্কার্ট পরেছে, সঙ্গে সাদা শার্ট, তার ওপর নকশা করা ওয়েস্টকোট। তার বেশিরভাগ কলিগ দিনের পর দিন একই কাপড় পরে, পরিচ্ছন্নতা বা ফ্যাশন সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন বলা যাবে না। লিয়ার পাশের লোকটা পরেছে নোংরা জিনস, অদ্ভুত দর্শন ম্যাগাজিন টি-শার্ট, তার ওপর কালো লেদারের মোটরবাইক জ্যাকেট। তার চুল দেখে মনে হবে গত এক হপ্তায় না শ্যাম্পু করা হয়েছে, না চিরুনি বোলানো হয়েছে। চেহারায় অস্থিরতা, যেন হাতের কাজে মন নেই। ভিক্টর কিরগিজ চিরকালই খেয়ালী টাইপের, তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন, কখন কি করে বসে কেউ বলতে পারে না। তার বিশৃংখল ও চঞ্চল স্বভাব কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন একটা মাত্র কারণে, গোটা কমপ্লেক্সে নিঃসন্দেহে সেইই সবচেয়ে মেধাবী বিজ্ঞানী।

হেডসেটে লাগানো ছোট মাইকে মৃদুস্বরে কথা বলছে লিয়া। 'রোটেট রাইট সিক্সটি ডিগ্রীজ, অ্যাসেণ্ড টু ওয়ান হানড্রেড কিলোমিটারস।'

তার নির্দেশে মিট মিট করা স্যাটেলাইট সিম্বল নড়তে শুরু করল মনিটরে। লিয়ার হাসি দেখে মনে হবে সে যেন এই মাত্র তার পোষা কুকুরকে একটা কৌশল শেখাল। তার আনন্দে বাধা দিল ভিক্টর কিরগিজের কর্কশ হাসি। 'পেরেছি!' হাসছে আর চিৎকার করছে সে। 'আমি পেরেছি!'

বান্ধবী নোভার দিকে তাকাল লিয়া। তার বাম দিকের টারমিনালে বসে আছে নোভা। কোটরের ভেতর চোখের মনি ঘোরাল সে, একটা আঙুল দিয়ে মাথায় টোকা মেরে বোঝাতে চাইল কিরগিজ পাগলামি করছে।

'লিয়া, আমি কি করেছি দেখে যাও!' কিরগিজের বলার সুরে প্রবল তাগাদা, চেয়ার না ছেড়ে পারল না লিয়া। এগিয়ে এসে কিরগিজের সেট-আপে চোখ রাখল।

কিরগিজ যেহেতু কিরগিজ, নিজের সামনে কয়েকটা স্ক্রীন রেখেছে সে। 'ঢুকে পড়েছি, আমি ভেতরে ঢুকে পড়েছি!' আবার হেসে উঠল সে, বেসুরো গলায়।

লিয়া দেখল, একটা স্ক্রীনে যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সীল ফুটে রয়েছে। 'সর্বনাশ, ভিক্টর, একি কাণ্ড! তুমি তো দেখছি আমেরিকানদের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে অনুপ্রবেশ করেছ! তোমার কোন ধারণা আছে, ব্যাপারটা ওরা ট্রেস

করতে পারলে কি ঘটবে? ট্রেস করে যদি এখানকার হদিশ পেয়ে যায়?'

'জানি না মানে? আমাদের কমপিউটার-চীফ জিনিয়াস বলে ঘোষণা করবে আমাকে, বদলি করবে মস্কোয়, ওখানে আমাকে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার দেয়া হবে–বাধা দিয়ো না, রঙিন স্বপ্ন দেখছি।'

'বেতন খুব ভালই পাই আমরা। কাজেই রঙিন স্বপ্ন দেখতে কোন অসুবিধে নেই। মানুষ যা ভাবে তা অনেক সময় ফলেও যায়, তুমিও এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে যেতে পারো।'

'পেলেও অসুবিধে আছে,' বলল ভিক্টর কিরগিজ। 'প্রথম শর্ত, এই জায়গা থেকে অন্য কোথাও সরে যেতে হবে, তা না হলে খরচ করব কিভাবে?'

'তাও তো সত্যি!'

'আর আমেরিকানদের কথা যদি বলো, ওরা এত বোকা যে আমাকে ধরতেই পারবে না। একটা হার্ড ড্রাইভের ভাইরাসই ধরতে পারে না, তার আবার…!' ওয়ার্নিং বীপ দিয়ে কমপিউটর স্ক্রীন থেকে সীলটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তার জায়গায় ফুটে উঠল একটা বাক্য– 'আন অথোরাইজড এন্ট্রি ডিটেকটেড'।

'কি যেন বলছিলে তুমি?' হেসে উঠল লিয়া।

বিড়বিড় করে গাল দিল ভিক্টর, দ্রুত নিজের একটা প্রোগ্রাম লোড করার জন্যে কমাণ্ড টাইপ করল। ওকে রিমাইণ্ডার দেয়া হলো, স্ক্রীনে ফুটে উঠল লেখাগুলো–'টু সেণ্ড স্পাইক প্রেস এন্টার'।

এন্টার কী-তে চাপ দিল ভিক্টর, স্ক্রীনের লেখা বদলে গেল– 'স্পাইক সেন্ট'।

'গুড,' ইংরেজিতে বলল ভিক্টর। 'স্পাইকড দেম।'

মাথা নাড়ল লিয়া। 'ভিক্টর, এ-সব বাদ দাও, প্লীজ।'

'না, কেন!' ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি লিয়ার চোখে তাকাল ভিক্টর। 'আই স্পাইকড দেম, বোকা মেয়ে! আমাকে যারা ট্রেস করতে চাইছে আমার ওই প্রোগ্রাম তাদের ফোন লাইন দখল করে রেখেছে। ওটা তাদের মোডেম জ্যাম করে রাখছে।'

আরেকটা কমাণ্ড টাইপ করল ভিক্টর। স্ক্রীনে আরেকটা মেসেজ ফুটে উঠল– 'ইনিশিয়েট সার্চ–এন্টার পাসওয়ার্ড'।

'এবার কি?' জিজ্ঞেস করল লিয়া।

'পাসওয়ার্ড দিলাম।' দশটা কীতে চাপ দিল ভিক্টর। স্ক্রীনে অক্ষরগুলো দৃশ্যমান নয়, কালো বৃত্ত দিয়ে তৈরি একটা লাইন ধরে আসছে।

'বুলেটস,' ব্যাখ্যা করল সে।

'বুলেটস মানে কি আমি তা জানি, ভিক্টর।'

কীতে চাপ দিয়ে আবার এন্টার টাইপ করল ভিক্টর, স্ক্রীনে ফুটে উঠল পৃথিবীর একটা মানচিত্র। সেই মানচিত্রের ওপর লাল একটা রেখা টেলিফোন লাইন ট্রেস শুরু করল। প্রধান জংশন বা স্যাটেলাইটগুলোর ভেতর দিয়ে চলার পথে যে-সব স্থান সামনে পড়ল, নামগুলোর পাশে বৃত্ত তৈরি করল রেখাটা। সেভারনায়া থেকে সোজা সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, তারপর ইউরোপের ওপর দিয়ে আটলান্টিকে পড়ল, সেখান থেকে পৌঁছুল যুক্তরাষ্ট্রে, দ্রুত চলে এল আটলান্টায়.

তারপর থামল, শহরের ওপর লাল একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে।

ভিক্টরের স্ক্রীন এক সেকেণ্ডের জন্যে খালি হয়ে গেল, তারপর ফুটে উঠল কয়েকটা বাক্য—এফবিআই হেডকোয়ার্টারস, কমপিউটার ফ্রড ডিভিশন।

অশ্লীল কি যেন একটা বলল ভিক্টর, তারপর স্ক্রীন পরিষ্কার করার জন্যে দ্রুত চাপ দিল কীতে। 'একটা সিগারেট দরকার,' মুখ হাঁড়ি করে বলল সে।

'আমার দরকার কফি।' লিয়া ভিক্টরের দিকে তাকাল না, তাকাল নিজের স্ক্রীনের দিকে, দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা, তারপর চেয়ার ছেড়ে একটা দরজার দিকে পা বাড়াল। কিচেনে যাবে।

তার দিকে তাকিয়ে থাকল ভিক্টর, কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। সে-ও চেয়ার ছাড়ল, ভাব দেখে মনে হলো কাজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তবে কিচেনের দিকে নয়, সে গেল ইউটিলিটি লেখা একটা দরজার দিকে।

খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পাথুরে ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে ভিক্টর কিরগিজ। এই পথে বাইরের জগতে বেরুনো যায়। সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে ফিরে মুখ ভেঙাল, ঠেলে খুলে ফেলল দরজার কবাট, পা রাখল ঠাণ্ডা ও ফাঁকা মাটিতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লুকানো লাউডস্পীকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'কমরেড কিরগিজ, তুমি ইমার্জেন্সি এগজিট ব্যবহার করছ। আগেও তোমাকে জানানো হয়েছে, এটা বেআইনী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেকনিকাল এরিয়ায় ফিরে যাও।'

'বেরিয়ে এসে বাধা দাও আমাকে।' এ-ধরনের কাজ প্রায়ই করছে কিরগিজ, সবাই এটাকে তার নষ্ট স্বভাব বলে ধরে নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট প্রশ্রয় দেন তাকে, জানেন টেকনিশিয়ানদের মধ্যে তার গুরুত্বই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি।

পকেট থেকে এক প্যাকেট মার্লবরো সিগারেট বের করল কিরগিজ। গতবারের ছুটিতে প্রচুর পরিমাণে কিনেছিল। তার মত সব টেকনিশিয়ানই মোটা টাকা রোজগার করে। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে লাইটারের চাকা ঘোরাল সে। এক সেকেণ্ড জ্বলে নিভে গেল আগুনটা, যেন অকস্মাৎ জোরাল বাতাস লেগেছে।

চোখ তুলে আকাশে তাকাল কিরগিজ। হেলিকপ্টারের গাঢ় একটা কাঠামো পঞ্চাশ গজ দূরের ল্যাণ্ডিং প্যাডে নেমে আসছে, রোটরের বাতাস লাগায় তুষারের গুঁড়ো একটা ঘূর্ণি তৈরি করছে।

এক চুল নড়ল না কিরগিজ।

টাইগ্রি ল্যাণ্ড করেছে, ভাবল ওলগা পলিয়ানা। একটা সুইচ টিপে মাথার ওপর থেকে ককপিটের বুদ্বুদটা সরাল সে, দ্রুত হাতে খুলে ফেলল সেফটি হারনেস। ঝুঁকে পায়ের কাছে হাত নামাল, তুলে নিল ইসরায়েলে তৈরি উজি। ডান কাঁধে স্লিঙের সঙ্গে ঝোলাল সেটা। বেল্টের পাউচে আগে থেকেই রয়েছে স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

'রেডি, জেনারেল?' হেডসেটে কথা বলল পলিয়ানা।

'অনেকক্ষণ হলো রেডি হয়ে আছি আমি,' গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল। 'চলো, কাজটা সেরে ফেলি।'

দু'জনই তারা ইউনিফর্ম পরে আছে। একজন কর্নেল, অপরজন জেনারেল।

দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলকে চিনতে পারত রানা, কারণ শেষবার দিমিত্রি ডাচোভস্কি কুরুনভকে ও দেখেছে প্রিয় বন্ধু পিটার মুরেলের পাশে–তখন কুরুনভ ছিলেন কর্নেল, মুরেলের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র চেপে ধরেছিলেন তিনি।

অফিসার দু'জনকে দেখা মাত্র দ্রুত স্থান ত্যাগ করল কিরগিজ।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে ভাঙাচোরা বিল্ডিঙের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা, পাশাপাশি হাঁটছে। ওদের হাঁটার মধ্যে কোন রকম ইতস্তত ভাব নেই–উদ্দেশ্য বা গন্তব্য সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সংশয় নেই। বিধ্বস্ত বিল্ডিঙের কিনারা ঘেঁষে সরু একটা পথ আছে, সেই পথ থেকে বরফ ও তুষার পরিষ্কার করা হয়েছে। পথটা চলে গেছে মেইন ডোর পর্যন্ত। দরজার পর চওড়া সিঁড়ি, নিচে করিডর, তারপর একটা সিকিউরিটি ডোর।

লাফ দিয়ে সিধে হলো একজন গার্ড, স্যালুট করল দ্রুত, যদিও জেনারেল কুরুনভ তাকে প্রায় লক্ষই করলেন না। কি করছেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন তিনি, সরাসরি তাকিয়ে আছেন একটা ক্যামেরার দিকে। আই লেভেলে রয়েছে ওটা। কথা বললেন স্পষ্ট কণ্ঠে, 'জেনারেল দিমিত্রি ডাচোভস্কি কুরুনভ। হেড অভ স্পেস ডিভিশন।'

পিপ পিপ শব্দ করে সিস্টেমটা সচল হলো, ভয়েস রিকগনিশন রুটিন কমপ্লিট করছে। খানিক পরই খুলে গেল ইস্পাতের সিকিউরিটি ডোর, পলিয়ানাকে নিয়ে সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকার ভেতর ঢুকে পড়লেন জেনারেল কুরুনভ। কড়া স্যালুট ঠুকল ডিউটি অফিসার, তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড দ্রুত হাতে জ্যাকেটের বোতাম লাগাল।

'জেনারেল, যদি জানতাম আপনি আসছেন…।'

বিড়বিড় করল পলিয়ানা, 'তাহলে বুঝি ডিম ভেজে রাখতেন?'

'হ্যাঁ, জানলে আমাদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতেন আপনারা,' বললেন কুরুনভ। 'কিন্তু জানানো সম্ভব ছিল না, কারণ এটা সেভারনায়া ফ্যাসিলিটিতে আমাদের সারপ্রাইজ ভিজিট। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মহড়াও বলতে পারেন। এখান থেকে আমরা মিরাকল টেস্ট করব। রিপোর্ট স্টাটাস।' মুখ তুলে তাকালেন তিনি, দেখলেন কমপিউটর বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানরা ওঅর্ক স্টেশন থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা কি, তাদের প্রায় সবার চোখেই টিনটেড গ্লাস। 'কি হলো, কি বললাম তোমাকে?' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, মেজরের দিকে চোখ গরম করে তাকালেন। 'রিপোর্ট স্ট্যাটাস!'

'স্ট্যাটাস নরম্যাল, স্যার। দুটো অপারেশনাল স্যাটেলাইট–প্রাভা ও বিনিয়া, দুটোই একশো কিলোমিটার ওপর দিয়ে পৃথিবীকে নব্বুই মিনিটে একবার ঘুরে আসছে।'

'গুড। এই নাও অথোরাইজেশন কোড। মিরাকল, অ্যাকসেস নাম্বারস আর কী আমার হাতে তুলে দাও, প্লীজ।' এরইমধ্যে কাউন্টারে ছোট একটা প্লাস্টিক কার্ড ছুঁড়ে দিয়েছেন জেনারেল কুরুনভ। 'এই মুহূর্ত থেকে তোমার তৎপরতা শুরু হলো, সময়ের হিসাব রাখা হবে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন তিনি।

সব কাজ ঠিকমত করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ার অবস্থা হলো মেজরের।

সেফের সামনে মেটাল গেট খোলার জন্যে নম্বর লেখা বোতামে দ্রুত চাপ দিল সে। নিজের পরিচয় দেয়ার জন্যে পাম প্রিন্ট প্যাড ব্যবহার করতে হলো তাকে। সবশেষে বোতাম টিপে আজকের দিনের সেফ-এর কোড ব্যবহার করল। লক থেকে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, অনেকটা ডিজিটাল টেলিফোনের মত। অবশেষে ক্লিক করে খুলে গেল সেটা।

অপর অফিসারের উদ্দেশে হাত ঝাঁকাল পলিয়ানা, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল টেকনিকাল এরিয়ায় যাবার সিকিউরিটি ডোর খুলে দেয়া হোক। 'কি বলা হয়েছে, মনে আছে তো, ক্যাপটেন? যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মহড়া। গোটা ফ্যাসিলিটি খুলে দিতে হবে, কারণ অল্প সময়ের নোটিসে সবাইকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে পলিয়ানার নির্দেশ পালন করল ক্যাপটেন।

'আজকের কোড, স্যার। ইলেকট্রনিক ফায়ারিং কী। আর মিরাকল।' সেফ থেকে আইটেমগুলো বের করল ডিউটি অফিসার–কী, প্লাস্টিকের একটা কার্ড ও ছোট আকৃতির একটা গোল্ডেন ডিস্ক। ডিস্কটার মাঝখানে বিদ্যুতের ঝলকানি খোদাই করা রয়েছে।

'গুড। এবার অন্ধকে পথ দেখাও।'

ডিস্কের দিকে তাকাল মেজর, মাঝখান থেকে নখ দিয়ে খুঁটরে সোনালি একটা টেপ সরাল, বেরিয়ে পড়ল একটা খুদে বৃত্ত। মুখ তুলে জেনারেলের দিকে তাকাল সে।

'মিরাকল কিভাবে কাজ করে, তুমি জানো?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল কুরুনত।

'জানি, স্যার। নিখুঁত পজিশনে আনা হলে ডিস্কটা লেযার ছাড়ে, বেরিয়ে আসে মাঝখানের বৃত্ত থেকে–এই লেযার স্যাটেলাইটের ফায়ারিং মেকানিজমকে অ্যাকটিভেট করে।'

'গুড। যত্ন নিয়ে শিখেছ তুমি, মেজর। আমার ধারণা, আর কিছু দরকার নেই আমাদের।' পলিয়ানার দিকে ফিরলেন জেনারেল। 'কর্নেল। এবার আপনি দায়িত্ব নিন।'

মুখে ঠোঁট টেপা হাসি ধরে রেখে, প্রায় অলস ভঙ্গিতে, কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে দ্রুত সংক্ষিপ্ত দু'পশলা গুলি করল পলিয়ানা। গুলি খাবার সময়ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অফিসাররা, ব্যাপারটা তাদের কাছে এতই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। অফিসাররা ধরাশায়ী হয়নি তখনও, ঘুরে গেল পলিয়ানা, অচঞ্চল পায়ে এগোল দরজার দিকে। আরও এক পশলা গুলি করল সে, এবার দীর্ঘ। যেন বুলেট স্প্রে করছে, ম্যাগাজিন শেষ হতে আবার তা ভরে নিল রোবট সুলভ দক্ষতার সঙ্গে।

ক্ষতবিক্ষত শরীরগুলো আছড়ে পড়ল ইকুইপমেন্টের ওপর, কেউ কেউ এক আধ পাক ঘুরে গেল, ঝর্ণার মত ছড়িয়ে পড়ল আগুনের ফুলকি, কমপিউটর ওঅর্ক-স্টেশন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়া। গোটা ব্যাপারটা শেষ হতে সময় লাগল ত্রিশ সেকেণ্ডেরও কম।

কিচেনে দাঁড়িয়ে ছিল লিয়া, তার কাপ থেকে খানিকটা কফি ছলকে পড়ল। ঝট করে মুখ তুলল সে, চোখে আতঙ্ক। 'কি ঘটছে। এ অসম্ভব!' আপনমনে

বিড়বিড় করছে সে।

ওদিকে মেইন কন্ট্রোল রুমে নিহত ডিউটি অফিসারের লাশের দিকে ঝুঁকল পলিয়ানা। লাশের গলায় রুপালি একটা চেইন ঝুলছে, সেটা থেকে দ্বিতীয় ফায়ারিং কী খুলে নিল সে, হেঁটে চলে এল লম্বা কনসোলের সামনে। আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন জেনারেল কুরুনভ, একের পর এক সুইচে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করছেন। ইনস্ট্রুমেন্টের ওপর স্ক্রীন আলোকিত হয়ে উঠল।

খুব সাবধানে ও যত্নের সঙ্গে মিরাকল ডিস্ক একটা পটে ঢোকালেন কুরুনভ, সিডি প্লেয়ারের সঙ্গে ওটার চেহারার প্রচুর মিল আছে। আজকের দিনের কোড কার্ডটা নিজের সামনে রাখলেন তিনি, কী ঢোকালেন একটা তালায়। মিরাকল ডিস্ক যে জায়গায় ঢুকেছে তার ডান দিকে তালাটা। ডিউটি অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় চাবিটা আগেই জায়গামত ঢুকিয়ে দিয়েছে পলিয়ানা। জেনারেল বললেন, 'অন মাই কাউন্ট। থ্রী, টু, ওয়ান, জিরো।'

চাবি দুটো একযোগে ঘোরাল ওরা। কনসোলের বাকি অংশ আলোকিত হয়ে উঠল, জ্বলে উঠল অনেকগুলো কাঁটা, ওদের ওপর স্ক্রীনে ফুটে উঠল পৃথিবীর খানিকটা অংশ সহ স্যাটেলাইটগুলোর একটা।

'সেট টার্গেট অ্যাকুইজিশন ফর প্রাভা, পলিয়ানা,' নির্দেশ দিলেন জেনারেল।

পৃথিবীর বুক থেকে অনেক ওপরে জিনিসটা, দেখে মনে হবে মহাশূন্যের আবর্জনা, হয়তো পুড়ে যাওয়া কোন রকেটের অংশবিশেষ। একটা কক্ষপথ ধরে ডিগবাজি খেতে খেতে ঘুরছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সেভারনায়া থেকে শব্দবিহীন কমাণ্ড লাফ দিল, ছুটল মহাশূন্যের দিকে, আর একটু পরই প্রাভা নামে ওই স্যাটেলাইটের গোপন প্রোপালশন ইউনিট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিক বদলের কাজ শুরু করে দিল।

কন্ট্রোল রুমের ভেতর স্ক্রীনে চোখ রেখে এই মুহূর্তে ওরা যা দেখছে, আধ ঘণ্টা আগে লিয়াও ঠিক তাই দেখেছিল। স্ক্রীনে ফুটে ওঠা রেড সিম্বলটাই প্রাভা, এখন দ্রুত এগোচ্ছে সেটা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে অবিশ্বাস্য গতিতে চলে আসছে উত্তর রাশিয়ায়।

নিচের একটা ডিসপ্লে স্ক্রীনে তথ্য আসছে। লেখাগুলো তো ফুটছেই, স্পীকার থেকে আওয়াজও বেরুচ্ছে।

প্রাভালোকেশন:
টার্গেট:
তারপর:
টাইম টার্গেট:

কোড কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নম্বর লেখা বোতামে চাপ দিলেন জেনারেল কুরুনভ। ডিসপ্লেতে নতুন একটা মেসেজ ফ্ল্যাশ করল।

উইপন আর্মড।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ডিসপ্লের আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল লিয়া, হাত থেকে ফেলে দিল কাপটা। নিস্তব্ধ ফ্যাসিলিটির ভেতর গ্রেনেড বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো।

জেনারেল ও পলিয়ানা, দু'জনেই ঝাঁকি খেলো।

'চেক করে দেখো!' ফিসফিস করলেন জেনারেল।

পা বাড়াল পলিয়ানা, একই সঙ্গে নড়ে উঠল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। নিজের রক্তে ভাসছে লোকটা, মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে তার এই নড়াচড়াকে স্রেফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন বলতে হবে। শুধু তার একটা হাত উঁচু হলো, অনেকগুলো অ্যালার্ম বাটনের একটায় থাবা মারল সে।

ঝট করে আধ পাক ঘুরল পলিয়ানা, ফায়ার করল উজি থেকে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, আকস্মিক ওয়ার্নিং অ্যালার্ম ও সাইরেনের আওয়াজ ওদের কানে তালা লাগিয়ে দিল।

দাঁড়িয়েই আছে পলিয়ানা, জেনারেলের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে।

'তোমার কাজ তুমি শেষ করো। বেস্ট রেসপন্স টাইম সেভেনটিন মিনিটস। এই জায়গায় আঘাত লাগবে এখন থেকে পনেরো মিনিট পর। যাও।'

কিচেনে দাঁড়িয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল লিয়া। মেইনটেন্যান্স গ্রিলটা সিলিঙের গায়ে, নাগাল পাওয়া সহজ নয়। গ্রিলটার সরাসরি নিচে একটা চেয়ার টেনে আনল সে। চেয়ারে দাঁড়িয়ে স্ক্রু খুলছে। গ্রিলটা প্রায় খুলে এনেছে, এই সময় প্যাসেজে পায়ের আওয়াজ হলো। পলিয়ানা আসছে।

বহু মাইল দূরে, সাইবেরিয়ার অ্যানাদির এয়ারবেস। তিনটে মিগ-টোয়েনটি থ্রী এমডিএল মেইন রানওয়ে ধরে ছুটল। পাইলটরা মাত্র ডিউটিতে এসেছে, এই সময় অ্যালার্ম শোনা গেছে। টার্গেট ইনফরমেশন পেয়েছে বাংকার থেকে প্লেন নিয়ে বেরুবার সময়। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেভারনায়া স্টেশনের পথে রওনা হয়ে যাবে তারা।

লাথি মেরে কিচেনের দরজা খুলে ফেলল পলিয়ানা। মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা কাপ আর কফি দেখল সে। তারপর চোখে পড়ল চেয়ারটা, দৃষ্টি উঠে গেল ওপরের গ্রিলে। খোলা হয়েছে ওটা, সিলিং থেকে ঝুলছে।

আপনমনে হাসল পলিয়ানা। হাতের উজিটা তুলল সে। পুরো সিলিঙে বিরতিহীন গুলি করল। ম্যাগাজিন বদলে আরও একবার। সিলিঙে যে-ই লুকিয়ে থাকুক, তার আর বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

কনসোলের সামনে ফিরে এল পলিয়ানা। তার দিকে তাকালেন জেনারেল, চোখে প্রশ্ন। মাথা ঝাঁকিয়ে পলিয়ানা তাঁকে জানাল, ওদিকটা সে সামলেছে।

ক্ষীণ প্রশংসার হাসি ফুটল জেনারেল কুরুনভের ঠোঁটে। তারপর ইঙ্গিতে টাইমারটা দেখালেন। সময় খুব দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। 'সময় শেষ, কর্নেল,' বললেন তিনি।

'পশ্চিমে একটা প্রবাদ আছে, জেনারেল,' বলে হাসল পলিয়ানা। 'সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়, বিশেষ করে তুমি যখন আনন্দে অবগাহন করছ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মিরাকল ডিস্কটা কনসোল থেকে তুলে নিলেন জেনারেল, ভরলেন নিজের ব্রিফকেসে। 'এবার আমাদের কেটে পড়া দরকার।'

একযোগে পা ফেলে এগোল ওরা। ভয়েস প্রিন্ট সিকিউরিটি সিস্টেম ব্যবহার করল আবার। কংক্রিটের ধাপ বেয়ে নেমে এল বাইরের হিম জগতে।

চার মিনিট পর একরাশ তুষার ছড়িয়ে আকাশে উঠল টাইগ্রি হেলিকপ্টার। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আসার বা ফেরার পথে সেভারনায়া স্টেশনের আশপাশে ভাল করে চোখ বুলায়নি ওরা, কারণ জানত এদিকে কোন মানুষজন থাকে না, কাজেই দেখার মত কিছু নেইও। সেজন্যেই দুর্ভাগা এস্কিমো লোকটার লাশ ওদের চোখে পড়েনি।

কুকুরগুলো ইতিমধ্যে সেটলমেন্টের দিকে রওনা হয়ে গেছে। লাশটা পড়ে আছে নিঃসঙ্গ।

মাটির নিচে, কিচেনে, একটা কাবার্ডের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে লিয়া। দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

রানা এই মুহূর্তে বিসিআই লণ্ডন শাখার আণ্ডারগ্রাউণ্ড অপারেশনস রুমে নামছে।

সাত

বিসিআই চীফ রাহাত খানের অন্যতম পার্সোনাল সেক্রেটারি তাসমিনা হক তুলির সঙ্গে অপারেশনস রুমে নামছে রানা। বাঙালী মেয়ে, হলে কি হবে, পরে আছে চোখ ধাঁধানো ইউরোপিয়ান ড্রেস। তার স্কার্টটা টকটকে লাল, সাদা শার্ট, পায়ে হাইহিল।

লিফটে চড়ল ওরা, রানা বিড়বিড় করে বলল, 'ড্রেস টু থ্রিল।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?' কথাটা এত আস্তে বলেছে রানা, তুলির শুনতে পাবার কথা নয়, অথচ ঠিকই শুনে ফেলেছে। লণ্ডন শাখার অফিসাররা কৌতুক করে বলেন, তুলি যদি রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ও, তার কান দুটো নির্ঘাত ইলেকট্রনিকস-এর তৈরি। সে নাকি লণ্ডনে বসে তার সম্পর্কে হেডকোয়ার্টার ঢাকায় কে কি বলছে, সব শুনতে পায়।

'না, মানে, আমার মনে হলো, আগে কখনও এত সুন্দর লাগেনি তোমাকে।'

'ও, এই কথা। ধন্যবাদ, রানা।'

'আজ রাতে বিশেষ কোন অ্যাসাইনমেন্ট আছে নাকি?'

'তোমার মত হিরোরা কখন ডাকবে, সেই আশায় বসে থাকি না আমি,' স্পষ্ট জবাব দিল তুলি। 'সত্যি যদি জানতে চাও, আমার একটা ডেট আছে। আ ডেট উইথ আ জেন্টলম্যান। আমরা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।'

'আধুনিক? নিশ্চয়ই খুব ক্লান্তিকর নয়?'

'শেকসপীয়ার অ্যাকচুয়ালি। লাভ'স লেবারস লস্ট।'

'আমি সত্যি বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। তুমি না থাকলে কি যে হত!'

বাঁকা চোখে তাকিয়ে সামান্য হাসল তুলি। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, রানা,

তোমার জীবনে বা তোমার কাছে আমি কখনও ছিলাম না।'

রানাও বাঁকা চোখে তাকাল। 'না, ছিলে না, ছিলে শুধু ফ্যান্টাসি আর দিবাস্বপ্নে।' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ও।

মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল তুলি। 'রানা, তুমি জানো, আজকাল এ-ধরনের কথাবার্তাকে অনায়াসে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলে চালানো যায়।'

'শাস্তিটা কি?'

লিফট দাঁড়িয়ে পড়ল, খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে যাচ্ছে তুলি, কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার রানার দিকে তাকাল, চোখের তারায় প্রশ্রয় ও দুষ্টামি মেশানো একটা ভাব ঝিক করে উঠল। 'রানা, আর দেরি কোরো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাল হয়ে যাও।'

অপারেশনস রূমের ভেতর দিয়ে পথ দেখাল সে। প্রতিটি স্ক্রীন আলোকিত, জনা কয়েক নারী ও পুরুষ যে যার ডেস্কে বসে হয় মনিটরে তাকিয়ে আছে, নয়তো কানে হেডফোন লাগিয়ে মেসেজ রিসিভ করছে। এক পাশে একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সিনিয়র অফিসারদের, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন নিচু গলায়।

রানার ব্যক্তিগত জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোহেল আহমেদ, ঢাকা থেকে সে-ও যে বসের সঙ্গে লণ্ডনে এসেছে, ওর জানা ছিল না। সিনিয়র অফিসারদের ভিড় থেকে হঠাৎ তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলো রানা। 'কি রে, তুই?'

'হ্যাঁ, মুই।' সহাস্যে এগিয়ে এসে রানার দু'কাঁধে হাত রাখল সোহেল, বোঝার উপায় নেই তার দু'হাতের কোনটা কৃত্রিম। 'কেমন আছিস?'

'তোরা যেমন রেখেছিস। ছিলাম ছুটিতে, ডেকে পাঠিয়ে দিলি সব বরবাদ করে।'

'পরে বুঝবি কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে আমাদের ডেকে পাঠানোটা কোন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না, কারণ তার আগে নিজেই তুই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিস।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল সোহেল। 'এক সেকেণ্ড। তোকে ডেকে পাঠানোয় তুই অসন্তুষ্ট, দোস্ত? তাহলে বলতে হবে নতুন কথা শুনছি। আমরা তো জানি থ্রিল, অ্যাডভেঞ্চার এসব তুই ভালবাসিস।'

সোহেলের রসিকতায় যোগ না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'কি ঘটছে বল তো?' ইঙ্গিতে মনিটরগুলো, একই সঙ্গে বড় আকৃতির ভিডিও ওয়ালটা দেখাল। স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবি ফুটে রয়েছে ওগুলোয়, সবগুলোতে একই ছবি—অনুর্বর, নির্জন জমিন, তুষার ও বরফে ঢাকা, সেভারনায়া স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ, রেডিও টেলিস্কোপ ডিশ। 'ব্যাপার খুব সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে।'

'খুবই সিরিয়াস, রানা। একটু অলংকৃত ভাষায় বললে, সাংঘাতিক অপ্রীতিকর। শোন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অপারেশনস রূমে যা কিছু ঘটছে, এখানেও তাই ঘটছে। মানে, ওঁরা যা দেখতে বা ধরতে পারছে, আমরাও তাই দেখতে ও ধরতে পারছি। ঠিক আছে? এবার বলি—প্রায় মিনিট দশেক আগে আমরা একটা অ্যালার্ম সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করেছি, তথাকথিত পরিত্যক্ত রাডার

স্টেশন সেভারনায়া থেকে প্রচারিত…।'

'সেভারনায়া…সে তো রাশিয়ার একবারে উত্তর প্রান্তে।'

'ঠিক তাই। স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স কি সংগ্রহ করেছে দেখ শুধু।' একজন টেকনিশিয়ানকে নির্দেশ দিল সোহেল। ভিডিও ওয়াল-এর ফটো পিছিয়ে যেতে শুরু করল, তারপর স্থির হলো। এনলার্জ করা হলো ছবিটা। 'কি বল তো?' জিজ্ঞেস করল সে, জবাবও দিল, 'তোর নিখোঁজ টাইগ্রি।'

সত্যি তাই, সাদা বরফের গায়ে কালো কাঠামোটা অত্যন্ত স্পষ্ট। ভিডিও স্ক্রীনের পাশে ছোট আরেকটা স্ক্রীন আলোকিত করল টেকনিশিয়ান, তাতেও হেলিকপ্টারটা থাকল, পাশে ওটার ডিজাইন ও প্ল্যান।

'মন্টি কার্লো থেকে রাশিয়ার উত্তরে। খুব বড় একটা লাফ দিয়েছে বলতে হবে।'

'আমি মনে করি, এ থেকে রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট সম্পর্কে তোর থিওরিটাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে,' বলল সোহেল। 'বস তোকে ফিল্ড থেকে ডেকে না নিলেই ভাল করতেন। এখনও যদি তাসের রানীর পিছনে লেগে থাকতিস…।'

'কি নিয়ে কথা বলছ তোমরা?' রাহাত খানের গলা, ওদের পিছন থেকে।

'না, মানে…।'

'কাউকে শত্রু বলে জানাটাই বড় কথা নয়,' বললেন রাহাত খান। 'এ-ও জানতে হবে যে শত্রুর উদ্দেশ্যটা কি। শত্রু তো আমাদের সবাই, তাই বলে কি আমরা সবাইকে ধাওয়া করছি? কেউ যখন কিছু একটা করতে যায়, আমরা তাকে বাধা দিই। রানাকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে ব্রিফ করার জন্যে।'

'জ্বী-স্যার,' সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'তাছাড়া, এবার আমাদের শত্রুর হাতে রয়েছে ইলেকট্রনিক অস্ত্র, ওটার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু কোথাও নেই,' বললেন রাহাত খান। 'আরও একটা ব্যাপার। এই কাজটায় ইংল্যাণ্ডের, মানে বিএসএস-এর সাহায্য নিতে হবে। ফিল্ড থেকে রানাকে ডেকে পাঠাবার সেটাও একটা কারণ। আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি নেই, এটা ভুলে যেয়ো না।'

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'তাসের রানী, তাই না?' মৃদু হাসলেন রাহাত খান। 'ইতিহাসে যাদেরকে তাসের রানী বলা হয়েছে, তারা সবাই ছিল অশুভ শক্তি। প্রতিটি ক্ষেত্রে শুভ শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে তারা। এক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেটাই আশা করব। সোহেল, তোমার বিফ্রিং শুরু করো।'

ভিডিও ওয়ালের দিকে এগোল সোহেল। 'ডিসট্রেস সিগন্যালের পর, রানা, সেভারনায়া থেকে টাইগ্রি টেক-অফ করে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই রাশিয়ানরা তিনটে মিগ পাঠায় আনাদির বেস থেকে। সেভারনায়ার দিকে ছুটছে ওগুলো, ঠিক সে-সময় অজ্ঞাতপরিচয় এক টুকরো মহাশূন্য আবর্জনাকেও ছুটতে দেখা গেছে। আবর্জনা বলছি এই কারণে যে, এতদিন ওটাকে অন্য কিছু বলে মনে হয়নি।'

'কিন্তু আমার জানামতে সেই নব্বুই সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেভারনায়া স্টেশন,' বলল রানা। 'ওরা কি আবার ওটা চালু করেছে?'

'আমার ধারণা, কোনদিনই ওটা বন্ধ করা হয়নি। ওটার বিধ্বস্ত চেহারা আর কিছু নয়, স্রেফ কসমেটিক।'

'তাহলে কি কাজে ওটা ব্যবহার করছে ওরা?'

'এক সময়,' কথা বলার সময় উদ্বিগ্ন দেখাল সোহেলকে, 'আমরা সন্দেহ করতাম যে গোপন স্পেস-বেসড উইপনস প্রোগ্রাম-এর গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল স্টেশন হিসেবে সেভারনায়াকে ব্যবহার করছে ওরা। ওই প্রোগ্রামের কোডনেমও আমরা বের করে ফেলি–মিরাকল। কিন্তু...।'

মাঝখান থেকে কথা বললেন রাহাত খান, 'কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যানালিস্ট, ইলেকট্রনিক ও স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স বলল যে কাজটা করার জন্যে ফাণ্ড বা টেকনোলজি ওদের নেই। এখানে আমাদের বলতে আমি শুধু বিসিআইকে বোঝাচ্ছি না, সিআইএ ও বিএসএস-কেও বোঝাচ্ছি।'

রানা জানতে চাইল, 'ছবিগুলো কি আমরা লাইভ দেখছি?'

'হ্যাঁ, লাইভ।' বাকি দু'জনের মত রাহাত খানও মুখ তুলে স্ক্রীনের দিকে তাকালেন। লাল একটা আলো মিট মিট করছে ওখানে। আরও দেখা যাচ্ছে আলোকিত সেভারনায়া। আলোর সচল বিন্দুগুলো যে রাশিয়ান মিগ, সেভারনায়ার দিকে ছুটে যাচ্ছে, কাউকে তা বলে দিতে হলো না।

সেভারনায়ার মাটির নিচে, একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়া। সে তার বন্ধুদের ক্ষতবিক্ষত, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশ দেখছে। বিস্ময়ের আঘাত অসাড় করে তুলেছে তাকে, আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা। কপালের পাশটা টিপে ধরল সে, চিন্তাশক্তি ফিরে না আসায় অসহায় বোধ করছে।

বোবা দৃষ্টিতে ম্যাপের দিকে তাকাল লিয়া। ম্যাপের নিচে কাউন্টারে বিভিন্ন রঙের আলোকিত কাঁটা ও গ্রাফ এখনও সচল। কিছু ছবি ও সিম্বলের অর্থ সহজেই ধরা পড়ল মস্তিষ্কে, বুঝল তার স্মরণশক্তির কোন ক্ষতি হয়নি। আত্মবিশ্বাস একটু বাড়ল। করণীয় স্থির করা সহজ হয়ে গেল। একটা দরজার দিকে ছুটল সে, ওই পথে পীপিং কোয়ার্টারের দিকে যাওয়া যায়।

ফ্যাসিলিটি ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে হবে তাকে। বাইরে বরফ আর তুষার, কাজেই কালো স্কার্ট আর সাদা শার্টে কাজ হবে না, গরম কাপড়চোপড় দরকার তার। যদিও জানা নেই বাইরে বেরিয়েই বা কতদূর যেতে পারবে সে। সেভারনায়া স্টেশনের আশপাশে কি আছে না আছে সে-সম্পর্কে তার তেমন ধারণাও নেই।

নিজের কামরায় ঢুকে থারমাল আণ্ডারওয়্যার পরল লিয়া। কোমরে জিনস তুলল, পায়ে গলাল ভারি লেদার বুট। এই বুট জোড়া শেষ বার ছুটিতে গিয়ে কিনেছিল সে। গায়ে পরল মোটা ফার কোট, মাথায়ও ফার হ্যাট। হাতে দস্তানা পরার ধৈর্য হলো না, ওগুলো বগলে চেপে ছুটল আবার। ফিরে যাচ্ছে টেকনিক্যাল এরিয়ায়। সঙ্গে টাকা নিতে ভোলেনি।

জেট তিনটে সেভারনায়ায় পৌঁছে গেছে। কমপ্লেক্সের এক হাজার ফিট ওপরে

রয়েছে, একটা ত্রিভুজের আকৃতি নিয়ে। লিয়া ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, সে কোন আওয়াজ পাচ্ছে না। মিগগুলোর লীডার কথা বলছে বেসের সঙ্গে। বলছে, দেখে মনে হচ্ছে সব কিছু স্বাভাবিক।

প্লেনগুলোর ওপরে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো আবর্জনার টুকরোটা আকৃতি বদলাচ্ছে। এই মুহূর্তে মাটি থেকে একশো কিলোমিটার ওপর রয়েছে ওটা। গা থেকে খসে পড়ছে পোড়া কয়লার মত দেখতে কালো মেটাল, ওগুলো আসলে স্রেফ বহিরাবরণ। কঠিন ইস্পাতের শাঁস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে প্রাভা, ওটার চারপাশ থেকে অনেকগুলো শীল্ড ছড়িয়ে পড়ল, বিপজ্জনক সরীসৃপের মত। তারপর, নিচের দিকে সামান্য কাত হয়ে, বিস্ফোরিত হলো ওটা।

হঠাৎ করে সেভারনায়ার আশপাশ চোখ-ধাঁধানো, মোচাকৃতি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আলোটার ভেতর মোচড়রত কয়েকশো ইলেকট্রিক চার্জ বা বৈদ্যুতিক ঝলক রয়েছে, দীর্ঘ নীল সাপের মত।

দুটো মিগ, একটার ওপর একটা ছিল, চোখের পলকে ইলেকট্রিসিটির কুণ্ডলী গ্রাস করল ওগুলোকে। ওপরের মিগটাকে যেন চাপড় মেরে নামিয়ে দেয়া হলো। দুটো প্লেন এক হলো, তারপর উজ্জ্বল আগুনের ঝলকানি দেখা গেল, দুটোই একযোগে বিস্ফোরিত হয়েছে।

তৃতীয় জেটও একইভাবে ইলেকট্রিক্যাল বজ্রপাতে আক্রান্ত হলো। এক নিমেষে উল্টে গেল সেটা, ঝাঁপ দিল মাটির দিকে। পাইলট মরিয়া হয়ে ইজেক্ট হ্যাণ্ডল টানছে। কাজটা তার শেষ হলো না, বুলেটের মত রেডিও টেলিস্কোপ ডিশে আঘাত হানল জেট। অগ্নিকুণ্ড ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না।

মাটির তলায় লিয়ার মনে হলো নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হচ্ছে। গোটা কমপ্লেক্স থর থর করে কাঁপতে শুরু করল, তারপরই নিভে গেল সব আলো। টেকনিকাল এরিয়া অন্ধকার হয়ে গেল, একা ভয় করছে তার। তারপরই শুরু হলো চোখ ধাঁধানো নীল আলোর ছুটোছুটি, কমপিউটর রূমে যেখানে যত ইলেকট্রনিকস আছে সবগুলো থেকে বিদ্যুৎ চমকের মত নীল বিচ্ছুরণ ঘটছে।

পালাবার কথা মনে পড়তেই নীল ফুলকিগুলোকে এড়িয়ে আবার ছুটল লিয়া। ডিউটি অফিসারের লাশ টপকাতে গিয়ে হোঁচট খেলো সে, কোন রকমে আছাড় খাওয়া থেকে বাঁচল। টলতে টলতে ভয়েস রিকগনিশন ইউনিটের দিকে এগোল সে। দু'বার নিজের নাম উচ্চারণ করল, কিন্তু কিছুই ঘটল না। কিরগিজের কথা মনে পড়ল তার, মনে পড়তে আবার বিরতিহীন বিদ্যুৎ চমকের রাজ্যে ফিরে এল। থামল না লিয়া, ইউটিলিটি এস্কেপ ডোরের দিকে এগোল।

দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে সে, এই সময় গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। মাথার ওপর কি যেন বিকট শব্দে ভাঙতে শুরু করেছে। লাফ দিয়ে একপাশে সরে এল লিয়া। দেয়ালে বসানো একজোড়া মনিটর সবেগে নেমে এল নিচে। ওগুলো নিচে পড়ার পরও ভাঙনের আওয়াজ থামল না। মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। চঞ্চল নীল আলোয় দেখল গোটা সিলিংটাই ধসে পড়তে যাচ্ছে।

জীবনে কখনও এরকম ভয় পায়নি লিয়া। বদ্ধ পাতালে কাজ করলেও, এখানে আরাম-আয়েশের এত সব সুব্যবস্থা আছে যে একবারও মনে হয়নি জীবিত মাটি চাপা পড়ার মত ঘটনা ঘটতে পারে। যা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, এই মুহূর্তে ঠিক তাই ঘটতে চলেছে। জানা কথা, সেভারনায়া ফ্যাসিলিটি অসম্ভব মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে এটা ডেবে যাচ্ছে? সিলিং ভেঙে পড়ার কি রহস্য?

যেভাবে হোক বাঁচতে হবে তাকে। জ্যান্ত অবস্থায় যদি চাপাও পড়ে, জঞ্জাল সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করবে সে। তার মাথার ওপর কংক্রিটের সিলিং গোঙাচ্ছে এখনও। বাতাসে ধুলো, চোখ করকর করছে, শুকিয়ে ফেলছে গলার ভেতরটা। নাকে ও মুখে হাত চাপা দিল সে। ছুটে পালাবার প্রবল ইচ্ছে হলেও, নড়তে ভয় পাচ্ছে সে। কখন নেমে আসবে সিলিংটা কে জানে।

আওয়াজটা আরও বাড়ছে শুনে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল লিয়া। তার ভাবটা যেন, দেয়ালে গর্ত তৈরি করে আশ্রয় নেবে। এতক্ষণে ধসে পড়ছে সিলিং। কেঁদে ফেলল সে। ভাঙচুরের বিকট শব্দ শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তার, মনে হলো বাংকারের পুরোটাই ধসে পড়েছে।

নীল আলোয় লিয়া দেখল, ছাদের অর্ধেকটা নেই। ওদিকের ছাদের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে অনেকগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও রেডিও টেলিস্কোপের অংশ বিশেষ, সেগুলোর সঙ্গে রয়েছে প্লেনের কিছু ভাঙা টুকরো।

ধীরে ধীরে সরে গলে ধুলো। এতক্ষণে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ টের পেল লিয়া। ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে। এখানে সত্যি তার জ্যান্ত কবর হতে পারত। ছাদ ধসে পড়ায় বেরুবার একটা পথ এখনও আছে।

জঞ্জাল থেকে গরম আঁচ বেরুচ্ছে। পায়ে বুট থাকায় চামড়া পুড়ছে না। ধীরে ধীরে পা ফেলছে লিয়া। ঢালের মত হয়ে আছে জঞ্জালের স্তূপ, উঠতে কষ্ট হচ্ছে তার। উঠছে, আর ছোটবেলার সেই বুড়ো আপেল গাছটার কথা ভাবছে সে। ওই গাছটায় চড়তে গেলেই দাদী-মা তেড়ে আসতেন। চোখ খোলা রেখেই কল্পনা করল, এখনও সেই আপেল গাছটায় চড়ছে সে, ভেঙে পড়া কংক্রিটের প্যাবে নয়।

হঠাৎ আবার কিরগিজের কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল, সিগারেট খেতে বাইরে যাচ্ছিল সে। বাইরে যাওয়াটা বেআইনী, জানা সত্ত্বেও। জঞ্জালের স্তূপ বেয়ে মাথায় উঠে এল লিয়া, কিরগিজের নাম ধরে ডাকল। 'ভিক্টর! ভিক্টর কিরগিজ! ভিক্টর, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কেউ সাড়া দিল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাল লিয়া। ঠাণ্ডা ও তাজা বাতাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দাঁড়িয়ে রয়েছে তুষারের ওপর একা। না, একা নয়। কিরগিজও আশপাশে কোথাও আছে। শেষবার তাকে সিগারেট খাওয়ার জন্যে বাইরে আসতে দেখেছে লিয়া। আবার ডাকল সে, 'কিরগিজ, তুমি কোথায়? কিরগিজ, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

এবারও সাড়া দিল না কেউ।

*

বিসিআই লণ্ডন শাখার অপারেশনস রুমে তখনও রানা ও রাহাত খানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহেল, অকস্মাৎ সাদা আলোর একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খালি হয়ে গেল মনিটর স্ক্রীনগুলো।

'কি ব্যাপার? কি ঘটল?' চমকে লাফিয়ে উঠল সোহেল।

আলোর বিস্ফোরণে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে রাহাত খানের, চোখ মিটমিট করলেন তিনি। নড়েচড়ে উঠেছে রানাও, ভাব দেখে মনে হলো যে-কোন দিকে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল রাহাত খান ও সোহেল ছোঁ দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলছে।

বহু দূরে, টাইগ্রির ভেতর, জেনারেল কুরুনভ ও ওলগা পলিয়ানা অনবরত এক পাশ থেকে আরেক পাশে ছিটকে পড়ছে, এমনকি পঞ্চাশ মাইল দূরে থেকেও নীল ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারের নৃত্যরত সাপগুলো ওটার নাগাল পেয়ে গেছে। হেলিকপ্টারের কোন ক্ষতি হয়নি, সেটা লক্ষ করে পলিয়ানা ভাবল, ফ্রেঞ্চরা আসলেই অদ্ভুত এক জিনিস বানিয়েছে। টাইগ্রি সত্যি অজেয় একটা মেশিন।

কান থেকে টেলিফোনের রিসিভার সরিয়ে সোহেল ঘোষণা করল, "আমাদের স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে গেছে।' এখানে আমাদের মানে বুঝতে হবে ব্রিটেনের। 'সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে আমেরিকানদের একজোড়া স্যাটেলাইট। আমাদের অপর একটা স্যাটেলাইট যে-কোন মুহূর্তে রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে...।'

স্ক্রীন পরিষ্কার হয়ে গেল, খালি অংশ ভরে উঠল স্যাটেলাইট ইমেজে। সেভারনায়াকে অন্ধকার দেখাল, এখানে সেখানে দু'এক জায়গায় আগুন দেখা যাচ্ছে শুধু। তারপর ডিশটা দেখা গেল, কাত হয়ে আছে, জ্বলন্ত মিগ বিমানের সঙ্গে পেঁচানো অবস্থায়।

'গুড গড!' কে যেন বিড়বিড় করল।

'দুটো মিগ পড়ে গেছে। পাওয়ার'স আউট...'

স্ক্রীনের আরও কাছে সরে এলেন রাহাত খান। 'দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় মিগটা ডিশের গায়ে বাড়ি খেয়েছে।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার কি ধারণা, রানা?'

স্ক্রীনে চোখ, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে রানা। 'বিল্ডিংগুলো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে,' বলল ও। 'কোন গাড়ি বা ট্রাক চলাচল করছে না। একটা হেডল্যাম্প পর্যন্ত দেখছি না। আমি বলব–ইএমপি।'

সোহেল গম্ভীর হলো, মাথা ঝাঁকাল নিঃশব্দে। তবে রাহাত খান তার দিকে না তাকানো পর্যন্ত মুখ খুলল না। 'আমারও তাই ধারণা, ইএমপি। এয়ারক্রাফট আর স্যাটেলাইট ধ্বংস করা আর কিছুর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ইএমপি,' বললেন রাহাত খান। 'ব্যাখ্যা করো, রানা।'

'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক-পালস,' বলল রানা, জানে রাহাত খান ওকে পরীক্ষা করছেন। 'আ ফাস্ট স্ট্রাইক উইপন ডেভলপড বাই বোথ দ্য আমেরিকানস অ্যাণ্ড সোভিয়েতস, ডিউরিং দ্য কোল্ড ওঅর। হিরোশিমায় বোমা ফেলার পর কেউ একজন লেখে থিওরিটা। আপার অ্যাটমসফিয়ারে একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস সেট

অফ করা হয়, ফলে একটা পালস তৈরি হয়–আ র‍্যাডিয়েশন সার্জ অ্যাকচুয়ালি-ইলেকট্রনিক সার্কিট আছে এমন যে-কোন জিনিস ধ্বংস করে দেয়।'

রানা থামতেও ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন রাহাত খান, ভাবটা যেন এখনও সন্তুষ্ট নন। 'আইডিয়াটা কি?' জানতে চাইলেন তিনি।

কাজেই আবার মুখ খুলতে হলো রানাকে, 'আইডিয়াটা হলো, এমন একটা অস্ত্র হাতে পাওয়া যা দিয়ে শত্রুপক্ষের কমিউনিকেশন ধ্বংস করে দেয়া যায়, তারা পাল্টা আঘাত হানার আগেই।'

'যার কথা এতদিন শুনে আসছি, এটাই কি তাহলে সেই মিরাকল?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'এর মানে কি মিরাকল বাস্তব সত্য?'

'জ্বী, স্যার।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাহাত খান আবার জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হবার কোন সম্ভাবনা আছে?'

'নেই, স্যার। হেলিকপ্টার চুরি হওয়ায় ব্যাখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে। একটা মিরাকল চুরি করতে হলে গেট-অ্যাওয়ে ভেহিকেল হিসেবে টাইগ্রি আদর্শ। মিরাকলকে একবার অ্যাকটিভেট করা হলে, কেউ আর তাকে থামাতে পারবে না। ফলে একটা সমস্যা দেখা দেয়। খুব তাড়াতাড়ি এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে, একই সঙ্গে মুছে ফেলতে হবে সমস্ত এভিডেন্স। মিরাকলকে নিখুঁত ট্রিগারিং অ্যাণ্ড গাইডেন্স ডিভাইস বলা যেতে পারে। কেউ ওটা চুরি করতে চাইলে টাইগ্রির মত একটা হেলিকপ্টার তার লাগবেই।'

'এবং তোমার ধারণা, এর পিছনে রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট জড়িত?' রাহাত খানের বলার সুরে সামান্য তিক্ততা।

'একমাত্র ওরাই জড়িত, এ-কথা জোর করে বলা যায় না।' মাথা নাড়ল রানা। 'এ-ধরনের রাশিয়ান ফ্যাসিলিটির ভেতর আমি গেছি।' স্ক্রীনের দিকে তাকাল রানা। 'সিকিউরিটি সিস্টেম নিখুঁত বলা যায় না। শুধু ভয়েস-প্রিন্ট অ্যাকটিভেটর আছে। এর মানে হলো শুধু যাদের জানার প্রয়োজন আছে তাদের তালিকাটাকে যতটা সম্ভব ছোট করে রাখার ব্যবস্থা। এ-সব জায়গা থেকে আপনি ইয়েলেৎসিনকেও দূরে রাখতে পারবেন। অস্ত্রটা ফায়ার করার জন্যে দুটো চাবি দরকার হবে আপনার–স্পেশাল অ্যাকসেস কোডস, রাখা হয় একটা ডিজিটাল ওয়াল সেফে। অ্যাকসেস কোডস দৈনিক বদলানো হয়।' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল রানা। 'কাজটা করতে হলে ভেতরের কারও সাহায্য পেতে হবে।' একজন টেকনিশিয়ানকে ডেকে ইনফ্রা-রেড অন করতে বলল ও।

সুইচ টিপল টেকনিশিয়ান।

'জুম ইন। না, আপনার ডান দিকে। আরেকটু। হয়েছে।'

স্ক্রীনে যে ছবি ফুটল তা স্পষ্ট নয়, তবে বোঝা গেল ডিশের গোড়া থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে একটা মূর্তি, আবর্জনার স্তূপ বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে।

'কেউ একজন বেরিয়ে আসছে। তারমানে একজন অন্তত জানে লিকটা কোথায়; কে দায়ী।'

পুরু গরম কাপড় পরে থাকলেও, তীব্র শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে লিয়া।

অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে সে, তাসত্ত্বেও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, জানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা এখান থেকে কম করেও পঁচিশ মাইল দূরে, তবে রাস্তা ধরে বিশ মাইল যেতে পারলে ছোট একটা রেলওয়ে স্টেশন পড়বে। স্টেশনটায় ট্রেন খুব কম আসে, তবু ওখানে পৌঁছুতে পারলে...

আবর্জনা থেকে নেমে এসে নিজের চারদিকে ভাল করে তাকাল লিয়া। প্রথমে তার মনে হলো, কে বা কারা যেন চাপাস্বরে কাঁদছে। তার মত আরও কেউ বেঁচে আছে নাকি? আরও কেউ নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছে?

'ভিক্টর? ভিক্টর কিরগিজ?' ডাকল লিয়া, ভাবছে এবার ঠিকই কিরগিজের সাড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের মৃদু আওয়াজ আর চাপা কান্নার শব্দই শুধু কানে ভেসে এল, কোন লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না।

কিরগিজ বেঁচে নেই, এটা মেনে নিতে মন চাইছে না। ঘটনাটা ঘটার অল্প কিছুক্ষণ আগে তাকে বাইরে বেরুতে দেখেছে লিয়া। তবে কি পালিয়েছে কিরগিজ? নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে? গেলে স্টেশনের দিকেই যাবে সে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু চাপা কান্নার আওয়াজটা কোত্থেকে আসে? আরও কয়েক পা এগোল লিয়া, তারপর কুকুরগুলোকে দেখতে পেল। কাঠের একটা স্লেজকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে তারা, মনিবের লাশ ফেলে এখনও চলে যায়নি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল লিয়া। ঈশ্বরই তাকে পথ দেখাচ্ছেন। এখন একমাত্র এই স্লেজই তার প্রাণ বাঁচাতে পারে।

আট

রাহাত খান নিরাপদ একটা টেলিফোনে কথা বলছেন, এই সময় তাঁর চেম্বারে ঢুকল রানা। অফিসটা নিয়ন্ত্রণ করে তুলি, কিন্তু ইতিমধ্যে ছুটি নিয়ে চলে গেছে সে। হাত ইশারায় রানাকে ভেতরে ঢুকতে বললেন মেজর জেনারেল, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। 'বসো।'

কোন শব্দ না করে চেয়ারটায় বসল রানা, তাকাল বসের মাথার ওপর পিকাসোর ছবিটার দিকে। এই ছবি নিয়ে হেডকোয়ার্টার ঢাকায় বন্ধুদের সঙ্গে অনেক তর্ক আর বাজি ধরেছে রানা, যদিও আজ পর্যন্ত মীমাংসা হয়নি ছবিটা আসল নাকি নকল। উত্তরটা একমাত্র রাহাত খান দিতে পারবেন, কিন্তু কার এমন সাহস যে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, বিশেষ করে অপ্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন করলেই যেখানে ধমক খেতে হয়!

পিকাসোর ছবির পাশে আরও কয়েকটা ছবি রয়েছে, বেশিরভাগই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। আরও আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার নৌ-যুদ্ধের ছবি, সবই নামকরা ব্রিটিশ আর্টিস্টদের আঁকা। এই শেষের ছবিগুলো ব্রিটিশ কালচারাল মিনিস্ট্রির দান।

লাইনের শেষ মাথায় যে-ই থাকুক, সমীহের সঙ্গে কথা বলছেন রাহাত খান। কে হতে পারে? বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো নন, তাঁর সঙ্গে এরকম শ্রদ্ধার সঙ্গে রাহাত খান কথা বলবেন না, সম্পর্কটা যেহেতু বন্ধুত্বের। তাহলে কি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার?

'ইয়েস, অফকোর্স,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। রানার দিকে তাকালেন না, ধীরে-সুস্থে টোবাকো ভরছেন পাইপে। এই কাজটা খুব যত্নের সঙ্গে করেন তিনি। না, নিজের ভুলটা শুধরে নিল রানা—বস্ প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেন। যে-কোন কাজে উন্নতির প্রথম শর্ত আন্তরিকতা ও যত্ন। এটা আমারও অভ্যাস, শিখেছি বসের কাছ থেকে।

কিন্তু ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। হোক অপ্রাসঙ্গিক, কথাটা বলে দেখবে কি প্রতিক্রিয়া হয়? মনে মনে নিজেকে চোখ রাঙাল রানা। বেয়াদবি করলে ভুগতে হবে, বাছা।

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। 'স্যার...'

'লংফেলোর সঙ্গে কথা বললাম, তারপর ওদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গেও,' বললেন রাহাত খান। 'জন মেজর মস্কোর সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'কি বলছে ওরা? মানে মস্কো?'

'ওরা বলছে রুটিন ট্রেনিঙের সময় ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'কি ধরনের অস্ত্র, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য করেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'সরকার বদলায়, কিন্তু কর্মকর্তাদের মিথ্যে বলা বন্ধ হয় না।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রবিন হুড ক্রাইম সিণ্ডিকেট সম্পর্কে কি জানো তুমি, আমাকে শোনাও,' নির্দেশ দিলেন বস্।

'অস্ত্র কেনাবেচার খুব বড় একটা সংগঠন। স্মাগলার হিসেবে দুনিয়ার প্রায় সব দেশে কনট্যাক্ট আছে। ওদের হেডকোয়ার্টার সেন্ট পিটার্সবার্গে। গালফ ওঅরের সময় ওরাই প্রথম ইরাককে নতুন সাপ্লাই পৌঁছে দেয়। ওদের লীডার সম্পর্কে নিরেট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তা-ও পরস্পরবিরোধী। এখন পর্যন্ত ওই মেয়েটাই, ওলগা পলিয়ানা, একমাত্র কনফার্মড কনট্যাক্ট—মানে, প্রথম সারির মধ্যে আর কি।'

'আমরা কিছু ফাইল যোগাড় করেছি,' বললেন রাহাত খান। 'সেভারনায়া স্টেশনে ঢুকতে পারে, বা সেখানে কর্তৃত্ব ফলাতে পারে, এমন লোকদের একটা তালিকা রয়েছে আমার কাছে।' চট করে একবার কমপিউটর স্ক্রীনের দিকে তাকালেন তিনি। স্ক্রীনটা রানার দৃষ্টি পথের বাইরে।

'তালিকায় প্রথম নামটা তোমার পরিচিত এক লোকের,' আবার বললেন রাহাত খান, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে একটা সাদা বোতামে চাপ দিলেন। তাঁর মাথার ওপর থেকে ছবিটা এক পাশে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল একটা ভিডিও মনিটর। মনিটর আলোকিত হলো, তারপর একটা ছবি ফুটে উঠল।

পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা কুরুনভকে দেখা যাচ্ছে ভিডিও মনিটরে। ছবির নিচে সারি সারি তথ্য।

আপনমনে বিড়বিড় করল রানা, কারও শুনতে পাবার কথা নয়, 'ওরা লোকটাকে জেনারেল বানিয়েছে!'

'হ্যাঁ, কর্নেল কুরুনভ এখন জেনারেল,' বললেন রাহাত খান। 'শুধু তাই নয়, ওপর মহলে এখন তাঁর সাংঘাতিক প্রভাব। নিজেকে তিনি রাশিয়ার পরবর্তী লৌহমানব বলে ভাবছেন।'

'তাহলে তো…'

রানার কথা শেষ হলো না, রাহাত খান বললেন, 'হ্যাঁ, সেজন্যেই অ্যানালিস্টরা তাঁকে বাদ দিতে চাইছেন। একজন বেঈমান হিসেবে তাঁকে মানায় না। ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে কেন কেউ এ-ধরনের ঝুঁকি নেবে?'

'এই অ্যানালিস্ট কারা, স্যার?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রানা। 'এঁরাই তো বলেছিলেন যে মিরাকলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়? বলেছিলেন, টাইগ্রি হেলিকপ্টার দিয়ে ইমিডিয়েট কোন হামলার সম্ভাবনা নেই, কাজেই পিছু ধাওয়া না করলে ক্ষতি নেই?'

'অ্যানালিস্টরা ভুল করতে পারেন, তবে মনে রাখতে হবে যে তাঁরা তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান।'

'ওরা ভুল করলে তার খেসারত দিতে হয় এজেন্টদের, ফিল্ডে যারা থাকে,' সুরটা নরম হলেও, বসের সঙ্গে তর্ক শুরু করেছে রানা।

'তোমাকে সুইসাইডাল মিশনে পাঠাতে আমি কখনও দ্বিধা করিনি,' জবাব দিলেন রাহাত খান। 'যখনই পাঠিয়েছি, অ্যানালিস্টরা কি বলেন ভাল করে জেনে নিয়েছি। ওঁরা গ্রীন সিগন্যাল দিলে তবেই তোমাকে পাঠিয়েছি। ওরা আপত্তি করলে পাঠাইনি। এ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

রানার কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। ও জানতে চাইল, 'আপনি কাদের কথা বলছেন, স্যার? এই অ্যানালিস্ট কারা?'

'একজন আমি, তোমার বস্,' বললেন রাহাত খান। 'বিসিআই চীফের পদটা এতদিন ধরে রাখতে পেরেছি, সে তো আমি অ্যানালিস্ট বলেই। সেই সঙ্গে আমি একজন কমপিউটর বিশেষজ্ঞও। আরেকজন সোহেল, তোমার ব্যক্তিগত বন্ধু।'

রানা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, কথা বলতে পারছে না।

'জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে তোমার মধ্যে বেপরোয়া একটা ভাব আছে,' বললেন রাহাত খান। 'তা সত্ত্বেও, আমি একজন অ্যানালিস্ট বলেই, ঝোঁকের মাথায় তোমাকে আমি কখনও সুইসাইডাল মিশনে পাঠাতে পারি না। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে, এ-ধরনের মিশনে পাঠাবার সময় তোমাকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে…'

রানা জবাব দিল, 'স্যার, আ লাইসেন্স টু কিল ইজ অলসো আ সার্টিফিকেট টু ডাই।'

'তা না হলে সুইসাইডাল মিশন বলা হবে কেন,' মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'তোমার এই অ্যাসাইনমেন্টটাও তাই, রানা। আমি চাই তুমি মিরাকল খুঁজে

বের করো। জানতে হবে কে চুরি করেছে–আমার কোন সন্দেহ নেই, ওই অস্ত্র আনলক করার জন্যে যা যা দরকার তা কেউ চুরি করেছে। আমার মনে এ-ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে ওই ধরনের আরও জিনিস কক্ষপথে চুপিসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাকে এখন জানতে হবে কে বা কারা ওটা চুরি করেছে, ওটা দিয়ে তারা কি করতে চায়।' মাথা ঘুরিয়ে মনিটরের দিকে তাকালেন তিনি। 'আর, রানা, কাজটা করতে গিয়ে তোমার সঙ্গে যদি কুরুনভের দেখা হয়ে যায়, সে গিল্টি হোক বা না হোক, আমি চাই না ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে তার পিছু ধাওয়া করো তুমি। যার ওপরই প্রতিশোধ নাও, পিটার মুরেল আর ফিরে আসবে না।'

রানা খুব নিচু স্বরে বলল, 'তার মৃত্যুর জন্যে সরাসরি কুরুনভকে দায়ী করা যায়।'

'কেউ অস্বীকার করছে না,' বললেন রাহাত খান। 'তবু ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নেয়া চলবে না। কি বলছি, বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, যদিও মন চলে গেছে অনেক দূরে। পুরানো বন্ধু পিটার মুরেলকে আজও ভোলেনি ও, কোনদিন ভুলতে পারবে না। দু'জন শুধু যে এক সঙ্গে ফিল্ডে কাজ করেছে তা নয়, কোন কোন বিষয়ে একই সঙ্গে ট্রেনিংও নিয়েছে ওরা। তার কথা এমন গভীর মগ্নতার সঙ্গে ভাবছে ও, এক সময় হঠাৎ মনে হলো পিটার মুরেল ওর একদম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেন ওর পাশটিতে। চিরতরুণ হাসিখুশি চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, শুনতে পেল পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর, 'তোমার বস্ ঠিক কথাই তো বলছেন, প্রতিশোধ নিলেও তো আর আমাকে ফেরত পাবে না।' তারপর কর্নেল কুরুনভকে দেখতে পেল রানা, কেমিকেল অ্যাণ্ড বায়োলজিকাল ফ্যাসিলিটির মেঝেতে হাঁটু গেড়ে থাকা মুরেলের ঘাড়ে পিস্তল চেপে ধরেছেন। 'জ্বী, স্যার, বুঝতে পারছি,' বলে আর বসল না রানা, চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দরজার নব ধরে টান দিল রানা, পিছন থেকে রাহাত খান বললেন, 'গুড লাক, মাই বয়। আমি চাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসো তুমি।'

দু'দিন ধরে চলল নিবিড় ব্রিফিং। তারপর দীর্ঘ বিশেষ অধিবেশনে বসতে হলো রানাকে, গভীর রাত পর্যন্ত ওকে জ্ঞান দান করল বিসিআই-এর মেকানিকাল এক্সপার্ট সুলতানা পারভিন। শেষবার লণ্ডন দূতাবাসের গভীর তলদেশে ফায়ারিং রেঞ্জে দেখা হলো ওদের, রানার জন্যে মাত্র দুটো আইটেম এনেছে পারভিন।

প্রথমটা চওড়া একটা বেল্ট, দেখতে একদম সাধারণ, বাকল-এর ওপর খুদে একটা ক্যাচ আছে। ওটা দেখাতে পারভিন ব্যাখ্যা করল, 'ওটা সেফটি। সব সময় খেয়াল রাখবে ওটা যেন পজিশনে থাকে–যতক্ষণ না ব্যবহার করছ।' তারপর দেখাল কিভাবে সেফটি ক্যাচ অফ করতে হয় এবং কিভাবে তাক করতে হয় বাকলটা। সুইচে চাপ দিলে নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা খুদে একটা পিটন বেরিয়ে আসবে, পিছনে থাকবে পঁচাত্তর ফুট হাই টেনসিল কর্ড। 'ওই কর্ড তোমার ভার বহন করার জন্যে যথেষ্ট শক্ত, রানা।'

'কিন্তু আমার যদি এক্সট্রা সাপোর্ট দরকার হয়?'

হাসল পারভিন। 'তাহলে তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা শুধু তোমার ওজনের কথা মনে রেখে টেস্ট করেছি ওটা। তবে ওই পিটন আক্ষরিক অর্থেই যে-কোন জিনিসে গেঁথে যাবে, আর একবার গেঁথে গেলে খুলে আসবে না।'

দ্বিতীয় আইটেমটা সত্যিই মারাত্মক। দেখতে মনে হবে সাধারণ একটা কলম, আসলে ওটা একটা গ্রেনেড। মাথায় একবার চাপ দাও, ওটা দিয়ে লেখার কাজ চলবে। তিন বার চাপ দাও, চার সেকেণ্ড মেয়াদী ফিউজ কাজ শুরু করে দেবে। ওই চার সেকেণ্ডের মধ্যে আরও তিন বার চাপ দিলে জিনিসটা ডিজআর্মড হয়ে যাবে।

'এই কলম তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী, রানা।' পারভিন কখনও রসিকতা করে না, তার এই কথাটাও রসিকতার ছলে বলা হয়নি। কাজেই রানা হাসল না। ছিন্নভিন্ন ডামির দিকে তাকাল ও। মন্তব্য করল, 'দেয়ালের লিখন স্পষ্টই পড়া যাচ্ছে।'

চারদিকে তাকাল রানা, লক্ষ করল পারভিনের কাজের জায়গায় অদ্ভুত সব ইকুইপমেন্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। নকশা করা রুপোর একটা ট্রে চোখে পড়ল, তাতে বড় আকারের একটা প্লেট, প্লেটে সাজানো হয়েছে গরুর ফালি করা মাংস (ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে সেদ্ধ ও ভাজা), সব মিলিয়ে পাঁচ-ছ'টা হবে। সঙ্গে টমেটো, পেঁয়াজ-রসুন আর টিউনা মাছ।

'ওগুলো কি?' প্লেটের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ইন্টারেস্টিং, তাই না?' জটিল কোন ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করলে খুশি হয় পারভিন, তবে জবাব দিতে অযথা দেরি করে।

'কি করে বলব। কোনটা ইন্টারেস্টিং? খাবারগুলো, নাকি ট্রেটা?'

'ট্রেটা।'

'কি রকম?'

'আচ্ছা, বলছি।' হাসল পারভিন। 'ট্রের ওপর ছোট একটা কেস বা ভেতরে ডকুমেন্ট সহ একটা এনভেলাপ রাখো, ঠিক যেমন তোমার হাতে রয়েছে।' রানার হাত থেকে মোটা এনভেলাপটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সে, রাখল ট্রের ওপর। তারপর ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলল। তার পিছু নিয়ে ওয়াল মনিটরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

মনিটরের প্লেটটা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মাংসের ফালিগুলোও, প্লেটের কিনারা থেকে ঝুলে আছে বাইরের দিকে। এনভেলাপটাও দেখা যাচ্ছে। তবে এনভেলাপটা শুধুই একটা আকৃতি নয়, নিচের দিকে মুখ করে থাকা এনভেলাপের ভেতর ডকুমেন্টটা স্পষ্টই পড়া যাচ্ছে।

'দেখছ তো?' হাসল পারভিন। 'আশা করি পড়তে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না?'

মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। স্ক্রীনে ওর ফ্লাইট টিকেটের প্রথম পাতাটা পরিষ্কার ফুটে আছে। পড়ে ওকে শোনাল পারভিন—ফ্লাইটের সময়, নম্বর, রানার কনফার্মড সীটের নম্বর ইত্যাদি।

'অদ্ভুত,' বলে মনিটরের দিকে পিছন ফিরল রানা, এগিয়ে এসে থামল ট্রের সামনে, হাত বাড়াল মাংসের একটা ফালির দিকে।

'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না!' আঁতকে উঠল পারভিন।

'কেন, কি ওটা?'

'কি মানে? ওটা আমার লাঞ্চ!'

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে সেন্ট পিটার্সবার্গের প্লেন ধরল রানা, সব মিলিয়ে সময় লাগল প্রায় ছ'দিন। এয়ারপোর্টে কেউ ওকে বিদায় জানাতে এল না।

লিয়ার সময় কাটছে যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর। স্লেজ চালাবার তেমন অভিজ্ঞতা নেই, বলা যায় কুকুরগুলোই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। ছোট্ট, ফাঁকা স্টেশন, কোথাও কোন লোকজন না দেখে গা ছম ছম করতে লাগল লিয়ার। তারপর অন্ধকার ফুঁড়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার হাজির হলো। লোকটা মিশুক, লিয়াকে দেখেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সে জানাল, তার কাজই হলো ট্রেন আসার সময় স্টেশনে উপস্থিত থাকা। সে যদি সঙ্কেত দেয় তবেই থামবে ট্রেন, তা না হলে থামবে না। সে আরও জানাল, এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ট্রেন আসছে। পরবর্তী ট্রেন আসবে দু'দিন পর।

এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন আসবে শুনে খুশি হলো লিয়া। আরও খুশি হলো সহকারী স্টেশনমাস্টার কুকুর সহ স্লেজটা কিনে নিতে চাওয়ায়। বেশি দরদাম করল না, টিকেট কাটার টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট হলো সে। নগদ টাকা তার কাছে প্রচুর পরিমাণেই আছে, মাসিক বেতন যা পায় সব নিজের কাছে জমিয়ে রাখে সে। রাশিয়ায় এখন রুবলের পাশাপাশি ডলারও চলে, আর ওরা বেতনও পায় ডলারে। ট্রেন সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছুলে কাপড়চোপড়, কসমেটিকস ইত্যাদি সবই কিনতে পারবে সে।

কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর পরিবেশটা তার জঘন্য লাগল। একে তো অসম্ভব ভিড়, তার ওপর সবার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, সম্ভবত বছরে একবারও কেউ গোসল করে না। বয়স্ক লোকগুলোকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখল সে, বিপজ্জনক মনে হলো তরুণদের। ট্রেনের সবখানে চলাফেরা করছে তারা, চোটপাট দেখাচ্ছে, ঝামেলা বাধাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। বড় একটা কার-এ বসল লিয়া, এখানে বেশিরভাগই বয়স্ক লোকজন আশ্রয় নিয়েছে। বসার পর আর উঠল না। সীটগুলো কাঠের, খুবই কষ্টকর জার্নি।

তার কাছে প্রচুর নগদ টাকা আছে, এটা কাউকে জানাতে চাইছে না লিয়া। অফিশিয়াল কাগজ-পত্রগুলোও কাউকে দেখাতে রাজি নয় সে। কাগজে লেখা আছে সে একজন কম্পিউটর বিজ্ঞানী। শুধু তাই নয়, সে যে সেভারনায়া স্টেশনে কাজ করছিল, এটাও উল্লেখ করা আছে। স্লেজে চড়ে স্টেশনে আসার পথেই একটা ব্যাপার উপলব্ধি করেছে লিয়া—অনেক বেশি জেনে ফেলেছে সে। এই জানাটা তার জন্যে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে জানে সেভারনায়া স্টেশনে যা ঘটে গেছে তার জন্যে কে দায়ী। যা কিছু বলা হয়েছে সবই তার কানে গেছে, তারপর ফলাফলটাও চাক্ষুষ করেছে।

রাশিয়ায় অনেক কিছুর পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, সন্দেহ হলে কর্তৃপক্ষ এখনও যে-কোন লোককে সার্চ করতে পারে, এমনকি ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতারও করতে পারে। রুমিং হাউস আর হোটেলগুলোয় এখনও নিয়মিত হানা দেয় পুলিস, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে বোর্ডারদের জ্বালিয়ে মারে। সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছে নতুন কাপড়চোপড় আর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র ঠিকই কিনতে পারবে সে, রেস্তোরাঁয় বসে খেতেও পারবে, কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। হোটেলে ওঠা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

লিয়ার মনে সামান্যতম সন্দেহ নেই যে ভিক্টর কিরগিজ বেঁচে আছে। ঘটনাটা ঘটার আগেই সেভারনায়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ে সে, কাজেই ধরে নেয়া চলে এতক্ষণে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন হলো, এরপর কি করবে সে? সন্দেহ নেই, কারও না কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিরগিজ। কিভাবে?

কিরগিজ একজন কম্পিউটর বিজ্ঞানী, কাজেই যোগাযোগের প্রয়োজনে কম্পিউটর ব্যবহার করবে সে। কিরগিজকে খুব যে একটা পছন্দ করে লিয়া, তা নয়; তবে স্বীকার করে যে লোকটার বুদ্ধি আছে। জানা কথা, নিজের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখছে সে। এখন যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারে লিয়া, দু'জন মিলে বিপদ এড়াবার কথা ভাবা যায়।

চাকা লাগানো দোকান নিয়ে এক ফেরিওয়ালা ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় আসা-যাওয়া করছে, তার কাছ থেকে চা আর রুটি কিনল লিয়া। খাওয়া শেষ হতে চোখ বুজে ঘুমাতে চেষ্টা করল সে। ঘুমাতে পারলে উদ্বেগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু ঘুমের ভেতর তাকে তাড়া করল একটা দুঃস্বপ্ন। লিয়া সেই মহিলা কর্নেলকে দেখতে পেল, সীমাহীন টানেলের ভেতর ধাওয়া করছে তাকে।

লিয়ার জানা নেই, সেন্ট পিটার্সবার্গে পরিস্থিতি তার জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

রাশিয়ান ডিফেন্স কাউন্সিল-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন শুরু হবে উইন্টার প্যালেস-এ। সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে সকাল দশটা। দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ডিফেন্স মিনিস্টার ভ্যালেন্টিন উটারভিচ-এর নেতৃত্বে সদস্যরা একত্রিত হলেন। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন তাঁরা, সদস্যদের একজন এখনও এসে পৌঁছাননি।

উটারভিচ খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন, বিশাল কনফারেন্স রুমের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। মাঝে মধ্যে টেবিলের মাথায় থামছেন, আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছেন, হাতঘড়িতে চোখ বুলাচ্ছেন ঘন ঘন। নিয়ম হলো, এমনকি সিনিয়র অফিসাররাও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে অপেক্ষায় রাখবেন না।

কনফারেন্স রুমের চারদিকে চোখ বুলালেন উটারভিচ। এক সময় রাশিয়ার সর্বশেষ জার এই কামরায় হাঁটাহাঁটি করেছেন। সম্ভবত তাঁর ছেলেমেয়েরা এখানে লুকোচুরি খেলেছে। একটা কথা মনে পড়তে শিউরে উঠলেন উটারভিচ। নিহত জার নিকোলাস আর তাঁর পরিবারের বিদেহী আত্মারা যেন সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময়ের বারো মিনিট পর হাজির হলেন জেনারেল কুরুনভ। সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে, হাতে একটা দামী ব্রিফকেস। মন্ত্রীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে হাসলেন তিনি, সে হাসিতে ক্ষমাপ্রার্থনার কোন ভাব থাকল না।

থমথমে চেহারা, উটারভিচ জেনারেল কুরুনভকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' তারপর ইঙ্গিতে টেবিলে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

জেনারেল কুরুনভ তখনও চেয়ারে বসেননি, উটারভিচ নির্দেশ দিলেন, 'আপনার রিপোর্ট পেশ করুন, প্লীজ, জেনারেল।'

কুরুনভ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দিকে তাকালেন না, তাঁর নির্দেশও সঙ্গে সঙ্গে পালন করলেন না। প্রথমে ধীরে সুস্থে তিনি তার গায়ের গ্রেটকোট খুললেন, সেটা ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখলেন চেয়ারের পিঠে। চেয়ারে বসে সদস্যদের দিকে তাকালেন তিনি, হাসলেন, কয়েকজনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন নিঃশব্দে। অবশেষে ব্রিফকেসটা খুললেন তিনি, ভেতর থেকে বের করলেন কালো একটা ফাইল, ফাইলের গায়ে সাইরিলিক বর্ণমালায় লেখা–SOVERSHENNOE SEKRENTO।

ফাইলটা খুলে এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করলেন, যেন তাঁর খুব তাড়া আছে।

'আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে বাহাত্তর ঘণ্টা আগে মিরাকল নামে একটা সিক্রেট উইপন সিস্টেম সেভারনায়া স্টেশনের ওপর বিস্ফোরিত হয়েছে। স্পেস ডিভিশনের হেড হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত পরিচালনা করি, এবং এই উপসংহারে পৌঁছাই যে এটা একটা সাবোটাজ, দায়ী সাইবেরিয়ান বিচ্ছিন্নবাদীরা। কোন সন্দেহ নেই, তাদের উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল করে তোলা।'

থামলেন তিনি, কাউন্সিলের আটজন সদস্যের দিকে পালা করে তাকালেন, তারপর আবার শুরু করলেন।

'সব ক'জন স্টাফ ও বিজ্ঞানীকে খুন করার পর ক্রিমিন্যালরা সিক্রেট উইপন অ্যাকটিভেট করে–ফ্যাসিলিটি ও নিজেদের পরিচয় সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড, সবই তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

'বলাই বাহুল্য, সেভারনায়া স্টেশনে শান্তি সুনিশ্চিত করার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেভারনায়া স্টেশন থেকে নগদ বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছিলাম আমরা। খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে, সেভারনায়ায় আমরা কয়েক বছর পিছিয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে আমার করণীয় একটা কাজই রয়ে গেছে। আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্যে এখুনি আমি পদত্যাগ পত্র পেশ করছি।'

টেবিলে উপস্থিত সদস্যরা একযোগে মাথা নাড়লেন, তাঁদের কেউ কেউ সজোরে ঘুসি মারলেন টেবিলে, অনেকেই চিৎকার করে বললেন, 'নো! নো!'

এক সময় শান্ত হলো পরিবেশ। জেনারেল কুরুনভের দিকে তাকালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উটারভিচ। তাকালেন মানে, তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কড়া দৃষ্টি বুলালেন। মন্ত্রী মহোদয়ের ভাব দেখে মনে হলো, কুরুনভ পদত্যাগ করলে তিনি

খুশিই হন। যখন কথা বললেন, তাঁর গলায় ভাবাবেগের ছিটেফোঁটাও থাকল না। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কাউন্সিল আপনার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে রাজি নয়, জেনারেল কুরুনভ। কাউন্সিল সদস্যরা আপনার কাছ থেকে শুধু এই আশ্বাসটুকু পেতে চাইছেন যে আর কোন মিরাকল স্যাটেলাইট কোথাও নেই।'

'সে আশ্বাস তো আমি অবশ্যই দিতে পারি, মিনিস্টার।'

'ভেরি গুড। এবার নিখোঁজ দু'জন সেভারনায়া টেকনিশিয়ান সম্পর্কে বলুন।'

জেনারেল কুরুনভকে হতভম্ব দেখাল। মনে হলো ভয় পেয়েছেন তিনি। 'মিনিস্টার···আমি···আমি···,' যেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। '···আমি তো জানি মাত্র একজন নিখোঁজ হয়েছে···ইয়ে, মানে···।'

'দু'জন,' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এমন সুরে বললেন, তিনি যেন একজন শিক্ষক, ছাত্র মিথ্যে কথা বলায় ধমক দিচ্ছেন।

'কিন্তু আমি···।'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে জেনারেলকে থামিয়ে দিলেন মন্ত্রী মহোদয়, তারপর চোখ নামিয়ে কাগজপত্রের দিকে তাকালেন। 'আমাদের লোকজন আবর্জনার ভেতর খোঁজাখুঁজি করেছে। লাশগুলো পাওয়া গেছে সহজেই, কারণ সবাই তারা ঘেরা একটা জায়গায় আটকা পড়েছিল। মিলিটারি গার্ডদের কথা অবশ্য আলাদা···।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, কিন্তু···।'

'সবার লাশই পাওয়া গেছে, শুধু একজন টেকনিশিয়ান, ভিক্টর তার নাম···।'

'ভিক্টর কিরগিজ, মিনিস্টার। এখানে, আমার ফাইলে, তার নাম আছে···।'

চোখ তুলে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন উটারভিচ। ভিক্টর কিরগিজ। 'কিন্তু সে একা নয়। তার সঙ্গে একটা মেয়েও নিখোঁজ হয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী, লেভেল টু কম্পিউটর সায়েন্টিস্ট। ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়া।'

'লিয়া?'

মাথা ঝাঁকালেন উটারভিচ। 'আগেই বলেছি, অত্যন্ত মেধাবী কম্পিউটর বিজ্ঞানী। ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্মান ও ইংরেজি, চারটে ভাষায় দক্ষ···।'

'হায় ঈশ্বর!' ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছেন জেনারেল কুরুনভ।

'শুধু মেধাবী নয়, রূপসীও,' মন্তব্য করলেন উটারভিচ।

'অপেরায় নাম করতে পারত···,' এবার রেগে উঠছেন কুরুনভ।

'চারটে কম্পিউটর ল্যাংগুয়েজেও খুব ভাল সে।'

'লিয়া?' প্রতিটি তথ্য যেন কুরুনভকে একটা করে ঝাঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

'লাশ ঘেঁটে দেখা গেছে সে নেই।'

বড় করে একটা শ্বাস টানলেন কুরুনভ। 'সে নিখোঁজ, এটা আমার কাছে একটা খবর, মিনিস্টার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখুনি তদন্ত করে দেখছি।'

'তা তো অবশ্যই দেখবেন,' বললেন উটারভিচ। 'তবে নিজের মানুষ যেখানে নিখোঁজ, তাকে খুঁজে পাবার আগে সাইবেরিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দায়ী করা কি উচিত হচ্ছে?'

'জী-না, মিনিস্টার, আমারই ভুল–উচিত হচ্ছে না।

'তাহলে আপনার কাছ থেকে আরেকটা রিপোর্ট আশা করব আমরা, কি বলেন? ধরে নিতে পারি সেটা ক্রটিপূর্ণ হবে না?'

'ইয়েস, মিনিস্টার। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি। আমার পরবর্তী রিপোর্ট আপনি নিখুঁতই পাবেন, কথা দিচ্ছি। ধন্যবাদ, মিনিস্টার। ক্রটিটা ধরিয়ে দেয়ার জন্যে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

আধ ঘণ্টা পর। উইন্টার প্যালেসেই, নিজের অফিসে রয়েছেন জেনারেল কুরুনভ। টেলিফোনে কথা বলছেন তিনি, ব্যাকুল স্বরে। এরইমধ্যে সিকিউরিটি ফোর্স ও পুলিসকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি, সেভারনায়া ও আশপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে তারা। শুধু তাই নয়, বড় বড় সবগুলো শহরের পুলিসকেও সাবধান করা হয়েছে। ডাটা বেস থেকে লিয়ার একটা ফটো সংগ্রহ করেছেন তিনি, কপি করে সব জায়গায় একটা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে ফিসফিস করে কথা বলছেন রিসিভারে, উত্তেজনায় তাঁর চাপা কণ্ঠস্বর কাঁপছে। 'তার নাম দ্রোভনা লিয়া···হ্যাঁ। হ্যাঁ, ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়া। কম্পিউটর বিজ্ঞানী। তুমি তাকে চেনো?'

অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, চেনে।

'যেভাবে পারো খুঁজে বের করো তাকে। যে-কোন মূল্যে। পাওয়া গেলে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কি? হ্যাঁ, প্রয়োজনে খুন করা যাবে। আমি পুরোপুরি নিশ্চয়তা চাই। কাজটা তুমি করতে পারবে কিনা?'

'কেন পারব না? এ-ধরনের কাজ করে আমি আনন্দ পাই, আপনি জানেন, জেনারেল।'

'সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখবে। মনে রাখবে, এটা আমাদের সবার জীবন-মরণ সমস্যা। দ্রোভনা লিয়া দুনিয়ার কারও সঙ্গে যেন যোগাযোগ করতে না পারে। যে-কোন মূল্যে তাকে আটক করতে হবে। প্রয়োজনে দেখামাত্র মেরে ফেলো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, জেনারেল। এখুনি কাজ শুরু করছি আমি। দেখিয়ে দিচ্ছি শিকার কিভাবে ধরতে হয়।'

'আমাকে ডুবিয়ো না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি।'

নয়

সেন্ট পিটার্সবার্গ রানার পরিচিত শহর, স্নায়ুযুদ্ধের সময় শেষবার যখন এসেছিল তখন শহরটার নাম ছিল লেনিনগ্রাড। এই শহরের সৌন্দর্য অম্লান হয়ে আছে ওর স্মৃতিতে, এর ইতিহাস সম্পর্কে সবই ওর জানা। পিটার দি গ্রেট লেনিনগ্রাডের প্রতিষ্ঠাতা, শহরটা একসময় রাশিয়ার মধ্যমণি হয়ে ওঠে, 'উইণ্ডো অন ইউরোপ' বলা হত। লেনিনগ্রাড বা সেন্ট পিটার্সবার্গ অক্টোবর বিপ্লবের সুতিকাগারও বটে,

যদিও সেই বিপ্লবের কথা অনেকেই আজ ভুলে যেতে চায়।

শেষবার এখানে এসেছিল রানা সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু হিসেবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিল, জানত যে-কেউ ওর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে। ওর এবারের আগমন শত্রু নাকি বন্ধু হিসেবে, এখুনি তা বলা সম্ভব নয়। তবে সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পা ফেলেই একটা পার্থক্য নজরে পড়ল–চারদিকে কেমন বিশৃঙ্খল ভাব, স্টাফ বা অফিসাররা কাউকে সাহায্য করতে উৎসাহী নয়, তরুণদের অকারণ হৈ-চৈ আর ছুটোছুটি। কমিউনিস্টদের আমলে এরকমটি দেখা যায়নি। মানুষকে মুক্তি দেয়া হয়েছে ঠিকই, তবে সেই মুক্তির সুযোগ নিয়ে কিছু লোক ড্রাগ ও নারী ব্যবসা জমিয়ে ফেলেছে, বেড়েছে বেকারত্ব আর হতাশা।

সিক্রেট পুলিস বা কেজিবি এজেন্টরা পিছু নেবে, সে ভয় এখন নেই; এখন ভয় রুশ মাফিয়াদের। শুধু এয়ারপোর্টে নয়, শহরের সবখানে তারা তৎপর। ট্যাক্সির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে শুধু সুবেশী ব্যবসায়ীরা, তারা বেশিরভাগই শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করে। মুক্ত রাশিয়ায় দু'পয়সা কামাবার জন্যে দলে দলে চলে এসেছে তারা।

লাইনের ডান দিকে রানা ওর কনট্যাক্টকে দেখতে পেল। বিশালদেহী পুরুষ, একটা রুশ ম্যাগাজিন পড়ছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে লোকটার দিকে এগোল রানা, কাছে এসে সঙ্কেত আওড়াল, 'ইন লণ্ডন, এপ্রিল ইজ আ স্প্রিঙ মান্থ।'

লোকটার কথায় মার্কিন বাচনভঙ্গি, সে বলল, 'কে হে তুমি? আবহাওয়াবিদ?'

ঠোঁট টিপে হাসল রানা।

আমেরিকান লোকটা বলল, 'সঙ্কেত, ছোরা, আলখেল্লা–এ-সব বাসি হয়েছে, বন্ধু। এসো, গাড়িটা ওদিকে।' পথ দেখিয়ে এগোল সে, রানাকে নিয়ে এল বাতিল লোহার একটা স্তূপের সামনে–এককালে এটাই ছিল রাশিয়ার গর্ব মস্কোভিচ গাড়ি।

শেষ কয়েক পা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, 'অ্যালাও মি,' বলে দরজা খুলল।

আমেরিকান কনট্যাক্ট ড্রাইভিং সীটে উঠতে যাচ্ছে, সীট আর দরজার মাঝখানে তাকে আটকে ফেলল রানা। ইতিমধ্যে ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

প্লেনে চড়ার সময় পিস্তলটা ওর স্পেশাল ব্রিফকেসে ছিল, ম্যাজিক আই বা মেটাল ডিটেকটরকে ফাঁকি দিতে কোন অসুবিধে হয়নি। এই মুহূর্তে সেটা কনট্যাক্টের পাঁজরে চেপে ধরেছে রানা। 'প্রথমে আমার সঙ্গে কথা বলো।' ওর মুখ দেখে মনে হলো গ্রানিট পাথরের তৈরি।

বেশ কয়েক মুহূর্ত লোকটা কোন কথা বলল না। পিস্তলটা আরও জোরে চেপে ধরল রানা। জানতে চাইল, 'তুমি কি মরতে চাও?'

লোকটা এবার কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইন লণ্ডন, এপ্রিল ইজ আ স্প্রিঙ মান্থ, হোয়াইল ইন সেন্ট পিটার্সবার্গ উই আর ফ্রিজিং টু

ডেথ। কাছাকাছি হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আমাকে একটা গোলাপ দেখাও।'

'ওহ্, জেসাস এইচ ক্রীস্ট!' বলে কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করল লোকটা।

তাকে আড়াল করে রাখল রানা, লোকজন যাতে দেখতে না পায়। কোমর থেকে ট্রাউজার নামিয়ে ডান নিতম্বের ওপর উল্কি দিয়ে আঁকা ছোট একটা গোলাপ দেখাল সে রানাকে। গোলাপের নিচে একটা মাত্র শব্দ–কেলি।

'কেলি?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে বাতিল লোহার স্তূপে চড়ল, বসল আমেরিকান লোকটার পাশে।

'হ্যাঁ, কেলি। তৃতীয় স্ত্রী।' লোকটা হাত বাড়াল রানার দিকে। 'রবার্ট স্মিথ। সিআইএ।'

'রানা, মাসুদ রানা। তুমি জানো কোত্থেকে আসছি আমি।'

'আগে যদি না-ও জানতাম, এখন জানি। তোমরা আসলে কোনদিন বদলাবে না। কোল্ড ওঅর শেষ হয়েছে, অথচ এখনও তোমরা সঙ্কেত, ছোরা, আলখেল্লা ইত্যাদি ছাড়তে পারোনি।'

'আইডিয়াটা হলো যতটা সম্ভব নিরাপদ থাকা। কোল্ড ওঅর শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্পাইদের প্রয়োজন এখনও ফুরায়নি। নাকি সিআইএ মনে করে কমিউনিজমের পতনের পর দুনিয়াটা রাতারাতি বাসযোগ্য হয়ে গেছে?'

এঞ্জিন স্টার্ট দিল স্মিথ। দু'একবার কেশে উঠে থেমে গেল সেটা, তারপর স্টার্ট নিল। 'না, তা না। দুনিয়াটা সত্যি এখনও বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাহলে তুমি বলছ, এটাই স্পাইদের কাজ? দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করা?'

'শুধু স্পাইদের কেন, যে-কোন পেশাজীবীর চূড়ান্ত লক্ষ্য তো তাই হওয়া উচিত।'

'প্রথম ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে,' বলল স্মিথ। 'কি জানি, তোমার সম্পর্কে বোধহয় ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'কি তথ্য?'

'আমি মনে করেছিলাম তুমি এক মহা ফুর্তিবাজ লোক,' হাসতে হাসতে বলল স্মিথ। 'ভেবেছিলাম দু'জন মিলে সময়টা চুটিয়ে উপভোগ করা যাবে।'

'ভুলে যাও,' বলল রানা। 'এখানে আমি কাজ নিয়ে এসেছি, ফুর্তি করতে নয়। তাছাড়া, আমি যতটুকু জানি, কেজিবি শুধু নাম পাল্টেছে। এখন ওরা পিছু নেয় না, বন্ধু সেজে সামনের দিক থেকে আসে। তবে ওদের চরিত্র নাকি বদলায়নি।'

'তারপর ধরো এখানকার অস্থিতিশীল পরিবেশ,' সায় দেয়ার সুরে বলল স্মিথ।

'ঠিক।'

গাড়ি ছেড়ে দিল স্মিথ, ধীরে ধীরে ট্রাফিকের মিছিলে যোগ দিল। 'ঠিক আছে, রনো...।'

'রনো নয়,' ধমক দিল রানা। 'রেনোও নয়। মনে থাকে যেন।'

'ঠিক আছে, দুঃখিত। আমার ইচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন গাড়ি চালাই, সেই ফাঁকে

কথা বলা যাবে। তুমি কি বলো? শহরটাও তোমাকে দেখানো হবে।'

'এই গাড়ি কি পরিষ্কার?'

'আমার জানামতে পরিষ্কার,' জবাব দিল মিথ। 'পাশ থেকে ম্যাগাজিনটা নিয়ে ব্যাক সীটে ছুঁড়ে দিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে পত্রিকার নামটা পড়ল রানা। বাগানের পরিচর্যা বিষয়ক পত্রিকা। 'তুমি কি বাগান করো?'

'অবসর নিলে করতে পারি,' জবাব দিল রানা। 'শোনো, তুমি তো লোকাল এক্সপার্ট, আমাকে একটা ধারণা দাও।'

'আমাকে বলা হয়েছে তোমার ইনফরমেশন দরকার। তোমাকে সাহায্য করার কোন নির্দেশ আমি পাইনি। এখন কথা হলো…।'

বাধা দিয়ে রানা সরাসরি প্রশ্ন করল, 'রবিন হুড সম্পর্কে কি জানো তুমি, মিথ?'

'ওহে, ওদিকের ওই বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকাও। ভারি সুন্দর, তাই না? দেখো, ওটা হলো উইন্টার প্যালেস। আর ওদিকে ওটা আলেকজাণ্ডার কলাম। লণ্ডনেও এরকম একটা আছে, তাই না? কোন এক নাবিকের নামে।'

'অ্যাডমিরাল নেলসন, হ্যাঁ। দেখো মিথ, আমার সঙ্গে কৌশল কোরো না। যদি কিছু বলতে না চাও, পরিষ্কার করে জানাও, আমি অন্য পথ দেখি।'

'ঠিক আছে। কি জানতে চাও?'

'রবিন হুড আসলে কে? তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'আলোচ্য বা আধুনিক রবিন হুড সম্পর্কে আমি যা জানি তা একটা পিনের মাথায় লেখা যায়, রানা। এক কথায় ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক।'

'দু'কথা হয়ে গেল। আরও কিছু শোনাও।'

'সিরিয়াসলি বলছি, রবিন হুড সম্পর্কে খুবই কম জানা গেছে। তাকে দেখেছে বলে আজ পর্যন্ত কেউ দাবি করেনি। এরকম দাবি করার মানে হবে তাকে চেনে বলে স্বীকার করা। তবে কোন সন্দেহ নেই যে তার যোগাযোগ আছে। যোগাযোগ আছে সরকারী মহলের সঙ্গে, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে, এমনকি রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গেও।'

'রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স?'

'কেজিবির আরেক নাম।'

'বলে যাও।'

'শোনা যায়, স্রেফ গুজব, সে নাকি একটা আর্মারড ট্রেনে থাকে।'

'আর্মারড ট্রেন? যে-ধরনের ট্রেন বিপ্লবী নায়কদের প্রিয় ছিল?'

মাথা নাড়ল মিথ। 'বিপ্লবীদের কথা বলতে পারব না, তবে রবিন হুড সম্পর্কে সবাই এ-কথা বলে।'

'আর্মারড ট্রেন কোথায় পাবে সে?'

'সহজেই পেতে পারে। ইচ্ছে করলে তুমিও পেতে পারো। সামর্থ্য থাকলে এখানে সব কিছু পাওয়া যায়। বিনা পয়সায় সেন্ট পিটার্সবার্গ ট্যুর করার সুযোগ যখন একটা পেয়েছ, কথা না বলে দেখো রবার্ট মিথ কোথায় তোমাকে নিয়ে যায়। তোমার আগ্রহ হবে, এমন অনেক জায়গা চিনি আমি। সব দেখো, তারপর ফাইভ

স্টার হোটেলে উঠো, কেমন?'

নেভস্কি প্রসপেক্ট ধরে গাড়ি চালাল মিথ, একটা ব্রিজ পেরিয়ে চলে এল অ্যাক্রস-দা-নেভা এভিনিউয়ে। ওখান থেকে শহরতলীতে পৌঁছুল, আসার পথে এদিক ওদিক হাত তুলে নানা রকম মন্তব্য করছে। 'পড়ো পড়ো ওই দালানগুলো দেখছ?' জানালা দিয়ে তাকিয়ে সারি সারি ভবনগুলো দেখল রানা, ঠিক যেন দেশলাইয়েই তোবড়ানো বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে। 'এই শহরের সবচেয়ে বড় মিলিটারি ব্যারাক ছিল ওখানে। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকতেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় জায়গাটাকে, আর নতুন সরকার আসার পর অভাবী মানুষরা দরজা-জানালা খুলে নিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ।'

'অথচ আফগানিস্তান থেকে যোদ্ধারা ফিরে এসে দেখল, তাদের থাকার জায়গা নেই। ওই ব্যারাকে গোটা একটা রেজিমেন্ট থাকতে পারত। অভাব টাকার হোক বা সদিচ্ছার, ওগুলোকে স্রেফ ভেঙে পড়তে দিয়েছে ওরা।'

পরে মিথ রানাকে জানাল দুনিয়া খ্যাত আর্ট মিউজিয়াম হার্মিটিজ, উইন্টার প্যালেস-এর অংশবিশেষ, গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। অনেক সমস্যার একটা হলো, স্যাঁতসেঁতে ভাব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে রঙ হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ছবিগুলো। না, কেউ এ-সব দেখার নেই। 'ওদিকে জার্মান আর ফ্রেঞ্চরা তাদের পেইন্টিং ফেরত চেয়ে বসেছে,' বলল মিথ। 'অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, বিপদে পড়লে ব্যাঙও হাতিকে লাথি মারে। জার্মানরা যে ছবিগুলো ফেরত চাইছে, সেগুলোর মালিক কিন্তু জার্মানরা নয়। নাৎসী আমলে ইউরোপ থেকে ও-সব লুঠ করা হয়েছিল, পরে বার্লিন দখল করার পর রাশিয়ানরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়।'

অবশেষে, শহরের একেবারে বাইরে চলে এসে, মান্ধাতা আমলের গাড়িটা থামাল মিথ, পথ দেখিয়ে উঁচু ইমব্যাঙ্কমেন্টে নিয়ে এল রানাকে, ওখান থেকে নিচে তাকাতে বিশাল রেলওয়ে সাইডিং দেখতে পেল ওরা।

'মিলিটারি ডিপো,' ব্যাখ্যা করল মিথ। 'আইসিএমবি মার্শালিং ইয়ার্ড, এখানেই ওরা পশ্চিমা বিশ্বের আতঙ্ক ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল লোড করত। ট্রেনে তুলে সারা দেশে ঘোরানো হত মিসাইল, ফলে একই জায়গায় ওগুলোকে দু'বার দেখতে পাওয়া ছিল দুর্লভ ঘটনা। এখান থেকে সাইলোতেও পাঠানো হত।'

'তুমি কি বলতে চাইছ এখান থেকেই আর্মারড ট্রেন সংগ্রহ করেছে রবিন হুড?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুরানো রোলিং স্টক এদিকে প্রচুর,' বলল মিথ। 'বেশিরভাগ মুভিং মিসাইল ট্রেনই আর্মারড। শুধু তাই নয়, প্রভাবশালী সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্যে আর্মারড ক্যারিজের ব্যবস্থাও ছিল, তাঁরা যাতে আরাম-আয়েশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারেন।'

ফেরার পথে, শহরের মাঝখানে, হঠাৎ হাসতে শুরু করল মিথ। 'তোমাকে আরও একটা জিনিস দেখাই, রনো...দুঃখিত, রানা। ছোট একটা জায়গা, ওরা

স্ট্যাচু পার্ক বলে।'

রেলওয়ে ডিপোর মতই, স্ট্যাচু পার্কটাও শহরের বাইরে। পার্ক আসলে নামে মাত্র। অযত্নলালিত কিছু গাছপালা আর ভাঙাচোরা দু'একটা বেঞ্চ থাকলেও, এখন জায়গাটাকে জঙ্গল বললেই বেশি মানায়। ভেতরে কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

প্রথমে রানার মনে হলো মডার্ন স্কাল্পচার-এর প্রদর্শনী চলছে। তবে গাড়ি থেকে নামার পর দেখল ওগুলো আধুনিক নয়, এবং অক্ষতও নয়।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য স্ট্যাচু; ভাঙাচোরা, অসমাপ্ত, মঞ্চ বা বেদি থেকে নামানো। এক জায়গায় দেখা গেল অনেকগুলো স্ট্যাচু দিয়ে একটা বড়সড় গর্ত ভরাট করা হয়েছে। বেশিরভাগই মার্ক্স আর লেনিনের মূর্তি, লেনিনেরই বেশি। সঙ্গে কাস্তে আর হাতুড়িও আছে। ছোট, বড়, মাঝারি, বিশাল–সব সাইজেরই আছে।

লেনিনের মাঝারি সাইজের একটা ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু দেখল রানা, কেউ একজন রুশ ভাষায় গায়ে কিছু লিখেছে। কাছাকাছি এসে লেখাটা পড়ল ও। রঙ দিয়ে লেখা একটা নির্দেশ। লেনিন বেঁচে থাকলেও এই নির্দেশ পালন করা তাঁর পক্ষে অ্যানাটমিক্যালি সম্ভব ছিল না।

'বুঝতে পারছ তো, রানা, কি ঘটেছে এখানে?' হাসছে মিথ। 'ইয়েলেৎসিন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করার পর এই হলো সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। পুরানো কমিউনিস্ট নেতাদের গুলি করার বা পিটিয়ে মারার তো আর উপায় নেই, কাজেই বিকল্প হিসেবে এই কাজটা করেছে তারা।

'যদি দেখতে কিভাবে করা হয়েছে কাজটা। প্রথমে মিছিল করে ওগুলো বয়ে আনা হয়। কমিউনিস্ট আমলের সব ধরনের মূর্তিই ছিল। লেনিন, মার্ক্স, স্টালিন–কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি। পাথর আর ধাতু দিয়ে তৈরি প্রতিটি মূর্তিই খুব দামী। বয়ে আনার কাজে এমনকি বুলডোজারও ব্যবহার করা হয়। সারা দিন রাত ভাঙার কাজ চলে, তারপর এখানে এনে ফেলা হয়। শহরের আবর্জনা ফেলা হয় যেখানে, এই জায়গাটা তার কাছাকাছি। এখানে গাছপালা থাকায় প্রথম দিকে স্ট্যাচুগুলো দেখা যেত না, লোকজন চায়ওনি বিদেশীরা এই কদর্যতা দেখুক। এখন অবশ্য কেউ আর গা করে না।'

'আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কি?' জানতে চাইল রানা।

মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ঘুরে গেল মিথ, গাড়ির দিকে পা বাড়াল। 'এসো।'

হোটেলের নাম বলল রানা, সেদিকেই গাড়ি ছোটাল মিথ। 'রবিন হুড সম্পর্কে জানতে চাও তুমি, তাই না?'

'তুমি বলেছ, ভয়ঙ্কর।'

'তা তো বটেই। সত্যি কথাটা কি জানো? রবিন হুডকে কেউ কখনও খুঁজে পায় না। সে তোমাকে খুঁজে নেয়। প্রশ্ন হলো, তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমি। একটাই উপায় আছে।'

'কি সেটা?'

'তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মাফিয়াদের একটা রীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি জানো। বন্ধুকে কাছে রাখে ওরা, তবে শত্রুকে আরও একটু বেশি কাছে রাখে। বিলিভ মি, এখানেও ঠিক তাই ঘটছে।'

'ঠিক আছে। রবিন হুডের প্রধান শত্রু তাহলে কে?'

'একজন খাঁটি কেজিবি এজেন্ট। বেচারা ল্যাংড়া, খুঁড়িয়ে হাঁটে। দোষটা ডান পায়ে। নাম হলো বরিস নবোকভ।'

'বরিস দিমিত্রি নবোকভ?'

'তুমি তাকে চেনো?'

'আমিই তার ডান পায়ে গুলি করেছিলাম।'

ডলার ব্যবহার করায় ঝুঁকি আছে, তবু ঝুঁকিটা নিল লিয়া। ভয় ভয় লাগলেও, মনে একটা কৌতূহল আছে—সত্যি কি কেউ খুঁজছে ওকে? কারা তারা? পুলিস? নাকি ইন্টেলিজেন্স-এর লোকজন?

মস্কোভস্কি ভোকজাল রেলওয়ে স্টেশনে নেমেই পাবলিক বাথরুম ব্যবহার করেছে সে। দেশী একটা সাবান দেয়া হলো তাকে, মাথা নেড়ে সেটা ফিরিয়ে দিল সে। অ্যাটেনড্যান্ট মহিলার হাতে সবুজ একটা ডলার গুঁজে দিতে বিদেশী সাবান বেরুল।

গোসল সেরে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল লিয়া, ছোট একটা কাফেটেরিয়ায় ঢুকে খাওয়াদাওয়া সারল। এঁটো বাসন ধোয়া পানির মত কফি, তবে গরম। কালো রুটির স্যাণ্ডউইচ আর ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি পনির অবশ্য বেশ সুস্বাদুই লাগল।

ওখান থেকে বেরিয়ে সারি সারি দোকানের পাশ ঘেঁষে হাঁটছে লিয়া। সব দোকানেই ডলার চলে, কোন কোন দোকানে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ডলারের বিনিময় হার উল্লেখ করা হয়েছে। লিয়ার দরকার ভাল স্কার্ট, মোজা আর আণ্ডারঅয়্যার। একজোড়া জিনসও কিনতে হবে। পছন্দ হলে কয়েকটা শার্ট। একটা এয়ারলাইন ক্যারি-অন আর একটা বড়সড় লেদার শোল্ডার ব্যাগও দরকার ওর।

রাত কাটানোর সমস্যা নিয়ে এখুনি ভাবছে না লিয়া। ইচ্ছে করলে ট্রেন ধরে নভগোরোদ-এ চলে যেতে পারে সে, তারপর লোকাল বাস ধরে লেক ইলমেন-এ পৌছুতে পারে। ওখানে তার মা-বাবা থাকে।

তবে না, মা-বাবাকে বিপদে ফেলা উচিত হবে না। নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে তাকে খোঁজা হচ্ছে। তারমানে ওর মা-বাবার বাড়ির ওপর নির্ঘাত নজর রাখা হবে। পুরো পরিবারকে বিপদে না ফেলে দূরে সরে থাকাই ভাল।

চেঞ্জিং রুমে মহিলাদের খুব ভিড়। সদ্য কেনা কাপড় পরতে এসেছে সবাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল লিয়া। নতুন ফারকোট, হ্যাট, দস্তানা আর লেদার বুট দারুণ মানিয়েছে তাকে।

কাগজ-পত্রগুলো শোল্ডার ব্যাগে ভরার আগে সব একবার ভাল করে চেক করে দেখে নিল। ওর প্রয়োজন হতে পারে, শুধু এরকম জিনিসই রাখল শোল্ডার

ব্যাগে। বাকি নতুন কাপড়চোপড়, পুরানোগুলো সহ, ভরে রাখল ক্যারি-অনে। কাগজগুলো পরীক্ষা করার সময় একটা ডকুমেন্ট তার মনোযোগ কেড়ে নিল। তার মনে পড়ল, এটা তাকে এক বছর আগে দেয়া হয়েছিল, কমপিউটর হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করার স্পেশাল একটা অ্যাসাইনমেন্টে যাবার সময়। কাগজটা যে তার কাছে আছে, লিয়া তা ভুলেই গিয়েছিল। বলা যায় না, এই বিপদের সময় এটা কাজে লাগতে পারে।

চুলগুলো এক করে বড় একটা খোঁপা তৈরি করল লিয়া। আয়নায় তাকিয়ে দেখল, চেহারায় আকর্ষণীয় একটা ভাব ফুটে উঠেছে। আয়নাটা লম্বা, আরও দু'জন মহিলা ওটার সামনে জায়গা পাবার চেষ্টা করছে। এরকম মোটাসোটা মহিলারা পুলিস বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হতে পারে না। সেরকম কিছু হলে এভাবে এতক্ষণ ধরে তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়েও থাকত না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আবার সারি সারি দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছে লিয়া। কয়েকটা দোকানের ভেতর ঢুকল, টুকিটাকি কেনাকাটা করল, সব চলে গেল শোল্ডার ব্যাগের ভেতর। অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে। দোকানটা বেশ বড়, এখানে শুধু কম্পিউটর বিক্রি হয়।

উইণ্ডো বা শো-কেসে রাখা জিনিসগুলো দেখে লিয়া সন্তুষ্ট হতে পারল না। বাতিল আইবিএম আর অ্যাপল ম্যাক, সঙ্গে খুদে হার্ড ড্রাইভ, সেকেলে চিপস আর অল্প কিছু র‍্যাম-ই শুধু সাজানো হয়েছে।

তবু দেখা যাক ভেবে ভেতরে ঢুকল লিয়া। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ম্যানেজার লোকটা দূর থেকে লক্ষ করছে তাকে। মোটাসোটা না হলে রাশিয়ায় মানুষকে সাধারণত গরীব বলে মনে করা হয়, এই লোকটাও সম্ভবত তাকে তা-ই ধরে নিয়েছে। মান্ধাতা আমলের মেশিনগুলো দেখছে সে, চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে এখনও তাকে লক্ষ করছে ম্যানেজার। অস্বস্তিবোধ করছে লিয়া। অবশেষে কাধ ঝাঁকাল সে, ঘুরে দরজার দিকে এগোল। আর ঠিক এই সময় দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে এল ম্যানেজার, পথ আটকে জানতে চাইল, 'ইয়েস? বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমরা।'

নাক কোঁচকাল লিয়া, বোঝাতে চাইল ম্যানেজার আর ইকুইপমেন্টের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তারপর সে জানতে চাইল, 'আপনাদের কাছে শুধু এই-ই আছে?'

ম্যানেজারের গলায় বিদ্রূপ, 'কত চাই আপনার?'

শোল্ডার ব্যাগে হাত ভরল লিয়া, ডকুমেন্টের ওপর চোখ বুলাল। 'চব্বিশটা দরকার আমেরিকান স্কুলের জন্যে, আর এগারোটা দরকার সুইডিশ স্কুলের জন্যে। অবশ্যই আইবিএম কমপ্যাটিবল হতে হবে, সঙ্গে অন্তত পাঁচশো মেগাবাইট হার্ড ড্রাইভস, সিডি-রম ও ফরটিন-ফোর মডেমস।'

প্রভাবিত হলো ম্যানেজার, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'বিদেশী স্কুলের জন্যে কেনাকাটা করবেন, ধরে নিতে পারি দাম মেটাবেন ডলারে?'

'অবশ্যই।'

'ম্যাডাম, আপনি যদি টেস্ট করতে চান, প্লীজ...'

'ম্যাডাম অন্তত একটা মডেল অবশ্যই টেস্ট করবেন,' বলল লিয়া। 'সেজন্যে এক ঘন্টার জন্যে নিরিবিলি একটা পরিবেশ দরকার হবে তার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, অবশ্যই!' আঙুল নাচিয়ে জুনিয়ার একজন সেলসম্যানকে ডাকল ম্যানেজার, দু'জন মিলে লিয়াকে পথ দেখাল, নিয়ে এল দোকানের পিছনের একটা কামরায়। এখানে বড় একটা ডেস্কে বসানো রয়েছে আধুনিক ফোর এইটি সিক্স।

লিয়া বলল, 'আমাকে একা থাকতে দিন। এখানে আমি কি পাব তার ওপর নির্ভর করবে অর্ডারটা দেব কিনা। নির্বিঘ্নে কাজ করতে চাই আমি।'

লোকগুলো কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই কীগুলোর ওপর লিয়ার আঙুল প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে শুরু করল। অন-লাইনে রয়েছে সে, টাইপ করে মেসেজ পাঠাল দ্রুত। প্রয়োজনীয় সঙ্কেত টাইপ করার পর মেসেজটা দাঁড়াল এরকম–জরুরী, লিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' তারপর আবার সঙ্কেত টাইপ করল।

এবার অপেক্ষার পালা। কিরগিজ যদি সেভারনায়া থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে, এতক্ষণে কোন না কোন ভাবে একটা কম্পিউটরের কাছে নিশ্চয়ই সে পৌচেছে। এই মুহূর্তে কোন কম্পিউটরের ওপর চোখ না রাখলে পরিপূর্ণ মানুষই নয় সে।

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

মিনিটগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ফুরিয়ে যাচ্ছে বুক ভরা আশা।

তারপর হঠাৎ কম্পিউটর থেকে বীপ বীপ শব্দ বেরিয়ে এল, সেই সঙ্গে স্ক্রীনে ছবি ফুটে উঠল তার–ছবি না হোক, তার কার্টুন গ্রাফিক তো বটেই। মেসেজের জবাবও দিল সে–'ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।'

হাসছে লিয়া, পরম আনন্দে কান্না পাচ্ছে তার। সে জানাল–'কুরুনভ সবাইকে খুন করেছেন। প্রাভা ফায়ার করে মিরাকল নিয়ে গেছেন।'

স্ক্রীনে জবাব ফুটতে দু'মিনিট সময় লাগল: 'তুমি নিরাপদ নও। কাউকে বিশ্বাস কোরো না। কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো স্মোলেনস্ক-এর চার্চ অব আওয়ার লেডি-তে।'

একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে লিয়াকে। তারমানে রাত কাটানোর জন্যে নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার তার।

'তুমি কি কথা না বলে থাকতে পারো না?' রবার্ট মিথের বকবকানিতে রানার কান ঝালাপালা।

গ্র্যাণ্ড হোটেল ইউরোপে উঠেছে রানা। কামরাটা আরামদায়ক, হোটেলের খাবারদাবারও মন্দ নয়। অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে, সে-সব প্রত্যাখ্যান করেছে ও। রুম-সার্ভিস টেলিফোন করে জানতে চেয়েছিল, 'রাতের জন্যে চমৎকার একজন সঙ্গিনী লাগলে জানাবেন, প্লীজ।'

রানা জবাব দিয়েছে, 'আমি চাই না আমাকে কেউ বিরক্ত করুক।' সাবধানের মার নেই, ক্রেডল থেকে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল।

সকাল ন'টায় মিথ ওকে মস্কোভিচে তুলে নিয়েছে। সকালটা শহরের এদিক

ওদিক ঘুরে বেরিয়েছে ওরা, মিথ আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে যে এ-সব জায়গা চেনা থাকলে ভবিষ্যতে সুবিধে হতে পারে।

'কথা না বলে থাকতে পারি কিনা? সত্যি পারি না। আমি তোমার ট্যুর গাইড, রাইট? কোথায় নিয়ে যাচ্ছি ব্যাখ্যা করতে দেবে না? নতুন রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার তোমার। এই ধরো যাদের বাড়ি-ঘর নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়…'

'আহ্, তুমি থামবে!'

'তাকিয়ে দেখো, ক্যাপিটালিজম রাশিয়ার কি হাল করে ছাড়ছে,' থামছে না মিথ। 'রাস্তার এক পাশ দিয়ে ছুটছে ক্যাডিলাক আর মার্সিডিজ, আরেক পাশে বুড়ো-বুড়িরা ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। ভাল কথা, বাগানের প্রতি কেন আকৃষ্ট হলাম সে-কথা তোমাকে আমি বলেছি?'

'কয়েকবার, মিথ। এবার এমন কিছু দেখাও দেখি, যা দেখার জন্যে এখানে আমি এসেছি।'

'ঠিক আছে, তাই হোক,' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে একটা সাইড-স্ট্রীটে ঢুকল মিথ। একা রাতের বেলা এই রাস্তায় ঢুকতে ভয় করবে রানার।

দরজা ও জানালায় মেকআপ করা নারীমুখ দেখল ওরা, চোখাচোখি হতেই হাত ইশারায় ডাকল ওদেরকে। রাস্তার শেষ মাথায় গাড়ির গতি কমতেই কোমর দুলিয়ে এগিয়ে এল দুটো মেয়ে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে ওদেরকে হাসাতে চেষ্টা করল। রুশ ভাষায় অশ্রাব্য খিস্তি করে তাদের ভাগাল মিথ। তারপর সহাস্যে জিজ্ঞেস করল রানাকে, 'এই শব্দগুলোর অর্থ জানো?'

'জানি, তবে এই প্রথম নিজের কানে শুনলাম।'

'এই ভাষায় কথা না বললে নতুন রাশিয়ায় তুমি সুবিধে করতে পারবে না। এবার ভাল করে তাকাও, আমরা ইন্টারেস্টিং একটা এলাকায় চলে আসছি। ডান দিকে বাঁক ঘুরব আমি, তুমি বাম দিকের বিল্ডিংটার ওপর চোখ বুলাবে।'

সীটে হেলান দিল রানা, একটা দোকানের মাথায় ঝোলানো সাইনবোর্ডটা পড়ল–মোলায়েভ ফিউনারেল পার্লার। 'এবার হয়তো তুমি বলবে এটাই সেন্ট পিটার্সবার্গের ডেড সেন্টার।'

'রসিকতা নয়, রানা। এই জায়গার কথাই তোমাকে আমি বলছিলাম। আমার কাছে নিরেট তথ্য আছে। দোকানটার পাশে বড় কাঠের যে দরজাটা দেখছ, ওটার ভেতর কফিন নিয়ে একটা হার্স বা ক্যারিজ ঢুকবে ঠিক বিকেল চারটের সময়। ভেতরে ব্যবসা বা লেনদেন হবে, দশ মিনিট পর বেরিয়ে আসবে ক্যারিজটা। বেলা তিনটের মধ্যে আমি যদি তোমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পাই, সবাইকে সতর্ক করে দেব। ঠিক আছে?'

'মেকস সেন্স। নিখুঁত বীমার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন।'

'তা আর বলতে। সবুর, এবার আমাদেরকে বাম দিকে বাঁক নিতে হবে। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে তোমার।'

তোবড়ানো গাড়িটা চওড়া একটা গলিতে ঢুকল। সামনের দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না রানা।

অনেকগুলো দামী গাড়ি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি গাড়ির পাশে এক বা দু'জন করে লোক, তাদের পরনে দামী কাপড়চোপড়, গা থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ ছুটছে। অনেকেই গাড়ি নিয়ে আসেনি, তাদের কাপড়চোপড়ও তেমন সুবিধের নয়, রাস্তার আরেক দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। প্রতিটি গাড়ির বুটে, প্রতিটি ট্রাকের পিছনে এবং রাস্তার ধারে ফুটপাথে স্তূপ করা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র—একে-ফরটিসেভেন, গ্রেনেড লঞ্চার, হ্যাণ্ড গান, উজি, এইচ অ্যাণ্ড কে সাব-মেশিন গান, বাক্সভর্তি অ্যামুনিশন।

হাসল মিথ, তারপর ট্যুর গাইডের ভূমিকায় ফিরে এল। 'মৃত্যু কেনাবেচার বাজারে স্বাগতম। দ্য ওয়াইল্ড ইস্ট, রানা। রাশিয়ায় ক্যাপিটালিজমের উৎকর্ষ দেখতে হলে এখানে তোমাকে আসতে হবে। মুক্ত বিশ্বে নাম লিখিয়েছে ওরা, কাজেই সবাই এখন খুন করার অধিকার পেয়ে গেছে। এ যেন ঠিক পূর্ব লস এঞ্জেলসে চলে এসেছি আমরা, তাই না?'

'ভাবতে ভাল লাগছে যে ওখানে কখনও যাইনি আমি।'

'না গিয়ে ভাল করেছ। সবুর, এই বাজারের শেষ মাথায় পৌঁছে বাম দিকে বাঁক নিতে দাও আমাকে। এদিকে বরিস নবোকভের একটা আস্তানা আছে, রাস্তার শেষ মাথায়।' হাত তুলে একটা দরজা দেখাল সে, দেখে মনে হলো কোন নাইটক্লাবের প্রবেশ পথ। 'রাত দশটার মধ্যে এখানকার নরক গুলজার হয়ে ওঠে। তবে তোমার পুরানো স্যাঙ্গাৎ কাজ সারে দিনের বেলা।' ডান দিকে বাঁক ঘুরে নির্জন একটা গলিতে ঢুকল মিথ। 'এদিকের যে-কোন একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে তোমাকে। ভেতরে ঢুকে গন্ধ শুঁকে এগোবে। কিভাবে ঢুকবে, তা আমি জানি না। শুধু জানি ঢুকতে পারলে তার দেখা পাওয়া কঠিন হবে না।'

রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল মিথ। তৈরি হয়েই ছিল রানা, লাফ দিয়ে নিচে নেমে একটা দরজার ছায়ায় সরে এল। ও স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই গাড়ি আবার ছেড়ে দিয়েছে মিথ।

পাঁচিল আর দরজা দেখে মনে হলো, জায়গাটা পরিত্যক্ত কোন ওয়্যারহাউস হবে। এ-ধরনের জায়গা আগেও বহু দেখেছে রানা। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না অথচ ভেতরে বিলাসিতা বা আধুনিকতার কোন অভাব নেই।

পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল রানা, কিনারা মোড়া মেটালে চাপ দিল। গোপন একটা কমপার্টমেন্ট উন্মুক্ত হলো, লক-পিকিং টুল-এর পুরো একটা সেট রয়েছে ভেতরে। রানা ভাবছে, তালার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল নবোকভ, আজও কি সে আগের মত সতর্ক? কেজিবিতে এখন সে না থাকলেও, ট্রেনিং ভুলে যাবে বলে মনে হয় না। সে সময় শুধু তালা সম্পর্কে নয়, সফিসটিকেটেড ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম সিস্টেম সম্পর্কেও লেকচার দিত নবোকভ।

দেখা গেল রানার পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেনিং ভুলে গেছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধেই হলো না। সরু একটা প্যাসেজ হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুল ও, তারপর সিঁড়ির মাথায়। মিথ বিদায় নিয়েছে মাত্র তিন মিনিট হলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, ওপর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে এল। কে যেন রুশ উচ্চারণে ইংরেজি গান গাইছে। একটা মেয়ে।

বরিস নবোকভ খুব লম্বা, চওড়া কাঁধ, হাতির মত বিশাল ভুঁড়ি, চাঁদপানা মুখ। চাঁদের পিঠে যেমন গর্ত আর খানা-খন্দ থাকে, তেমনি তার মুখেও বসন্তের দাগ ভর্তি।

তার ক্লাবের নাম নবোকভ'স। বিলাসবহুল হলেও, একটু সেকেলে। নব্য ধনীদের মেয়ে সাপ্লাই দেয় সে, নারী ব্যবসার ফ্রন্ট হিসেবে ক্লাবটা চালাচ্ছে। তবে তার আসল ব্যবসা অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনাবেচা।

ক্লাবে এই মুহূর্তে প্রতিটি টেবিলেই লোকজন রয়েছে, কোন না কোন ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করছে তারা। সবার কণ্ঠস্বর খাদে নামানো, এ থেকেই বোঝা যায় আইন ভাঙার শলা-পরামর্শ চলছে।

ঢোলা একটা সাদা সুট পরেছে নবোকভ। গোল মুখটা কামানো, মাথাটাও তাই। ক্লাবের একদিকে পাঁচ-সাতটা টেবিলে বসে আছে সুন্দরী কয়েকটা মেয়ে, খদ্দেরের অপেক্ষায়।

কামরার শেষ মাথায় উঁচু একটা মঞ্চ, লাল স্কার্ট পরা এক তরুণী মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে। সে-ও খুব সুন্দরী। তবে তার নাচও হচ্ছে না, গানও হচ্ছে না। ইংরেজি শব্দগুলো এমন সুরে উচ্চারণ করছে, শব্দগুলোর অর্থ তার জানা আছে বলে মনে হয় না। সে গাইছে, 'রেইনিং ইন বাল্টিমোর...।'

গত এক ঘণ্টা ধরে পাটখড়ির মত লম্বা ও সরু এক পাকিস্তানীর সঙ্গে দর কষাকষি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নবোকভ। দরে না বনায় চুক্তি হলো না, খদ্দের বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে হঠাৎ নবোকভের চোখ পড়ল টেবিলে রাখা ছোট্ট টিভি মনিটরের ওপর। আকারে সেটা একটা তাসের চেয়ে বড় হবে না। অস্পষ্ট বীপ বীপ শব্দ করল মনিটর, তারপর স্ক্রীনে ছবি ফুটল।

ঝুঁকল নবোকভ। দম আটকে তাকিয়ে থাকল সে। গলির দিকের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে এক লোক। লোকটাকে চিনতে পেরে পালস রেট বেড়ে গেল তার।

লোকটাকে অনুসরণ করছে টিভি ক্যামেরা, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসতে শুরু করল নবোকভ। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে আপনমনে মাথা দোলাচ্ছে সে।

অলসভঙ্গিতে এক লোককে ইঙ্গিত করল নবোকভ। দুটো গরিলাকে এক করলে যা দাঁড়াবে, ওই লোকের আকৃতি ঠিক তাই। চাপা গলায় তার কানে কানে কথা বলল সে। লোকটা চলে গেল।

এতক্ষণে চেয়ার ছাড়ল নবোকভ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাল ভেলভেটের পর্দার দিকে এগোল। পর্দাটা মঞ্চের ডান দিকে।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নবোকভ, অটোমেটিক পিস্তলের মাজলটা কানের পিছনে চেপে বসায় একটুও অবাক হলো না। 'তাহলে শোনো,' বলল সে। 'এই বিশেষ ব্র্যাণ্ডের ফায়ারআর্ম ব্যবহার করে এমন মাত্র তিনজনকে চিনি আমি, তাদের দু'জনকে আমি নিজে খুন করেছি '

'আমাকে তাহলে ভাগ্যবান বলতে হবে, নবোকভ,' ফিসফিস করল রানা।
অপর লোকটার উপস্থিতি এমন সময় টের পেল রানা, যখন ওর আর কিছু করার নেই। চামড়া দিয়ে মোড়া হাতুড়িটা নরম শব্দ করল ওর খুলিতে, অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও।
'না, আজ তুমি ভাগ্যবান নও, মি. রানা,' বিড়বিড় করল বরিস নবোকভ।

***

নীল বজ্র-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

মনে হলো যেন কালো কাদা ঠেলে ওপরে উঠছে। শুনতে পেল কারা যেন কথা বলছে, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল কি ঘটেছিল। জ্ঞান ফিরে এলেও, এক চুল নড়েনি মাসুদ রানা–এটা ওর অনেক বছর ধরে শেখা একটা কৌশল। জ্ঞান ফিরে পাবার সময় কাছাকাছি শত্রু থাকলে নোড়ো না, কিছু করার আগে পরিস্থিতি বুঝে নাও।

শুনতে পেল বরিস নবোকভ নির্দেশ দিচ্ছে, এবং আন্দাজ করল কামরায় অন্তত চারজন লোক রয়েছে। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে সেই তরুণীর বেসুরো গান।

নড়ল রানা, মাথাটা সবেগে ঝাঁকাল, তারপর তাকাল চারদিকে। ওকে বেঁধে রাখা হয়নি, বসিয়েছে ভাঙাচোরা একটা চেয়ারে।

নবোকভ বসে আছে ওর সামনের একটা চেয়ারে, তার আশপাশে অন্তত তিনজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা। নবোকভের চাঁদপানা মুখ হাসিতে ভরে উঠল। 'আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো, দা গ্রেট মাসুদ রানা–ড্যাশিং, সফিসটিকেটেড বিসিআই এজেন্ট। নাটকীয় হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা জাগছে আমার মধ্যে, বলতে ইচ্ছে করছে, আপনাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা বোধ করছি আমি।' হো হো করে হেসে উঠল সে, দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও, তবে কোন শব্দ না করে।

রানা শুধু তাকিয়ে থাকল, কিছু বলছে না।

'দা গ্রেট মাসুদ রানা,' বলে আবার হেসে উঠল নবোকভ, এবারও মাপা হাসি ফুটল সঙ্গীদের ঠোঁটে। 'ঝাঁকাবে, নাড়বে না, তাই না, মি. রানা?'

নেপথ্য তরুণী গায়িকা গান গাওয়ার নামে আর্তনাদ করছে। 'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিড়ালের গলা চেপে ধরেছে?'

নবোকভের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া: হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে রানার দুই পায়ের মাঝখানে সরাসরি গুলি করল। চেয়ারের গদিতে একটা কুৎসিত গর্ত তৈরি হলো, নোংরা তুলো ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, চেয়ারের পিঠে সেঁটে গেল রানা।

'ও আমার মিসট্রেস, সভেতলানা।' পিস্তলটা এমন ভঙ্গিতে নাড়ছে নবোকভ, যেন মনস্থির করতে পারছে না এরপর কোথায় গুলি করবে।

'চর্চা করলে সভেতলানা আরও ভাল গাইতে পারবে,' হাসল রানা।

নবোকভের পেশীতে সামান্য ঢিল পড়ল, গলা চড়িয়ে চিৎকার করল সে, 'সভেতলানা, যাও, তাজা বাতাসে একটু হেঁটে এসো!'

নেপথ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল, সেটা চুরমার হলো অশ্রাব্য রুশ খিস্তিতে, সভেতলানার হাইহিল খট খট আওয়াজ তুলে মিলিয়ে গেল দূরে। কান পেতে শুনল নবোকভ, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দে মৃদু ঝাঁকি খেলো সে, ফিরল রানার দিকে। 'কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আগমন, মি. রানা? আপনার সম্পর্কে এখনও আমার সীমাহীন কৌতূহল। শুনতে পাই সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি আপনাকে কিনে নিয়েছে।' গোলাকার মুখে অমায়িক হাসি দেখে মনে হবে বন্ধুবৎসল সজ্জন ব্যক্তি সে। 'আজকাল আপনি নাকি শুধু বিএসএস নয়, সিআইএ-র হয়েও ভাড়া খাটেন। সত্যি নাকি?'

'বাংলাদেশের স্বার্থ উদ্ধার হলে সবাইকে সাহায্য করি আমি, এসপিওনাজ জগতে চিরশত্রু বলে কেউ নেই,' বলল রানা। 'এই যেমন এখানে আমি আপনার কাছ থেকে একটা উপকার চাইতে এসেছি।'

হেসে উঠল নবোকভ, দেহরক্ষীদের দিকে ফিরে বলল, 'শুনলে তোমরা? মি. রানা আমার কাছে উপকার চাইতে এসেছেন!'

তারা সবাই মুচকি হাসল।

'মি. রানা,' হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠল নবোকভের চেহারা, রঙ হয়ে উঠল প্রায় টকটকে লাল। 'আমার হাঁটু প্রতিদিন ব্যথা করে। ঠাণ্ডার দিনে ব্যথাটা বাড়ে। আপনি কি জানেন, দুনিয়ার এই অংশে শীতকাল কত লম্বা?'

খুক করে কাশল রানা।

'মি. রানাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও, ইউরি,' দেহরক্ষীদের একজনের দিকে তর্জনী খাড়া করল নবোকভ।

প্রকাণ্ডদেহী দেহরক্ষী ইউরি বিড় বিড় করে জানাল, কাউকে জ্ঞান দান করার মত আইকিউ তার নেই। আরও কিছু বলতে চাইল সে।

চোখ গরম করে তাকাল নবোকভ, মুখে কুলুপ আঁটল ইউরি।

রানা বলল, 'বুঝলেন, নবোকভ, ভাবতে মাঝে-মধ্যে অবাক লাগে যে আপনি কেজিবির এজেন্ট ছিলেন। আপনার যে ক্যালিবার আর ইন্টেলিজেন্স, তাতে তো উপলব্ধি না করার কথা নয়—হাঁটুতে গুলি লাগানোর মধ্যে কোন দক্ষতা ছিল না, দক্ষতা ছিল আপনার শরীরের বাকি অংশে গুলি না লাগানোর মধ্যে।'

বুঝতে বিশ সেকেণ্ড সময় নিল নবোকভ। 'ও, আচ্ছা। তাহলে বলুন কেন আপনি আমাকে খুন করেননি?'

'ধরে নিন প্রফেশনাল কার্টসি।'

প্রকাণ্ড কামানো মাথাটা তুলে নবোকভ ভারি গলায় বলল, 'তাহলে ওই কার্টসি আমিও ফিরিয়ে দেব।' আবার পিস্তল তাক করল সে, গুলিও করল। বুলেটটা লাগল চেয়ারে, রানার ডান হাঁটু থেকে আধ ইঞ্চি দূরে।

'মোলায়েভ ফিউনারাল পার্লার। আজ বিকেল চারটের সময়,' কথাগুলো খুব দ্রুত বলল রানা, যেন তৃতীয় বুলেটটা ঠেকাতে চেষ্টা করছে।

'সত্যি?' চেয়ারে বসা দৈত্যাকার রাশিয়ান কুণ্ডলী ছাড়িয়ে সিধে হলো। 'তাহলে তো আমাদের নিরিবিলিতে কথা হওয়া দরকার।'

নবোকভের অফিসটা পরিচ্ছন্ন, আধুনিক ফার্নিচার আর ফাইলিং কেবিনেট দিয়ে সাজানো, ডেস্কের ওপর একটা কমপিউটর আছে, বড় একটা মেশিনে কফি তৈরি হচ্ছে।

ইঙ্গিতে রানাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দুটো কাপে কফি ভরল সে। 'আমার যতটুকু মনে পড়ে, চিনি ছাড়া কালো কফিই পছন্দ করেন আপনি।'

'মানুষের অভ্যাস বদলায়, দুধ চিনি দুটোই আমার লাগবে। তবে, হ্যাঁ, আপনার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।'

'আপনার মতই, মি. রানা, এই স্মৃতিশক্তি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।'

ডেস্কের ওপর একটা ফ্রেমে ঝারঝিনস্কি স্কয়ারের সেই বিখ্যাত ভবনটা দেখা যাচ্ছে, কেজিবির হেডকোয়ার্টার। 'আপনি দেখছি এখনও পুরানো দিনের কথা ভুলতে পারেননি,' বলল রানা।

'এখনও আমরা ওটাকে মস্কো সেন্টার বলি।' ডেস্কের পিছনে বসল নবোকভ। 'আমেরিকানদের একটা প্রবাদ আছে– "যা চলে যায় তা আবার ফিরে আসে"।'

'আছে বটে।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এক দশকের মধ্যে আবার আমরা নিজেদের কাজে ফিরে যেতে পারব। রাজনৈতিক আদর্শ এত সহজে মরে না, শুধু একটা ঘোষণা দিয়ে মানুষের মন থেকে তা মুছে ফেলাও যায় না। এবার বলুন, মোলায়েভ ফিউনারাল পার্লারে কি?'

'দু'শো পাউণ্ড সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ, একটা কফিনে লুকানো। ক্যারিজ নিয়ে আপনার লোক ভেতরে ঢুকবে, হাতবদল হবে টাকা, ওদের লোক ক্যারিজ নিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

'তো?'

'তো, ওদের লোকটা গ্রেফতার হতে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সীজ করা হবে এক্সপ্লোসিভ। এই তথ্য জানা থাকায় আপনার লোক টাকা সহ অলৌকিকভাবে পালিয়ে আসতে পারবে। তাকে সাবধান করার জন্যে যথেষ্ট সময় আছে আপনার হাতে, এবং আমি কথা দিচ্ছি ঘটনাটা ঘটবে। আরও কথা হলো, আজ দুপুর তিনটের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু লোক আমার তরফ থেকে কোন সাড়া না পেলে সব ভেস্তে যাবে। এক্সপ্লোসিভ, ওদের লোক, আপনার লোক, এবং নগদ টাকা।'

চকচকে কামানো মাথাটা ঝাঁকাল নবোকভ। 'এই তথ্য আমাকে কতটুকু ঋণী করছে?' জানতে চাইল সে।

'খুব সামান্য। আমি চাই আপনি আমাকে রবিন হুডের ঠিকানা বলে দিন।'

নাক-মুখ দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করল নবোকভ, হাসির সঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করল সে। 'কেন, রবিন হুড আপনার কোনও ক্ষতি করেছে নাকি?'

'সে একটা হেলিকপ্টার চুরি করেছে।'

'আমার ছ'টা...।'

'না, তিনটে,' বলল রানা। 'তার মধ্যে একটাও আকাশে তোলার উপযুক্ত নয়।'

হেসে উঠল নবোকভ। 'কে গুণছে?'

'কমরেড নবোকভ,' রানা এখন সিরিয়াস। 'এই লোকগুলো সাধারণ ক্রিমিনাল নয়। এরা বিশ্বাসঘাতক। এরা একটা নিউক্লিয়ার স্পেস উইপন চুরি করার কাজে ওই হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে। কাজটা করার সময় নিরীহ অনেকগুলো লোককে খুনও করেছে।'

'বিদেশী এক লোকের কাছে আর কি আশা করেন আপনি?'

'কে, কার কথা বলছেন?'

'এই রবিন হুড। এই নাম নেয়া থেকেই তো ব্যাপারটা আঁচ করা যায়, সে পুরোপুরি রাশিয়ান হতে পারে না।'

'আপনি তাকে চেনেন?'

মাথা নাড়ল নবোকভ। 'কোনদিন দেখিনি, তবে জানি যে সে বিদেশী হলেও তার শরীরে কসাক রক্ত বইছে। সে একজন লিয়েঞ্জ কসাক।'

'এই কসাকরা হিটলারের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, যে যুদ্ধটাকে গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওঅর বলেন আপনারা।'

'আর আপনারা বলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হ্যাঁ, ইতিহাস আপনার ভালই পড়া আছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর লিয়েঞ্জ কসাকরা জার্মানীতে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। তারা আশা করেছিল ব্রিটিশ ফোর্সে যোগ দিয়ে আবার যুদ্ধ করবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের সঙ্গে বেঈমানী করে। ওরা তাদেরকে স্ট্যালিনের কাছে ফেরত পাঠায়, তিনি সময় নষ্ট না করে সব ক'টাকে মেরে ফেলেন—স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সহ প্রতিটি পরিবারের সবাইকে।'

'ইতিহাস ঘাঁটলে ইংরেজদের এরকম বেঈমানীর কাহিনী আরও অনেক পাওয়া যাবে।'

'তা যাবে। কসাকরাও কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তিই পেয়েছে। তবে পরিবারের আর সবাই, বিশেষ করে ছোটরা, নির্দোষ ছিল। হ্যাঁ, রবিন হুড।'

'আমি চাই আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। উপায় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। তাকে আমার কথা জানতে দিন, জানতে দিন হেলিকপ্টারটা সম্পর্কে লোকজনকে প্রশ্ন করছি আমি। আপনি তাকে জানাতে পারেন, ধরুন—আজ রাতে আপনার সঙ্গে আমার গ্র্যাণ্ড হোটেল ইউরোপে দেখা হতে যাচ্ছে। খবরটা তাকে বের করে আনতে পারে।'

'তাহলে আপনার আমার মধ্যে দেনা-পাওনা শোধবোধ হয়ে যাবে? শুধু ঋণী থাকবে সে?'

'ঠিক তাই।'

চেয়ার ছাড়ল নবোকভ, পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগোল। 'কোনদিন যদি পেশা বদল করেন, আমাকে জানাবেন।'

দরজার কাছে পৌঁছে রানা বলল, 'আশপাশে আপনার মত লোক যতদিন থাকবে, কমরেড নবোকভ, কাজ পেতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের পালস সেভারনায়া স্টেশনে আঘাত হানার সময় লিয়ার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনে চড়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ আসার সময় ব্যাপারটা খেয়াল করে সে, এবং মনটা সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হয়ে যায়, কারণ এই ঘড়িটার সঙ্গে অনেক আবেগ ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। সে যখন প্রথম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, তখন তার মা-বাবা অনেক কষ্টে তাকে এই ঘড়িটা কিনে দিয়েছিল। এটা কেনার জন্যে এক মাস হাঁপানির ওষুধ খাওয়া হয়নি তার মায়ের, বাবাকে দু'মাসের জন্যে সিগারেট ছাড়তে হয়েছিল। লিয়ার হাতে এখন অনেক টাকা, ইচ্ছে করলেই নতুন একটা কিনতে পারে সে, কিন্তু মা-বাবার দেয়া উপহার হাত থেকে খুলে ফেলতে তার মন চাইছে না। তারচেয়ে বরং একজন মেকানিক পাওয়া গেলে মেরামত করে নেবে। তার আগে সময় জানার প্রয়োজন মেটাবে শহরে ছড়িয়ে থাকা সরকারী ঘড়ি দেখে। অচল হলেও, প্রিয় ঘড়ি, কব্জিতে রাখতে তার খুব ভাল লাগছে।

ভাচাইকোভস্কি স্ট্রীটের কাছাকাছি ছোট একটা হোটেল পেয়েছে লিয়া। অগ্রিম ভাড়া ডলারে শোধ করলে পাসপোর্ট বা অন্যান্য কাগজ-পত্র ওরা দেখতে চায় না। সেভারনায়া স্টেশনে ওদের বেতন দেয়া হত আমেরিকান ডলারে, কেউ যাতে ওখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে মুখ খুলতে উৎসাহী না হয়। সেই ডলার এখন বেঁচে থাকার জন্যে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্যে ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল লিয়া।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে সে, হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় নাস্তা করেছে, তারপর ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। সময়টা তো কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কি-ই বা আর করতে পারে সে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আওয়ার লেডি অব স্মোলেনস্ক নামে চার্চটার সামনে দিয়ে একবার হেঁটে এসেছে। নীল রঙ করা খুদে একটা অর্থডক্স চার্চ, স্মোলেনস্ক ইন্সটিটিউটের কাছাকাছি। ওখানে পৌঁছে সে উপলব্ধি করল, তার চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ ক্রিমিনালের মত হয়ে উঠেছে, অন্তত ফেরারী আসামীর মত তো বটেই- ঘন ঘন পিছন দিকে তাকাচ্ছে, বাঁক ঘোরার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে, সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে পথিকদের, নজর রাখছে গলিমুখে।

সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে আবার ফিরে এল লিয়া, বাইরে থেকে চার্চটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভেতরে ঢোকার আগে আরেকবার ওটাকে ঘিরে চক্কর দিল সে।

ভেতরটা রত্নখচিত, আইকনগুলো সোনালি, দেখে দম বন্ধ হয়ে এল লিয়ার। শুধু চার্চে ঢুকেই তার ভাবাবেগ উথলে উঠেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিনা জানে না

সে, রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অনুশাসন বা রীতি-নীতি সম্পর্কেও সে অজ্ঞ, অথচ ভেতরে পা দেয়ার পর সুগন্ধী ধোঁয়া নাকে ঢুকতেই প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করল তার।

মাঝখানের আইল ধরে ভার্জিন মেরীর বড় একটা আইকনের দিকে ধীর পায়ে এগোল লিয়া। ছোট একটা বাক্সে টাকা ফেলে পবিত্র মোমবাতি জ্বালল সে, তারপর প্রার্থনা করার জন্যে হাঁটু গাড়ল।

লিয়া তার মা-বাবার জন্যে প্রার্থনা করল, তারপর সেভারনায়া স্টেশনে যারা মারা গেছে সেই সব বন্ধুর আত্মার জন্যে। সবশেষে নিজের জন্যে প্রার্থনা করল, ঈশ্বরকে বলল তাকে যেন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয়। কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা তাকে কেউ কখনও শেখায়নি, তবে তাতে কোন অসুবিধে হলো না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো, চার্চে ঢোকার পর দশ বা পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। কিরগিজ আসেনি।

আতঙ্ক চেপে ধরল লিয়াকে। হুড়মুড় করে এক গাদা প্রশ্ন জাগল মনে। কিরগিজ কি ধরা পড়ে গেছে? তার কথায় এখানে এসে সে কি একটা ফাঁদে আটকা পড়েছে?

আতঙ্ক ধীরে ধীরে বাড়ছে। তার মনে হলো, এখুনি এখান থেকে তার পালানো উচিত। সাবধানে এগোল সে, যাচ্ছে পশ্চিম দরজার দিকে। খানিক দূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। সে কি কোন শব্দ শুনল? পিছনে কারও পায়ের নরম আওয়াজ? আইকনের সামনে মোমবাতির শিখাটাকে কাঁপতে দেখল সে, যেন ওটার সামনে দিয়ে এইমাত্র কেউ দ্রুত হেঁটে গেছে।

দরজার দিকে ঘুরে ছুটল লিয়া। ভয় পেয়েছে সে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, একজনের বাহুর ভেতর সেঁধিয়ে গেল। এই মাত্র চার্চে ঢুকেছে লোকটা।

'লিয়া!' কিরগিজ ডাকল তাকে।

'ভিক্টর!' লিয়ার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। 'ভিক্টর কিরগিজ, কি...?'

ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল কিরগিজ। 'জলদি। আমার সঙ্গে এসো। সময় খুব কম।' লিয়ার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল সে।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল লিয়া, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, তার মনে হলো কি যেন ঠিক মিলছে না। কিন্তু তারপর সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রওনা হলো কিরগিজের সঙ্গে। অনুভব করল, কিরগিজ তার কাঁধে একটা হাত রাখল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভার্জিন মেরীর সেই আইকনটার দিকে। এতক্ষণে লক্ষ করল লিয়া, আইকনের ডান দিকে একটা পর্দা ঝুলছে।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা, কিরগিজ এখনও তার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।

ভেতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়া। সামনের দৃশ্যটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিরগিজের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার মেয়েটার দিকে। পর্দার ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা—ওলগা পলিয়ানা। হাসছে সে। তার হাসিতে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেল লিয়া।

ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে, অনুভব করল কাপড় ভেদ করে তার ডান বাহুতে সূচ বিঁধল, দেখল জগৎটা বন বন করে ঘুরছে, তারপর নেমে এল গাঢ় অন্ধকার।

পলিয়ানার দিকে তাকিয়ে হাসল কিরগিজ। 'বোকা মেয়ে, তাই না?'

'এসো, তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলি ওকে। আমার আরও একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' কি একটা কথা ভেবে অসম্ভব পুলক অনুভব করছে পলিয়ানা।

দুই

গ্র্যাণ্ড হোটেল ইউরোপের বেসমেন্টে একটা স্পা বা ঝর্ণা আছে, লণ্ডন আর নিউ ইয়র্কের টার্কিশ বাথ-এর আদলে তৈরি। পার্থক্য হলো, এখানকার ডিজাইনাররা প্রাচীন রুশ সাংস্কৃতিক রীতি বা ঢং অনুসরণ করে স্পা সাজিয়েছেন, তুরস্কের কোন ছাপ পড়তে দেননি।

সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় বিভিন্ন আকারের মাত্র একটা ডিজাইনের ঝাড়বাতি দেখা যেত, যেন অন্য কোন ডিজাইন রাষ্ট্র অনুমোদন করেনি। অদ্ভুত মনে হলেও, ঘটেছিল ঠিক তাই। সেই এক ও অভিন্ন ডিজাইনের ঝাড়বাতি এখনও চলছে। অভ্যন্তরীণ সজ্জা হিসেবে সঙ্গে রয়েছে অলংকৃত পিলার, চোখ জুড়ানো মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য, ভেলভেট মোড়া আসন, দেয়াল বা জানালার ওপর টাঙানো নকশা করা ঝালর। আর বাতাসে রয়েছে তীব্র ক্লোরিন-এর গন্ধ।

সন্ধের দিকে প্রায়ই দেখা যায় বিলাসবহুল সুইমিং পুলে ব্যবসায়ীরা সাঁতার কাটছেন, কিংবা কাপড়চোপড় খুলে বসে আছেন বিশাল স্টীম রুমে। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে এ দুটো জায়গা আদর্শ, ক্লোরিনের গন্ধ থাকা সত্ত্বেও।

আর সবার আগে পৌঁছুতে পেরে নিজের ওপর সন্তুষ্টবোধ করল রানা। সাঁতার শেষ করে স্টীম রুমে যাবার ইচ্ছে। একা থাকার আনন্দই আলাদা, সেজন্যে 'ক্লোজড ফর ক্লিনিং' সাইনটা ঝুলিয়ে এসেছে মেইন ডোরে। সিঁড়ির মাথায় ওটা, ওই দরজা দিয়েই পুল এরিয়ায় আসতে হয়।

কারণ অবশ্য আরও আছে। রবিন হুড টোপটা গিলতেও পারে ভেবে একা থাকতে চাইছে ও। এখানে পৌঁছে চেঞ্জিং রুম আর স্টীম রুমগুলো প্রথমেই চেক করে নিয়েছে, বিশেষ করে সুন্দর টাইলস দিয়ে সাজানো বড় কামরাটা।

পানি কেটে এগোচ্ছে রানা, এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছে সারাদিন কি কি করেছে আজ। অনেক বছর পর নতুন করে দেখা হলো নবোকভের সঙ্গে। তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে সিআইএ এজেন্ট রবার্ট মিথের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছে। বিস্ফোরক কেনাবেচার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিল নবোকভ, বিপুল পরিমাণ সি-ফোর এখন কর্তৃপক্ষের হাতে, আর নগদ টাকাটা নিরাপদে পৌঁছে

গেছে নবোকভের কাছে। বিনিময়ে, ধরে নেয়া যেতে পারে, ইতিমধ্যে রানার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তস্কর চূড়ামণি রবিন হুডের। এই মুহূর্তে রানার ভূমিকাণ্ড বলির পাঁঠা।

দ্রুত বাঁক নিয়ে ফিরে আসছে রানা, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। সমগ্র অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি। পুলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল, বড় স্টীম বাথে ঢোকার পথটা এখান থেকে কাছেই, পিলার দিয়ে আলাদা করা। বাষ্প এখানে মেঘের মত সচল ও আলোড়িত, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আকৃতি পাচ্ছে, যেন ভেতর দিয়ে এই মাত্র একটা ভূত চলে গেছে।

ঘন বাষ্পের ভেতর কেউ একজন আছে বলে মনে হলো রানার। এবার ওকে তৎপর হতে হয়, সতর্কতার সঙ্গে পৌঁছুতে হয় ওই একই স্টীমে।

পুল থেকে উঠে এল রানা, এদিকে রেখে যাওয়া তোয়ালে তুলে নিয়ে গা মুছল। চুল মুছতে শুরু করে ধীর পায়ে এগোল খিলানের দিকে। খিলানটা দুই পিলারের মাঝখানে, ভেতরে ঘন মেঘ। একটা তাক লক্ষ করে এগোচ্ছে ও, মখমলের আলখেল্লাটা যেখানে রাখা আছে।

এখন ইন্সট্রিঙ্কটই সব। কেউ একজন আছে এখানে, আছে খুব কাছে কোথাও, ঘুর ঘুর করছে অসৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে।

দ্বিতীয় কারও উপস্থিতি এখনও রানা শুধু অনুভব করতে পারছে। হঠাৎ জোড়া পিলারের মাঝখানে নিশ্ছিদ্র কুয়াশার ভেতর অস্পষ্টভাবে দেখা গেল তাকে, ঠিক ওর বাম দিকে। নিজের কাপড়চোপড় পেতে হলে ওটাকে পাশ কাটাতে হবে ওকে। নাচের ভঙ্গিতে বাম দিকে নয়, ডান দিকে এগোল রানা, পিলারটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে গাঢ় ধোঁয়া বা নিরেটদর্শন মেঘের ওপর। সত্যিই কি ওটা ধোঁয়া বা মেঘ?

ওটা যে কি, বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা। জীবনে হাজার বার টার্গেট করা হয়েছে ওকে, শতবার এরকম বাষ্প বা কুয়াশার ভেতর টার্গেটের খোঁজ করেছে ও। বাম দিকে ঘুরল অকস্মাৎ, সামনে এগোল নিচু হয়ে, প্রতিপক্ষের কাছে ছুরি থাকতে পারে ভেবে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ছুরিই আদর্শ অস্ত্র হতে পারে।

স্যাঁৎ করে একটা হাত বাড়াতেই আঙুলে মাংসের স্পর্শ পেল রানা, পরমুহূর্তে মুঠোর ভেতর চলে এল আরেক লোকের কব্জি। সামনে ও নিচের দিকে ঝাঁকি দিল ও। যেই হোক লোকটা, তাক-এর কাছাকাছি একটু পরিচ্ছন্ন বাতাসে টেনে আনতে চাইল তাকে।

মুখোমুখি চলে এল ওলগা পলিয়ানা, নিজের সামনে একটা তোয়ালে ধরে আছে। কব্জিটায় মোচড় দিতেই তাল হারিয়ে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল সে, রানা লাফ দিল পিস্তলটা হাতে পাবার জন্যে। নিচু তাকের ওপর আলখেল্লায় জড়ানো আছে ওটা।

ঘোরার পর রানা দেখল ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে পলিয়ানা। হাসল সে, ধীরে ধীরে হাত থেকে খসে পড়তে দিল তোয়ালেটা। মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে

সচেতন, চোখ মিটমিট করে চোখ থেকে ঘাম সরাল রানা। নিখুঁত নারীদেহ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষ যে ফ্যান্টাসী বা স্বপ্ন রচনা করে, নগ্ন পলিয়ানা হুবহু ঠিক তাই। রানার দিকে এগোল সে। দু'পা।

'আর নয়, যথেষ্ট কাছে আসা হয়েছে,' বলল রানা।

'আমি যা ভাবছি তার জন্যে যথেষ্ট নয়।' আবার এগোল পলিয়ানা, হাত দুটো তুলল রানার মাথাটা ধরার জন্যে। এক সেকেণ্ড পর এমন ভঙ্গিতে চুমো খেতে শুরু করল, যেন প্রচণ্ড পিপাসায় ছটফট করছে। পরমুহূর্তে রানার ওপর চড়াও হলো বাঘিনীর মত। খামচি দিচ্ছে ওর বেদিং ট্রাংকে, ছিঁড়ে আনতে চাইছে গা থেকে, ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে ফিসফিস করছে, 'রানা, প্লীজ, যদি ইচ্ছে হয় ব্যথা দাও আমাকে।'

ধস্তাধস্তি করছে রানা। যেন মনে হলো দীর্ঘ একটা সময় ধরে ভিজে নগ্ন মাংসের সঙ্গে উত্তেজক ভঙ্গিতে জড়াজড়ি করে থাকছে, পিছলে যাচ্ছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। গোঙাচ্ছে। ঠিক যেন একজোড়া বন্য প্রাণী।

তারপর অবশেষে নিজেকে মুক্ত করল রানা। আংশিক নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ও, পলিয়ানাকে নিচে ফেলে নিজে উঠে এসেছে ওপরে।

রানাকে ধরে রেখেছে পলিয়ানা, ছাড়েনি, শরীরটাকে ঘন ঘন মুচড়ে ওকে নিজের পছন্দ ও সুবিধে মত একটা পজিশনে এনে ফেলছে, সেই সঙ্গে বিড়বিড় করছে, 'ব্যথা দাও, রানা, প্লীজ!'

রানার মাথার ভেতর অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই অনুভব করল, ওরা দু'জন ছাড়াও অন্য কেউ এখানে আছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পলিয়ানা তার দুই পা দিয়ে ওর শরীরের ওপরের অংশ পেঁচিয়ে ধরল, চাপ দিচ্ছে পাঁজরের খাঁচায়। যেন এক হাজার বছর আগের কথা, অ্যাডমিরাল ডেভিড কপারফিল্ডের ভাঙা-চোরা লাশটার কথা মনে পড়ে গেল রানার।

মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাল রানা, ইতিমধ্যে পাল্টা হামলা শুরু করেছে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল হাতঘড়ির দিকে, ডায়ালের ওপর কাচে প্রতিফলিত হলো পিছনের দৃশ্যটা—বাষ্প থেকে বেরিয়ে আসছে একটা সচল কাঠামো।

এই মুহূর্তে আরও জোরে চাপ দিচ্ছে পলিয়ানা, তার পা দুটো এখন রানার ঠিক ঘাড়ের পিছনে, তার উরুর পেশী ঘন ঘন শক্ত ও শিথিল হচ্ছে।

রানা তাকে ধরল তার পা দুটো সামান্য ঢিল হতে। আরও শক্তভাবে আটকানোর জন্যে পেশীতে ঢিল দিচ্ছে পলিয়ানা। তার ভঙ্গিটা কাঁচির মত, দুই ফলার মাঝখানে আটকে রেখেছে রানাকে—তার পেশীতে ঢিল পড়তেই ঝাঁকি দিল রানা, কাত হয়ে পড়ল একপাশে, পলিয়ানার শরীরের নিচে ঢুকিয়ে দিল পা, তারপর পা জোড়া এত জোরে ছুঁড়ল যে পলিয়ানার পায়ের বাঁধন খুলে গেল, রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছন দিকে উড়ে গেল তার শরীরটা। মুহূর্তের জন্যে শূন্যে থাকল পলিয়ানা, উড়ছে নিজের শক্তি আর রানার পাল্টা হামলার আঘাতে।

পলিয়ানার গোড়ালি সরাসরি আঘাত করল এগিয়ে আসা লোকটার মুখে।

ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে নাক আর ঠোঁট থেকে।

হাতের ঝাপটা দিয়ে পথ থেকে পলিয়ানাকে সরাল রানা, হবু আততায়ীর মুখে দেড় মন ওজনের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। এক সেকেণ্ডের জন্যে তার পা মেঝেতে থাকল না, ছিটকে পড়ল দেয়ালের গায়ে, হাড় ভাঙার আওয়াজে রানার শরীর শিরশির করে উঠল।

ঘুরল ও। 'না। না, পলিয়ানা, না। যেখানে আছ সেখানে থাকো।' পিস্তলটা রানার হাতে চলে এসেছে। 'ছল-চাতুরী অনেক হয়েছে। এখন বলো দেখি তোমাকে আর ওই পেঁচাটাকে কে পাঠিয়েছে?'

'তোমার কি ধারণা?'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, রবিন হুড।'

'বাজিতে তুমি জিতবে। হ্যাঁ, অবশ্যই রবিন হুড।'

'তাহলে তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

পেশীতে ঢিল পড়ল, পলিয়ানা বলল, 'কাপড়চোপড় পরে, নাকি যেভাবে আছ সেভাবেই তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

পলিয়ানা জানাল, ওদের দেখা হবে স্ট্যাচু পার্কে। তারপর ব্যাখ্যা করল স্ট্যাচু পার্ক আসলে কি। খুঁটিনাটি সব কিছুর বিশদ বর্ণনা দিল সে। রানা ভান করল এ-সব যেন এই প্রথম শুনছে।

রানার বিছানায় শুয়ে কথা বলছে পলিয়ানা। হোটেল রুমে এনে প্রথমেই তার হাত ও পা নিজের দুটো নেকটাই দিয়ে বেঁধে নিয়েছে রানা, তৃতীয় নেকটাই বাঁধা পা আর হাত দুটোকে এক করেছে। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা খুবই আড়ষ্ট, তারপরও কৌতুক করে বলল, বন্ধন জিনিসটা নিশ্চয়ই রানা খুব পছন্দ করে।

ইতিমধ্যে আলখেল্লা পরে নিয়েছে রানা। পলিয়ানার কাপড়চোপড়ও খুঁজে বের করেছে। একজোড়া জিনস আর একটা শার্ট, রোব-এর নিচে পরেছিল। রোবটা পরেই ঝর্ণায় বা স্পাতে গিয়েছিল সে। ওখান থেকে পলিয়ানাকে নিয়ে লিফটে ওঠে রানা, এক হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, অপর হাতের পিস্তল চেপে বসেছিল পলিয়ানার পাঁজরে।

কাপড়চোপড় পরা শেষ হলে পলিয়ানার বাঁধন খুলে দিল রানা। 'ঠিক আছে, তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

গাড়ি চালাচ্ছে পলিয়ানা, হাতে পিস্তল নিয়ে পাশে বসে আছে রানা। 'তোমার রূপ আর যৌবন আছে, মরে গেলে সব ভেস্তে যাবে,' বলে চালাকি করতে নিষেধ করে দিয়েছে ও। পথে কিছু ঘটল না। এক সময় ভাঙাচোরা ও পরিত্যক্ত মূর্তিগুলোর অদ্ভুত দর্শন স্তূপের সামনে গাড়ি থামাল পলিয়ানা।

'এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

সীটে সরে বসল রানা, পলিয়ানা ভাবল তাকে চুমো খাবে ও। তা নয়, বাম

হাতের কিনারা দিয়ে তার ডান কানের পিছনে কোপ মারল রানা। দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়োজন হলো না। ব্যথায় খুলে গেল পলিয়ানার মুখ, তারপর ঢলে পড়ল হুইলের ওপর।

'সুইট ড্রিমস,' বলে গাড়ি থেকে নেমে ফেলিক্স-এর স্ট্যাচুর দিকে তাকাল রানা। আয়রন ফেলিক্স- ফেলিক্স ঝারঝিনস্কি–যে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন এক সময় সেটাই কেজিবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে, ইদানীং ওটাকে আরআইএস বলা হচ্ছে।

তথাকথিত পার্কে ঢুকে দু'পা এগোল রানা, বিপ্লবী নেতাদের মূর্তিগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে। নজরে পড়ল টাইগ্রি হেলিকপ্টারের কাঠামো, সঙ্গে একজন মানুষ। লোকটা স্ট্যাচুগুলোর আড়ালে নড়াচড়া করছে।

সাবধানে পিস্তলটা বের করে হেলিকপ্টারের দিকে এগোল রানা। আরও চার পা এগিয়েছে, একটা স্ট্যাচুর পিছনে আবার দেখা গেল লোকটাকে। এবার আড়াল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল সে, এগিয়ে আসছে খোলা একটা জায়গার দিকে। কাছাকাছি থেকে ভেসে এল একটা ট্রেনের আওয়াজ। তারপর, খোলা জায়গাটায় চাঁদের আলো পড়তে, লোকটাকে চিনতে পারল রানা।

কুৎসিত চেহারা, ক্ষতবিক্ষত মুখ। লোকটার মুখের বাম দিকে নতুন চামড়া লাগানো হয়েছে বলে মনে হলো। ওদিকের মুখ অসাড়। গলার আওয়াজটা খুবই পরিচিত রানার। 'হ্যালো, রানা,' অভ্যর্থনা জানাল পুরানো বন্ধু পিটার মুরেল।

তিন

'মুরেল?' রানার বিশ্বাসই হচ্ছে না। হঠাৎ শীত অনুভব করল, ইচ্ছে হচ্ছে বমি করে। হতবুদ্ধিকর ঘটনাটা বিশ্বাস করার মত নয়, আর তাই অবিশ্বাসটা দ্রুত ক্রোধে রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রশ্নটা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ পুরানো বন্ধু পিটার মুরেলকে বহু বছর ধরে চিনত ও–কবর থেকে উঠে আসলেও তাকে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই।

'হ্যাঁ।' পরিচিত কণ্ঠস্বর, তবে আড়ষ্ট ভাবটুকু কানে বাজল। এর জন্যে দায়ী তার মুখের বাম অংশের ত্রুটি। 'হ্যাঁ, রানা, মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছি আমি। কি ব্যাপার, রানা? কোন কটূক্তি করবে না? দু'একটা খিস্তি?'

'আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই, মুরেল।'

'বেশ তো, জিজ্ঞেস করো।'

'কেন?'

'কেন? উফ, ন্যাকামি কোরো না তো! কেন মানে? ভাষাটা আমি ভাল বুঝি, তাই। কি, এই উত্তরে তুমি সন্তুষ্ট নও?'

'না। ভদ্রোচিত, মেলে, এরকম একটা উত্তর দরকার আমার।'

'ঠিক আছে। হাত-পা আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিল্ডে থাকা, সারা দুনিয়ায় বোমা মেরে বেড়ানো, জীবনটাকে সরু তারের ওপর ধরে রাখা, সবশেষে বাতিল রূপে পরিণত হওয়া–কোন্ অর্থে ভাল, বলতে পারো আমাকে?'

'সবার বেলাই তাই ঘটছে, মুরেল। সৈনিক বা সিভিল সার্ভেন্টদের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। যে কোন পেশার কথা বলো, একই জবাব পাবে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও শুধু একটা যুদ্ধে জেতাই আসল কথা, বাড়ি ফিরে যদি শুনতে হয় হোক– "ওয়েল ডান, বয়েজ। চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, তবে সময় এখন বদলেছে। বিদায়, বৎস"। তোমার ধারণা, এটা ফেয়ার?'

'জীবনটা ফেয়ার, এ-কথা কেউ কোন দিন বলেনি।'

'বলেনি। সেটাই তো কারণ। আমি হারিয়ে গেলাম, কারণ বুঝতে পেরেছিলাম শ্রমিক পিঁপড়ে হয়ে থাকার মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ নেই। পছন্দ করলাম ফ্রিল্যান্স হওয়াটা।'

'কিভাবে তুমি ফ্রিল্যান্স হও! চাকরিতে ঢোকার সময় শপথ নিয়েছিলে...।'

'কিসের শপথ? দেশ মাতৃকার সেবা করার শপথ?'

'সবাই আমরা এই কাজ করব বলে কথা দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কথা দিয়েছি, কিন্তু দুনিয়াটা বদলে গেছে। কে মানে, দেশ বলতে নির্দিষ্ট একটা ভূখণ্ড? যদি বলি গোটা পৃথিবীটাই আমার দেশ? এই দুনিয়াটা আমার জন্মস্থান নয়?'

'কিন্তু তোমার ঐতিহ্য আর কৃষ্টি? দুনিয়ার সবাই তোমার আপনজন হতে পারে না। তুমি তো শুধু আপনজনদের পক্ষে লড়বে।'

হাসল মুরেল, তার হাসিতে ব্যঙ্গ ও তিক্ততা ঝরে পড়ল। 'আপনজনদের পক্ষে লড়ব, অথচ বিনিময়ে কিছুই পাব না, এই তো?'

'জানি না "কিছু" বলতে কি বোঝো তুমি। দুনিয়াটা সারাক্ষণ বদলাচ্ছে। যুদ্ধ আসে, আবার চলেও যায়। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমাদের পুরানো শত্রু চলে গেছে, কিন্তু তারা পিছনে ফেলে গেছে মহা বিশৃংখলা। আমার পেশায়, যা কিনা তোমারও পেশা, যে-কোন সময়ের চেয়ে কাজের পরিমাণ এখন অনেক বেশি। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ ধসে পড়েছে; এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে নতুন নতুন আতঙ্ক। আর আতঙ্ক দেখা দিলে আমাদেরকে দরকার হবে।'

'আমার বইতে এ-সব কথা নেই, রানা। আমি ফ্রিল্যান্স হতে পেরে খুব খুশি।'

'তুমি গোলমাল থামাবে না, বরং হাঙ্গামা বাধাবে?' প্রশ্নটার সঙ্গে হাত তুলল রানা, যে হাতে পিস্তলটা ধরা।

'ধ্যাত, হাতের ওটা সরাও তো। কি ভেবেছ, তোমার গতিবিধির ওপর আমি নজর রাখিনি?' ঘুরে দাঁড়াল মুরেল, ফিরে যাচ্ছে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, মুরেল এত দূরে সরে গেছে যে তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিভাবে, কেন, কি ঘটেছিল বলা কঠিন। সেই বিস্ফোরণ দায়ী হতে পারে কি? কিংবা কর্নেল কুরুনভের বুলেট? সেই আশির দশকে অপারেশনটার পর

কি ঘটেছে কে জানে। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম,' চিৎকার করল রানা।

'রানা, নাটক কোরো না। আমি তোমাকে চিরকাল একজন বাস্তববাদী জেনে এসেছি।' ঘুরল মুরেল, ফিরে আসছে। 'বিশ্বাস?' প্রশ্ন করল সে, রানার সুর নকল করে, যেন বিদ্রূপ করছে। 'বিশ্বাস অদৃশ্য হয়েছে, অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, বাদ দেয়া হয়েছে ওটা অভিধান থেকে। নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে অ্যাকাউন্ট্যান্টরা, নাকি তুমি খেয়াল করোনি? আজকের ডিকটেটর আগামীকালের ডিপ্লোম্যাট; বোমা নিক্ষেপকারী এবং সন্ত্রাসীরা আজকাল নোবেল প্রাইজ হাতিয়ে নিচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই এখন শুধু টাকা, রানা। শোষণ ও বঞ্চনার নতুন নামকরণ করা হয়েছে–ফ্রি মার্কেট মরালিটি। এ এমন এক মরালিটি, বাসের মত একের পর এক নতুন বন্ধু আসে আর যায়।' থামল সে, যেন জীবন ও দুনিয়া সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি হজম করতে চাইছে।

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অসাবধান, এ অভিযোগ নতুন নয়,' বলল রানা। 'তোমার মা-বাবা লিয়েঞ্জ কসাক ছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাও তারা খেয়াল করেনি? ওরা কসাক মানে তো তুমি একটা সিকিউরিটি রিস্ক।'

'তারা জানত, রানা। সবই তারা জানত। তবে ধরে নিয়েছিল, আমি এত ছোট ছিলাম যে সব কথা ভুলে গেছি।'

'আসলে ভোলোনি?'

'কি করে ভুলি, রানা? কি করে! তুমি কি জানো, আজ আমি এতিম? জানো, কিভাবে আমি এতিম হলাম? তুমি এ-ও জানো না যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এতিমদেরই বেশি পছন্দ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কসাকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল ব্রিটিশরা, ভাগ্যগুণে আমার মা-বাবা বেঁচে গেলেন। স্টালিনের ডেথ স্কোয়াডকে ফাঁকি দিলেন তাঁরা। কিন্তু একা আমার বাবা কিভাবে বেঁচে থাকেন? যাকে সঙ্গে রাখবেন, সে পরিস্থিতিও ছিল না। সে সময়কার এসআইএস ভেবেছিল, আমি এত ছোট যে কোন কথাই আমার মনে থাকবে না। কাজেই এক সময় আমাকে তারা নিজেদের কাজে লাগাল। আমি ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ করছি, কাজেই বাবার চোখে আমি হলাম বেঈমান–প্রতিশোধ হিসেবে আমার জন্মদাত্রীকে খুন করলেন তিনি, পরে নিজে আত্মহত্যা করলেন। সবই আমার মনে আছে, রানা। এমনকি যখন আমি পুরোপুরি অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিলাম, তখনও কিছু ভুলিনি।'

'জানতে পারি, এই নাম কেন? রবিন হুডের সঙ্গে কসাকদের কি সম্পর্ক?'

'এই নাম গ্রহণের কারণ ব্রিটিশদের সান্ত্বনা দেয়া,' বলল মুরেল। 'তারা যদি প্রাচীন রবিন হুডকে মেনে নিতে পারে, আমাকেও তাদের মেনে নেয়া উচিত। কাজকর্মের কথা যদি বলো, আসল রবিন হুডের সঙ্গে অনেক মিল আছে আমার।' তারপর সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা হওয়া দরকার আমার, রানা।'

'বন্ধুত্বের মর্যাদা তুমি হারিয়েছ, মুরেল,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'তোমার ভাল বা তোমার স্বার্থ এখন আমার কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না, বুঝতেই

পারছ।'

মুরেলের একটা হাত তার ক্ষতিগ্রস্ত মুখের বাম দিকে উঠল। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, সে খানিকটা ঘুরে যাওয়ায় তার মুখের ক্রটিবিহীন ডান দিকটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা–তারপর দেখল বাম দিকটা, ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস, কুৎসিত ও রোমহর্ষক ক্যারিকেচার। 'আমার এই অবস্থার জন্যে ব্রিটিশরা দায়ী নয়, রানা। তুমি একটা টাইমার সেট করেছিলে এক মিনিটে···।'

'তবে কুরুনভ তোমাকে গুলি করেন ওই এক মিনিট পেরুবার আগেই। তোমাকে দেয়া তার প্রস্তাবটা কি ছিল, মুরেল?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, যেন দু'জনের প্রবল ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নীরব যুদ্ধ চলছে। তারপর রানা ওর ডানদিকে নড়াচড়া লক্ষ করল। পেন্সিলের মত সরু লাল বিন্দু, কাঁধে নড়ে বেড়াচ্ছে, কাঁধ থেকে উঠে আসছে মুখে, তারপর নামতে শুরু করল বুকে। একটা লেযার সাইট। আবর্জনা ও মূর্তির স্তূপে কেউ একজন লুকিয়ে আছে। সে তার সাইটে ধরে রেখেছে ওকে।

আবার ঘুরে দাঁড়াল মুরেল। তিন পা এগিয়ে কথা বলার জন্যে থামল, তবে রানার দিকে ফিরল না। 'সত্যি একবার ভেবেছিলাম আমি, তোমাকেও আমাদের দলে ভিড়তে বলি। কিন্তু পরে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে এলাম, তুমি তোমার বন্ধুদের কথা শুনবে না, শুনবে শুধু নিজের দেশ আর সরকারের কথা।'

অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মুরেল, সেই সঙ্গে নড়ে উঠল রানা–সটান পড়ে গেল মাটিতে, গুলি করছে অন্ধকারে, গড়ান দিয়ে সরে যাচ্ছে ডান দিকে, তারপর লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটছে, ছোটার মধ্যে একটা আড়াল খুঁজছে–অথচ সারাক্ষণ লাল বিন্দুটা লেগে থাকল ওর গায়ে। অদৃশ্য কোথাও থেকে একজন স্নাইপার ট্রিগারে টান দিল।

হিসস করে একটা আওয়াজ হলো, যেন বাতাস চিরে ছুটে আসছে বিদ্যুতের ঝলক, চাবুকের মত নাগাল পেতে চাইছে ওর। বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো রানা, বুঝতে পারল লংরেঞ্জ কোন স্টান গানের টার্গেট হয়েছে ও। আজ আরেকবার ওর চোখের সামনে জগৎটা অন্ধকার হয়ে এল, সেই সঙ্গে কেউ যেন বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল ওর চিন্তাশক্তি। শেষ মুহূর্তে শুধু একটা পোড়া গন্ধ পেল রানা।

কে যেন পিছনে বাড়ি মারছে, বারবার। ওর নাম ধরে কেউ একজন ডাকছেও। একটা মেয়ে, বাচনভঙ্গিতে কোথাকার যেন টান আছে। রানা নড়তে পারছে না বা চোখ খুলতে পারছে না। বুকে ব্যথা, যেন কোন খচ্চর লাথি মেরেছে ওখানে।

ঘুমের মধ্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করল রানা। ঘুমটাই নিরাপদ মনে হচ্ছে। নিরাপদ নয় এমন কিছুর সামনে পড়তে চায় না।

'উঠুন···জাগুন, মিস্টার···স্যার, চোখ মেলুন···প্লীজ উঠুন।' এখন আর সন্দেহ নেই, কথার মধ্যে রাশিয়ান টান। মনে হলো, মেয়েটা ওর পিঠে চাপড় মারছে। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করার পর পুরোপুরি সচেতন হতে পারল রানা,

নিজেকে আবিষ্কার করল অপ্রত্যাশিত এক জগতে।

একটা ককপিটে বসে আছে ও। ওর সামনে সারি সারি ইন্সট্রুমেন্ট আর সুইচ। ওর চারদিকে একটা বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে। সীটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। বুকে আর বাহুতে বারবার পেঁচানো হয়েছে একটা রশি। অপর একটা রশি ওর কব্জির মাংসে ডেবে আছে। পায়েও পেঁচানো রয়েছে। বোঝার জন্য মেধার দরকার নেই, টাইগ্রি হেলিকপ্টারের ককপিটে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে।

আঘাত ও আওয়াজটা আসছে পিছন থেকে, ওই পজিশনে বসে ইলেকট্রনিক/নেভিগেশন অফিসার। 'উঠুন···উঠুন···।' একঘেয়ে সুরে একই কথা আওড়ে চলেছে মেয়েটা।

মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাতে পারল রানা। প্রথমেই চোখে পড়ল ঘন কালো চুল। তারপর মুখটা। আশ্চর্য সুন্দর আর মিষ্টি একটা চেহারা। পা দিয়ে পাইলটের সীটে আঘাত করছে এখনও।

'আমি ঠিক আছি, আমি এখন সুস্থ।' গলার ভেতরটা অসম্ভব শুকনো লাগল রানার, জিভের ডগায় আটকে যাচ্ছে কথাগুলো। আরও ভালভাবে দেখার জন্যে মাথাটা উঁচু করতে চাইল ও। কিন্তু বাঁধনগুলো এত শক্ত, তা সম্ভব হলো না।

'কিছু একটা করুন,' মিনতি জানাল মেয়েটা। 'ফর হেভেনস সেক, ডু সামথিং।'

'আমি খুব ক্লান্ত···তবু, ঠিক আছে।' সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিল রানা, ওর মুখ সুইচগুলোর নাগাল পেতে চাইছে। নাগালের মধ্যে যেগুলো পাওয়া গেল, নাক-মুখ আর কপাল দিয়ে সেগুলো টিপে দিচ্ছে। কিছু কিছু ইন্সট্রুমেন্ট আলোকিত হয়ে উঠল, গুঞ্জন তুলে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন, মাথার ওপর থেকে ভেসে এল রোটরের আওয়াজ।

একটা বীপ বীপ শব্দ রানার মনোযোগ কেড়ে নিল। রশিগুলোর চাপ বেড়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে ও, সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রুমেন্টটা দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল।

উইপনস' কন্ট্রোল প্যানেল। লাল আলোয় একটা মেসেজ ফ্ল্যাশ করছে– 'ডিলে লঞ্চ ইন সেকেণ্ডস টু···17···16···15···।

লঞ্চ? দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। মিসাইল? নাকি হেলিকপ্টারটাই?

সংখ্যাগুলো বিরতিহীন ফুটে উঠছে। আর রানা ভাবছে, একি তার আর মেয়েটার মৃত্যুর সময় গোণা চলছে?

···07···06···05···04···।

গোটা কেবিন প্রচণ্ড ঝাঁকি খেতে শুরু করল। তালা লেগে গেল কানে। আগুনের বিশাল শিখা দেখা গেল। ডানার নিচে থেকে বিকট আওয়াজ তুলে ছুটে গেল একজোড়া মিসাইল।

মিসাইল দুটো এত দ্রুত ছুটে গেল, কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই মাইলখানেক দূরে তীব্র আগুনের একজোড়া খুদে শিখার মত দেখা গেল

ওগুলোকে, বিল্ডিংগুলোর ছাদ প্রায় ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে। তারপর, প্রায় একযোগে, ওপর দিকে উঠল, আকাশ চিরে ছুটছে।

উইপনস' কণ্ট্রোল প্যানেল থেকে এখনও শব্দ হচ্ছে। উঁচু লয়ের যান্ত্রিক গুঞ্জন, পরের শব্দটা গুরুগম্ভীর হুঙ্কারধ্বনির মত, সবশেষে একনাগাড়ে জরুরী সুরে ডীট ডীট ডীট–আওয়াজটা রানা টার্গেট অ্যাকুইজিশন ওয়ার্নিং বলে চিনতে পারল।

চোখ নামিয়ে আলোকিত ইনস্ট্রুমেন্টে তাকাল রানা। এক সেট ফিগার 003.109.001-এ স্থির হয়ে আছে। ওটা টার্গেট পজিশন হবে, আর ওটার নিচে আরেক সেট নম্বর সচল রয়েছে, তারপর অকস্মাৎ ওই একই কোঅর্ডিনেটে ওটাও স্থির হয়ে গেল– 003.109.001। নম্বর মিলে গেছে, আ ম্যাচ। রানা এখন জানে টার্গেটটা কোথায়।

টার্গেটের ওপর বসে আছে ওরা।

বহু দূরে, বাম দিকের উঁচু আকাশে, দিক বদলে ঘুরে গেছে রকেটগুলো, নেমে আসছে নিচে, নিখুঁত তাক করা তীরের মত, সরাসরি ওদের দিকে আসছে। মরিয়া হয়ে উঠল রানা, ভাবছে আত্মরক্ষার কি উপায় করা যায়, অনুভব করল চুলের কিনারা থেকে ঘামের ধারা নেমে আসছে। মেয়েটার উদ্দেশে চিৎকার করল ও, 'লাল একটা চৌকো বোতাম দরকার আমার। সম্ভবত জ্বলছে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'ওই তো, আপনার ডান দিকে...আপনার ডান দিকে...।'

মেয়েটার কথা শেষ হয়নি, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল রানা। বোতামটা দেখতে পেল, ওপরে লেখা রয়েছে কশন ইজেক্ট, কিন্তু নাগালের বাইরে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে, বাঁধনগুলোকে অগ্রাহ্য করে, শরীরটাকে সামনে ঠেলে দিল রানা; বোতামটার ওপর মাথা ঠুকতে চাইছে। অনুভব করল, ওর কপালের ডান দিকটা বোতাম স্পর্শ করতে পেরেছে। পরমুহূর্তে জগৎটা আবার বদলে গেল।

যেন তীব্র ব্যথায় আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল রোটর, হেলিকপ্টার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। লম্বা ককপিটের নিচে থেকে দুম করে বিকট আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে গোটা ককপিট নিক্ষিপ্ত হলো শূন্যে–এক খণ্ড কেবিন ক্যাপসুল, সবেগে ছুটে গেল প্রায় দু'শো ফুট, তারপর খুলে গেল প্যারাশুট।

ওপরে ওঠার শেষ পর্যায়ে স্থির হয়ে গেল ক্যাপসুল, শূন্যে ভেসে থাকল স্থির ভাবে; আর নিচে হেলিকপ্টারের ফ্রেমে মিসাইল দুটো আঘাত করায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল, বিশাল একটা অগ্নিকুণ্ড এক সেকেণ্ডের জন্যে গ্রাস করে ফেলল ক্যাপসুলটাকে।

রানার পিছনে মেয়েটা আর্তনাদ করছে, রানা জানে ওর নিজের মুখও খোলা, তবে জানে না খোলা মুখ থেকে নিঃশব্দ চিৎকার বেরুচ্ছে কিনা, নাকি ও-ও প্রচণ্ড আতঙ্কে আর্তনাদ করছে।

নিচে নামছে ক্যাপসুল, মাটিতে নেমে এল হাড়ভাঙা ঝাঁকি দিয়ে। বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল রানার, ইজেক্টর রকেটের ধাক্কা আর মাটিতে পতনের

বাকি বাঁধনগুলোকে ঢিলে করে দিয়েছে। টানা-হ্যাঁচড়া করে প্রথমে মুক্ত করল বাহু জোড়া, তারপর হাত দুটো, সবশেষে পা জোড়া।

বুদ্ধুদের ঢাকনি সরিয়ে পিছনের কমপার্টমেন্টে চলে এল রানা। মেয়েটা এখানে জড় পদার্থের মত বসে আছে। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত, সীটের আর্মরেস্ট খামচে ধরা আঙুলের গিটগুলো সাদা। স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা সে, স্ট্র্যাপের বাকলগুলো তার পিঠে। হাত দুটো সীটের সঙ্গে আটকানো।

দ্রুত হাতে তার বাঁধনগুলো খুলে দিল রানা। 'আসুন। আপনাকে নামতে সাহায্য করি।'

ওর একটা হাত শক্ত করে ধরল মেয়েটা, তাকে নিয়ে নরম মাটিতে নেমে এল রানা। মাটিতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করল মেয়েটা, রানার হাঁটুর নিচে লাথি মেরে ওর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করল।

'স্টপ!' চিৎকার করছে রানা। 'কি ব্যাপার? কি হলো?'

'না! যেতে দিন আমাকে, ছাড়ুন। হাত সরান!' লম্বা নখ দিয়ে রানাকে খামচি মারল মেয়েটা।

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। শান্ত হোন···।'

ওরা ধস্তাধস্তি করছে, এই সময় মাথার ওপর থেকে একজোড়া হেলিকপ্টারের সাদা স্পটলাইট প্রায় অন্ধ করে দিল ওদেরকে। কাছাকাছি থেকে ভেসে এল সাইরেনের আওয়াজ। একটা হেলিকপ্টারের লাউড হেইলার ইউনিট থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রুশ ভাষায় ওদেরকে বলা হলো, 'যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। যদি নড়েন, গুলি করে ফেলে দেয়া হবে।'

মেয়েটাকে রানা বলল, 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি ভান করি আমরাও একজোড়া স্ট্যাচু।' মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখল ও।

চার

সেন্ট পিটার্সবার্গের জন্যে আলাদা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার আছে, এককালের রেড আর্মি স্টুডেন্ট স্ট্রীটের কাছাকাছি। উঁচু পাঁচিল দেয়া ঘেরা জায়গাটা, পাঁচিলের ভেতর আর্মিরা বিভিন্ন ধরনের ভেহিকেল রাখে, এপিসি থেকে শুরু করে মাথা খোলা বিটিইউ-ওয়ানহানড্রেড ফিফটি টু/ইউ কমাণ্ড ভেহিকেল, ট্যাংক, সবই আছে। হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংটা লাল ইঁট দিয়ে গাঁথা, সেন্ট পিটার্সবার্গে অনেকগুলো সুন্দর ভবন থাকায় তুলনায় ওটাকে নগ্ন ও অসুন্দর দেখায়।

রানা আর লিয়াকে সরাসরি ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যাওয়া হলো, বাইরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়া হলো মেটাল ডোর, তালা লাগানোর আওয়াজ শোনা গেল। সিলিং থেকে শেডবিহীন একটা বালব জ্বলছে, ফার্নিচার বলতে

একটা মেটাল টেবিল ও তিনটে মেটাল চেয়ার।

টেবিল আর দুটো চেয়ার মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো। তৃতীয় চেয়ারটা সম্প্রতি আনা হয়েছে, মেঝের সঙ্গে গাঁথা নয়।

যান্ত্রিক ছারপোকা খোঁজার কোন মানে হয় না, ইলেকট্রনিক সুইপার ছাড়া ওগুলো কোথায় আছে বলা সম্ভব নয়। তবে কথা বলার ঝুঁকি নিতেই হবে রানাকে, কারণ মেয়েটাকে সুস্থ-স্বাভাবিক করে তোলার আর কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'চোখে রাজ্যের ভয়।

তার দিকে পা বাড়িয়ে শান্ত সুরে রানা বলল, 'হাতে কিন্তু সময় খুব কম।'

দেয়াল ঘেঁষে সরে যেতে শুরু করল লিয়া, রানার নাগালের বাইরে থাকতে চাইছে। 'দূরে থাকুন। কাছে আসবেন না। তা না হলে আমি কিন্তু নখ দিয়ে চোখ তুলে আনব। সাবধান, কাছে আসবেন না।'

সাঁৎ করে এগিয়ে এসে লিয়ার কব্জিটা ধরে ফেলল রানা, টেনে নিজের কাছে নিয়ে এল। 'কি বলি শুনুন,' ফিসফিস করছে ও, সুরটা নরম নয়, ঠাণ্ডা ও জরুরী। 'বাংলাদেশের নাম শুনেছেন? আমি বাংলাদেশ সরকারের কাজ করি। এ যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে আরও বলি-ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গেও আমার সুসম্পর্ক আছে। কাজেই, ঝুঁকি নিয়ে সব কথা আমাকে আপনি বলতে পারেন, বিনিময়ে বাঁচার একটা পথ পেয়ে যেতে পারেন। আর বিকল্প হলো, নিজের দেশের লোকজনকে বিশ্বাস করতে পারেন- যারা সেভারনায়ার সব লোককে খুন করেছে।'

'সেভারনায়া কোথায়? আমি জীবনে কখনও সেভারনায়ায় যাইনি।'

'আপনার হাতঘড়িটা গেছে।' লিয়ার কব্জিটা মোচড়াল রানা, ডায়ালে চোখ রাখল। 'সন্ধ্যা সাতটা পনেরো, তেইশ সেকেণ্ড। ঠিক যে সময় এলাকার সমস্ত ইলেকট্রনিক্স মিরাকল বিস্ফোরণের কারণে থেমে গিয়েছিল।'

'মিরাকল...?' শুরু করল লিয়া।

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, বিধ্বস্ত স্যাটেলাইট ডিশ বেয়ে আপনিই উঠে এসেছিলেন। কি, ঠিক বলিনি?'

মনে হলো যেন এক যুগ পার করে দিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লিয়া।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়া। হ্যাঁ, আমি একজন লেভেল টু প্রোগ্রামার। ওখানে কি ঘটেছে সব আমি জানি।'

'লিয়া...নামটা তোমার ভারি সুন্দর,' রানার কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'ভেতরের কারও সাহায্য ছাড়া এ কাজ হয়নি। কে সে, তুমি জানো?'

'জানি। ভিক্টর। ভিক্টর কিরগিজ।'

'রাশিয়ান ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স, মানে পুরানো কেজিবি, নাকি মিলিটারি?'

'একজন প্রতিভাবান কমপিউটর প্রোগ্রামার, তবে পুরানো কেজিবির লোক হলেও হতে পারে। তার হাবভাবে পাগলামি আছে, তবে খুবই বিরল প্রতিভা।'

'আর কেউ ছিল?'

'ভেতরের লোক? না।'

'স্যাটেলাইট সম্পর্কে বলো। আরও আছে নাকি?'

'এক মিনিট। এবার আমার প্রশ্ন করার পালা।' ভাব দেখে মনে হলো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে লিয়া। 'কে তুমি? মানে, আসলে কে?'

'রানা...,' শুরু করল রানা, তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ শুনে থেমে গেল।

সবেগে খুলে গেল মেটাল ডোর, একজন সশস্ত্র গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে সেলের ভেতর ঢুকলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভ্যালেন্টিন উটারভিচ।

গাঢ় রঙের সুটের ওপর লম্বা কালো কোট পরেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাঁর ডান হাতে রানার পিস্তলটা দেখা গেল, হাসিটা মুখ ব্যাদান করা একটা বাঘের। 'গুড মর্নিং, মি. রানা।' হাতের পিস্তলটা পতাকার মত নাড়ছেন, ওটা যেন একটা শিশুর খেলনা। 'বসুন, আপনারা দু'জনেই।'

কালবিলম্ব না করে তৃতীয় চেয়ারটা ধরল রানা, যেটা মেঝের সঙ্গে গাঁথা নয়; উটারভিচ বসলেন উল্টোদিকের চেয়ারটায়।

'আমাকে যদি চিনে না থাকেন, আমি ভ্যালেন্টিন উটারভিচ, মিনিস্টার অভ ডিফেন্স।' কথা বলার সময় দম নেয়ার জন্যেও থামছেন না, নিজের সামনে মেটাল টেবিলের ওপর পিস্তলটা রাখলেন। 'তো, প্রশ্ন হলো, মি. রানা, কিভাবে আপনার প্রাণ সংহার করা যায়? প্রচলিত পদ্ধতি হলো, মাথার পিছনে একটা বুলেট। এভাবে দ্রুত মৃত্যু ঘটে, ব্যথাবিহীন, সরাসরি। বুঝতেই পারছেন, আপনাকে মেরে ফেলাটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে সহজ, তাহলে আমরা দাবি করতে পারব যে আপনার সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না।'

একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু করল রানা। 'আলাপ, খোশগল্প, এ-সব বাদ, মিনিস্টার? তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার মত কোন ইন্টারোগেশনও নয়? আজকাল আর এ-সবের পিছনে কেউ সময় নষ্ট করতে চায় না। ইন্টারোগেশন বাতিল একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে, কি বলেন?'

'নষ্ট করার মত সময় নেই, মি. রানা। আমার শুধু একটা প্রশ্ন। মিরাকল কোথায়?'

'আমি ধরে নিয়েছি ওটা আপনার কাছে, মিনিস্টার।'

'না। আমার হাতে ব্রিটিশদের ভাড়া করা শুধু একজন বাংলাদেশী স্পাই, সেভারনায়ার একজন প্রোগ্রামার, এবং ওদের চুরি করা একটা হেলিকপ্টার...।'

'আপনাদের সরকারের একজন বেঈমান আছে, সে যেভাবে চাইছে গোটা ব্যাপারটাকে আপনি সেভাবে দেখছেন।'

টেবিলে ঘুসি মারলেন উটারভিচ। 'আপনারা যে সেভারনায়ায় হামলা চালালেন, তার পিছনে কে ছিল? অর্ডারটা কে দেয়?'

'আপনিই বলুন, অ্যাকসেস কোড কার কাছে ছিল?'

'টেরোরিজমের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি আপনাদের দু'জনকে টেরোরিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত করছি।'

'আজকাল বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি, মিনিস্টার? কব্জিতে প্রশংসাসূচক

চাপড় দিয়ে বিলাসবহুল ডাচায় গৃহবন্দী করে রাখা? একানব্বুই সালের ক্যু যারা লেজেগোবরে করে ফেলে, তাদের মত?'

'ওদের কিছু লোক মারা যায়।'

'সাজানো আত্মহত্যা। আপনার কাছাকাছি আরেকজন বেঈমানকে দেখা যাচ্ছে, মিনিস্টার।'

হঠাৎ কথা বলে উঠল লিয়া, জোর গলায়। 'থামুন। দু'জনেই আপনারা থামুন। খেলনা নিয়ে বাচ্চারা যেমন ঝগড়া করে, আপনারা ঠিক তাই করছেন।'

লিয়ার দিকে তাকাল রানা, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। 'তুমি জানো না, প্রিয়তমা? বেশিরভাগ খেলনা নিয়ে যে মারা যায়, সেই জেতে।'

'বন্ধ করুন এ-সব। সত্যি কথাটা আমি যেমন জানি, তেমনি আপনিও জানেন,' লিয়া কথা বলছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। 'বেঈমানী করেছেন কুরুনভ। জেনারেল কুরুনভ আর সেই মেয়েলোকটা–সাপের মত মেয়েলোকটা। ওরা দু'জন সবাইকে খুন করে ওখানে, তারপর মিরাকল চুরি করে।'

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে হেসে উঠলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'হাহ্, কেন তিনি কাজটা করতে যাবেন?'

'কারণ স্যাটেলাইট আরও একটা আছে। সেভারনায়াকে ধ্বংস করার কাজে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে, হুবহু সেরকম আর একটা।'

যেন কেউ বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল হাসিটা, উটারভিচ হুংকার ছাড়লেন, 'কথাটা কি সত্যি?'

'সম্পূর্ণ সত্যি। দ্বিতীয়টার কোড নেম বিনিয়া, এবং ওদিকে কোথাও দ্বিতীয় একটা কণ্ট্রোল কমপ্লেক্সও আছে···।'

দরজার কাছ থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে এল, ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল সবাই। মনে হলো কামানের গোলার মত ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল কুরুনভ, ঢুকেই নিজের পিছনে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। এলোমেলো দেখাচ্ছে তাঁকে, দাড়ি কামাননি, ক্লান্ত; সম্ভবত ইউনিফর্ম পরেই ঘুমিয়েছিলেন। কেউ মাইল কয়েক দৌড়ে এলে যেমন হয়, মুখ বেয়ে ঘামের কয়েকটা ধারা নেমে আসছে। 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী···আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই···' কথা শেষ করতে পারছেন না, হাঁপাচ্ছেন।

'জেনারেল কুরুনভ···।'

'এটা আমার ইনভেস্টিগেশন। আপনি নিয়ম লঙ্ঘন করছেন!'

'এইমাত্র যা শুনলাম, জেনারেল, নিয়ম লঙ্ঘন করছেন আপনি!'

সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিল থেকে রানার পিস্তলটা তুলে নিলেন কুরুনভ। 'এ অস্ত্র আগেও যেন কোথায় আমি দেখেছি!'

'ওটা রেখে দিন, জেনারেল।'

'দেখেছি আমাদের শত্রুর হাতে। সে শত্রু কে, আপনি কি তা জানেন, উটারভিচ? সত্যি জানেন?'

উটারভিচ এমন একটা ভঙ্গি করলেন, যেন টোকা দিয়ে একটা পোকা সরাচ্ছেন। 'গার্ড! জেনারেলকে গ্রেফতার করা হলো। এসকর্ট করে নিয়ে যাও তাঁকে...।'

গার্ড বাইশ-তেইশ বছরের এক সৈনিক, এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে হোলস্টার থেকে মেশিন পিস্তল বের করতে গেল। তার আগেই ঘুরে গেলেন কুরুনভ, গুলি করলেন তাকে। ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়ল গার্ড, গ্লেজার রাউণ্ড তার বুকটা চুরমার করে দিয়েছে।

লিয়াকে খপ করে ধরে টান দিল রানা, পাথুরে মেঝেতে শুইয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে, ইতিমধ্যে ঘুরে গিয়ে আবার গুলি করেছেন কুরুনভ, উটারভিচের মাথা আক্ষরিক অর্থেই উড়িয়ে দিয়েছেন।

'এ এমন এক অ্যামুনিশন, কাউকে বন্দী করে না, করে কি? উফ, ভীতিকর পরিস্থিতি আর বলে কাকে। ডিফেন্স মিনিস্টার ভ্যালেন্টিন উটারভিচ কিনা কাপুরুষ একজন বাংলাদেশী এজেন্টের হাতে নিহত হলেন। নাকি বলা উচিত ভাড়া করা ব্রিটিশ এজেন্টের হাতে?' পিস্তলের প্লাইড টানলেন জেনারেল কুরুনভ, বাঁট থেকে ম্যাগাজিন সরালেন, অ্যামুনিশন পকেটে ভরে অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিলেন রানার দিকে। নিজের একটা হাত সঙ্গে সঙ্গে কোমরের হোলস্টার স্পর্শ করল।

'...তারপর কি হলো? পালাতে গিয়ে কাপুরুষ মাসুদ রানা গুলি খেলেন।' পিস্তলটা রানার দিকে তাক করলেন তিনি, চিৎকার করছেন, 'গার্ডস...গার্ডস...জলদি!'

বাতাস থেকে পিস্তলটা রানার হাতে চলে এল, তবে তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে ওর শরীরে। তৃতীয় চেয়ারটা তুলেই ছুঁড়ে দিল কুরুনভের দিকে, সেটা বুক দিয়ে ঠেকালেন জেনারেল, কাত হয়ে আছাড় খেলেন পিছন দিকে, ট্রিগারে টান পড়ায় একটা বুলেট ছুটল। সেলের দেয়ালে লেগে আরেক দিকে ছুটে গেল সেটা। এ-সব যখন ঘটছে, কুরুনভের নাগাল পেয়ে গেল রানা। পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর চোয়ালে লাথি মারল ও। টু-শব্দটিও না করে জ্ঞান হারালেন জেনারেল।

লিয়াকে টেনে আনল রানা, অপর হাতে টানল তৃতীয় চেয়ারটা–দরজার পাশের দেয়ালে গা ঢাকা দিল। ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ভারি দরজাটা খুলে গেল, হাতে মেশিন পিস্তল নিয়ে ভেতরে ঢুকল দু'জন গার্ড। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা, মেঝেতে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

বিস্ময়ের ধাক্কা তখনও কাটিয়ে ওঠেনি লোক দু'জন, লাফ দিয়ে সামনে পড়ল রানা, ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে ডানে ও বামে চালাল হাতের চেয়ারটা, থেঁতলে দিল জোড়া মুখ। খপ করে লিয়ার হাত ধরে ছুটল ও, দরজা টপকে বেরিয়ে এল প্যাসেজে। তার আগে অবশ্য ঝুঁকে তুলে নিয়েছে একটা মেশিন পিস্তল–একজন গার্ডের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, এই মুহূর্তে সে রক্তাক্ত ও অচেতন।

প্যাসেজটা লম্বা, দু'পাশে সারি সারি সেলের দরজা। করিডরের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি, ওপর দিকে উঠে গেছে। সেদিকে এগোল রানা, জানে ওপরে ওঠার

সিঁড়ি যখন আছে তখন নিচে নামারও সিঁড়ি থাকতে বাধ্য। কিন্তু ওর জানাটা ভুল। ধুস শালা, বিড়বিড় করল ও। কোন বিল্ডিঙের ভেতর পালাবার দরকার হলে মানুষ সাধারণত সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠে যায়, কিন্তু এই সাইকোলজিক্যাল আচরণের উল্টোটা করতে চেয়েছিল ও, চেয়েছিল সিঁড়ি পেলে নিচে নামবে।

সিঁড়িটা ছোট, মাথায় শুরু হয়েছে আরেকটা লম্বা করিডর, শেষ প্রান্তে খোলা একটা প্ল্যান অফিস। অফিসের সামনে তিনজন সৈনিক, সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে। পিছন দিকে তাকাতেই জেনারেল কুরুনভকে দেখতে পেল রানা, হুংকার ছাড়ছেন, হাঁসফাঁস করছেন; হাতে পিস্তল। তাঁর সঙ্গে তিনজন লোক রয়েছে, অনুসরণ করছেন রানা ও লিয়াকে।

কুরুনভের দিকে সংক্ষিপ্ত এক পশলা গুলি করল রানা, তারপর প্ল্যান অফিসের দিকে দীর্ঘ এক পশলা। একজন লোককে ধরাশায়ী হতে দেখল ও, অপর একজন হাঁটু গাড়ল মেঝেতে, যেন আহত হয়েছে। তৃতীয় লোকটা অফিসের ভেতর ঢুকে জান বাঁচাল।

বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই, কাজেই লিয়াকে সংকেত দিল রানা। সংকেতটা বুঝতে পেরে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল লিয়া। দেয়ালে পিঠ ঘষে সামনের দিকে এগোচ্ছে রানা, দেখাদেখি লিয়াও। তিন পা এগোবার পর ওদের বাম দিকে একটা খিলান পড়ল, ভেতরটা অন্ধকার, তবে বোঝা গেল আরও একটা লম্বা ও সরু করিডর চলে গেছে।

লিয়াকে কাছে টেনে রানা জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'থাকব, যদি বাঁচি,' মনটা শক্ত করে জবাব দিল লিয়া।

'এখন তুমি ছুটবে। কিভাবে ছুটবে? ভূতে পাওয়া মানুষের মত। ঠিক আছে? ভয় নেই, কোন ভয় নেই।' কথা শেষ হবার আগেই খিলানের ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা।

অন্ধকার, কাজেই সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ ছোটার পর একটা আলো দেখা গেল। কাছাকাছি এসে ওরা দেখল একটা নোটিশ, তাতে রুশ ভাষায় লেখা রয়েছে– 'অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশাধিকার নেই। ইন্টেলিজেন্স আর্কাইভস, লেনিনগ্রাড এরিয়া'।

ওদের পথ আগলে রেখেছে ভারি ও খাটো একটা লৌহকপাট। 'ছুটবে!' চিৎকার করল ও, নিতম্বের কাছ থেকে গুলি করে ভেঙে ফেলল তালাটা। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম সাইরেন বেজে উঠল।

আর্কাইভ এরিয়ায় ঢুকল ওরা, দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ওরা একটা প্যাসেজে রয়েছে, প্যাসেজটা পৌঁছেছে আলোকিত একটা সেকশনে, চারদিকে পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য কেবিনেট। বোঝা গেল, কোন যত্ন নেয়া হয় না।

হাতে সময় নেই বলে দুঃখ হলো রানার, কেবিনেটের ফাইলগুলো দেখার সুযোগ পেলে বিস্ময়কর অনেক তথ্য জানা যেত।

এন্ট্রান্স হলওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে লিয়াকে ইঙ্গিতে দূরে সরে থাকতে বলল

রানা, তারপর শেষ কেবিনেটের গায়ে চাপ দিল কাঁধ দিয়ে। কাত হয়ে পড়ল ওটা পাশের কেবিনেটের ওপর, এভাবে একটার গায়ে আরেকটা, সবশেষে দেখা গেল পাঁচ-সাতটা কেবিনেট আর পাঁচ-সাতটা শেলফ দরজার গায়ে স্তূপ হয়ে আছে। দ্রুত ছোট প্যাসেজটা পেরিয়ে এল রানা, ওদিকের কেবিনেটগুলোও ফেলে দিল দরজার গায়ে।

এরপর মেইন আর্কাইভের দিকে মনোযোগ দিল রানা। তিনটে বিশাল বৃত্তাকার গ্যালারির সবচেয়ে ওপরেরটায় চলে এল ওরা, সরাসরি মাথার ওপর কাঁচের গম্বুজ। এখানে সব জিনিসই বেশ গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ডান দিকে একটা জানালা, দু'পাশে টেকসই বুকশেলফ–ওগুলো গ্যালারিটাকে বেষ্টন করে আছে। পিছন থেকে শব্দ ভেসে আসছে, বন্ধ দরজার বাধা টপকে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছেন জেনারেল কুরুনভ।

জানালার কাছাকাছি এসে বাইরে তাকিয়ে সামরিক যানবাহন দেখতে পেল রানা। অনেক নিচে। গলা লম্বা করে সরাসরি নিচে কি আছে দেখার চেষ্টা করল, বুঝতে চাইছে মনে যে প্ল্যানটা আছে তা বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব কিনা।

হঠাৎ খেয়াল করল, দরজা থেকে আর কোন আওয়াজ আসছে না। আরও সতর্ক হয়ে উঠল ও। দ্রুত পায়ে এগিয়ে কাঠের ব্যালকনি রেইলের কাছে চলে এল, উঁকি দিতেই দেখতে পেল ওদের। নিচের গ্যালারিতে ঢুকছেন জেনারেল কুরুনভ, সঙ্গীদের নিয়ে।

লিয়াকে সংকেত দিল রানা, নিঃশব্দে পিছু হটে খোলা জানালার দিকে যেতে হবে তাকে। তারপর আবার নিচে তাকাল ও, লক্ষ করল গ্যালারিগুলোর মেঝে কয়েক স্তর মোটা স্বচ্ছ কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি–সম্ভবত শক্ত কাচ দিয়ে। রানার তলপেট মোচড় দিয়ে উঠল। কুরুনভ আর তার সঙ্গীরা মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে কোথায় রয়েছে ওরা।

যেন রানার ধারণা সত্যি প্রমাণিত করার জন্যেই চিৎকার করে উঠলেন কুরুনভ, একটা হাত ওপর দিকে তাক করা। কাঁচের মত মেঝেতে লেগে পথ করে নিচ্ছে বুলেট, ছিঁড়ে ও ফেড়ে ফেলছে স্বচ্ছ জিনিসটা।

'ছোটো!' চিৎকার করল রানা। 'আমার পিছু নাও!' গোটা আপার গ্যালারি ধরে ছুটোছুটি শুরু করল ওরা, বিরতিহীন চক্কর দিতে শুরু করেছে। কোন তাক বা প্যাসেজ পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে রানা, লুকাবার একটা জায়গা দরকার।

ওরা ছুটছে, ওদের পিছনে বুলেট লেগে ফুটো হয়ে যাচ্ছে মেঝে, ফুটোগুলো ওদেরকে অনুসরণ করছে। ফলে ঘুরে পিছন দিকে ছোটার কোন উপায় নেই, পিছনের স্বচ্ছ মেঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

হোঁচট খেলো লিয়া, পড়ে যাচ্ছে। গুলি লাগেনি, তবে তার পিছনের মেঝে ছিন্নভিন্ন, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পায়ের নিচে গর্ত, আর্তনাদ করে উঠল সে, হাত দুটো মেলে দিল শূন্যে, অমসৃণ গর্তের ভেতর ঢুকে গেল শরীরটা, সরাসরি খসে পড়ছে নিচে দাঁড়ানো সৈনিকদের হাতে।

ভাগ্যকে অভিশাপ দিল রানা, মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করল নিচে খসে পড়ে

মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে কিনা।

রানা থামেনি, কারণ জানে থামলে মাথার নির্দেশ ফেলে হৃদয়ের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। বুলেটগুলো ওর পিছনের মেঝে এখনও ফাঁক করে চলেছে। একটু পরই শূন্যে পা ফেলতে হবে ওকে, কারণ ইতিমধ্যে বৃত্তাকার গ্যালারির প্রায় সবটুকু ঘুরে এসেছে ও।

চার কদম সামনে একটা মেটাল সেফ দেখতে পেল রানা, দু'সারি শেলফের মাঝখানে। চেষ্টা করলে ওপরে চড়া যায়। একবার ওই সেফের মাথায় উঠতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। বিস্ফোরক দিয়ে সেফটা উড়িয়ে না দিলে প্রতিপক্ষ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিস্ফোরক ব্যবহার করলে গোটা বিল্ডিং তছনছ হয়ে যাবে।

দূরত্বটা আন্দাজ করে নিয়ে লাফ দিল রানা। হাই জাম্প দিয়ে একটা স্তূপের মত নেমে এল সেফের মাথায়, একই সঙ্গে সদ্য ত্যাগ করা মেঝে ঝাঁঝরা হয়ে গেল এক পশলা গুলিতে। গ্যালারির অবশিষ্ট মেঝেও এখন আর অক্ষত থাকছে না।

রানা খেয়াল করল, বৃত্তাকার জানালাটার সরাসরি উল্টো দিকে রয়েছে ও, যে জানালা দিয়ে বাইরের ভেহিকেল পার্ক দেখা যায়। বড় করে শ্বাস টানল ও, সুলতানা পারভিনের দেয়া বেল্টটা কোমর থেকে খুলল। আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচ খুঁজে নিল, ঠেলে সরিয়ে দিল অফ সেটিং-এ, তারপর বেল্টটা ডান কব্জিতে পেঁচাল।

হাত তুলল রানা, লক্ষ্যস্থির করল গম্বুজের শেষ প্রান্তের কিনারায়, দেখে যেটাকে নিরেট পাথর বলে মনে হচ্ছে। আবার বড় করে শ্বাস টেনে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর চাপ দিল বাক্‌লে লাগানো ফায়ারিং মেকানিজমে।

কব্জিতে ঝাঁকি খেলো বেল্ট, ছুটে যাচ্ছে পিটন, পিছনে সাপের মত হাই টেনসিল কর্ড। এক নিমেষে পৌঁছে গেলেও, রানার মনে হলো ঘটনাটা ঘটছে স্লো মোশনে। দম বন্ধ করে আছে, প্রার্থনা করছে খুদে পিটন যেন আটকায়।

গম্বুজের গোড়ায় ঠক করে আওয়াজ তুলে আটকাল ওটা, বেল্ট ধরে টান দিয়ে পরীক্ষা করতে বোঝা গেল পাথরের ভেতর ভালভাবেই গেঁথেছে।

ঢিলটুকু টেনে নিয়ে সেফের মাথা থেকে লাফ দিল রানা, চওড়া বৃত্ত তৈরি করার ভঙ্গিতে গ্যালারির ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শরীর, সরাসরি বৃত্তাকার জানালার দিকে।

বেল্ট আর বাহুতে টান অনুভব করছে রানা, কানের দু'পাশে শো শো আওয়াজ করছে বাতাস। চোখ নামিয়ে তাকাতে অন্যান্য গ্যালারির নিচের অংশ দেখতে পেল ও, ভয়ে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের পশম।

পা দুটো সামনে, জানালার ঠিক মাঝখানে পড়ল রানা। এক মুহূর্ত আগে বেল্ট ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে মুখ ঢাকল ও। সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেল জানালার কাঁচ, সদ্য তৈরি ফাঁক দিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল ও, পতন ঘটছে চল্লিশ ফুট নিচে।

খসে পড়ছে রানা, জীবনের মধুর অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করছে। মনের পর্দায় সর্বশেষ দেখা সুন্দর একটা মুখ এক নিমেষের জন্যে ভেসে উঠল। লিয়া। ইতোভস্কি দ্রোভনা লিয়া। বিষণ্ন বোধ করল ও, মনে হলো বিরল একটা সৌন্দর্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। নিজেকে হঠাৎ তাৎপর্যহীন ও নগণ্য লাগল, রোদের ভেতর যেন ধূলিকণার মত ভেসে রয়েছে।

পাঁচ

জীবনে সম্ভবত এত বড় জুয়া আর খেলেনি রানা। টপ গ্যালারিতে ঢোকার পর জানালা দিয়ে যখন বাইরে তাকায়, সরাসরি নিচে একটা সামরিক ট্রাক দেখেছিল ও, জায়গামত তারপুলিন সহ। সে-সময় আশপাশে কাউকে দেখতে পায়নি, কাজেই মনে একটা প্ল্যান তখনই গজায়। তারপর গ্যালারিতে ধাওয়া শুরু হলো, সে-সময় যদি ট্রাকটা সরানো হয়ে থাকে, সরাসরি মাটিতে পড়তে হবে ওকে–তাতে গুরুতর আহত হবার আশঙ্কা আছে, মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত রানা, সে অর্থে ওকে কনফার্মড গ্যাম্বলারও বলা যেতে পারে। প্রথম বার দেখার সময় ট্রাকের আশপাশে কাউকে দেখেনি, মনে মনে বাজি ধরেছে এখনও ওটা আগের জায়গাতেই আছে। কাঁচ ভেঙে জানালা দিয়ে বাইরে বেরুল, নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝল, ও জিতেছে। সেই আগের জায়গাতেই রয়েছে ট্রাক। এরচেয়ে নরম জায়গায় নামেনি আগে, ব্যাপারটা তা নয়, তবে এবারের নামাটা যথেষ্ট নিরাপদ। মাত্র দু'এক জায়গার চামড়া ছড়ল, বলা যায় প্রায় অনায়াসেই তারপুলিন থেকে নেমে এল গ্রাউণ্ড লেভেলে।

কয়েক পা এগিয়ে পাকা ওয়াকওয়েতে উঠল রানা, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারকে ঘিরে রেখেছে ওটা। ওখানে ওঠার পর ছায়ার ভেতর থাকল, ধীর সতর্ক পায়ে ভেহিকেল পার্কের দিকে এগোচ্ছে।

এক সময়, ও জানে, মেইন গেট খোলা হবে, আর তখনই সুযোগ নিতে হবে পালাবার। অ্যামুনিশন খুব কমই অবশিষ্ট আছে, কাজেই সঠিক ভেহিকেল বাছাইয়ে ভুল করা চলবে না। সারি সারি গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে নরম পায়ে এগোল, খুদে জীপের মত দেখতে স্কাউট কারগুলোকে মনে মনে বাতিল করে দিয়ে। বাতিল করল এপিসি, এবং আরও ছোট BTU-152 U। শেষেরটায় আটজন লোক ধরে, মাথার দিকটা খোলা।

মেইন এন্ট্রান্সের দিক থেকে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল, তাড়াতাড়ি T 55 ট্যাংকের আড়ালে শুয়ে পড়ল রানা। জেনারেল কুরুনভকে দেখা গেল। একজন সৈনিক লিয়াকে একটা গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে পিছনের সীটে তোলা হলো। কুরুনভের কর্কশ গলা ভেসে আসছে, শুনে মনে হলো রেগে বোম হয়ে আছেন তিনি। তাঁর হাতে একটা অস্ত্র।

অচিহ্নিত কালো একটা গাড়িতে তোলা হয়েছে লিয়াকে। টেনে আনার সময় গলা ফাটাচ্ছিল সে। ইতিমধ্যে তার বিশ্বাস জন্মেছে যে রানা মিথ্যে কথা বলেনি। জানালা ভেঙে বাইরে চলে এসেছে ও, জানে সে। কাজেই আশা করছে তার নতুন বন্ধু হয়তো এরইমধ্যে তাকে উদ্ধারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চেঁচামেচি করার সেটাই কারণ, রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু গাড়িতে তোলার পরও যখন কিছু ঘটেনি, সন্দেহ নেই হতাশায় মুষড়ে পড়েছে সে।

ভেহিকেল পার্কে সিধে হলো রানা, T 55 ট্যাংকের পিছনটা দেখছে। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করার পর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

পাশে বসা জেনারেলের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, দম বন্ধ করে বমি আটকাচ্ছে লিয়া। সোলজার গাড়ি চালাচ্ছে, যাচ্ছে মেইন গেটের দিকে, ওদিকে লাল আর সাদা রঙ করা কয়েকটা পোল দেখা যাচ্ছে।

গেটে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড থামল গাড়ি। গার্ডদের নিজের পরিচয় দিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে হুংকার ছাড়লেন কুরুনভ। বুলেটের বেগে গেট থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি, রাবার পুড়ছে, বাঁক নিল বাম দিকে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি, ভেহিকেল পার্ক-এর পাঁচিল ঘেঁষে ছুটছে তারা।

ঘটনাটা যখন ঘটল, বড় ধরনের একটা ঝাঁকি খেলেন কুরুনভ। প্রবল হতাশায় চিৎকার করে উঠলেন। তাদের বাম দিকের পাঁচিল বিস্ফোরিত হলো, আবর্জনার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল শক্তিশালী T 55-এর নাক, পৌঁছে গেল কার-এর পিছনের রাস্তায়। শুরু হলো অনুসরণ।

কোন প্রয়োজন নেই, তবু ড্রাইভারকে গাল দিচ্ছেন জেনারেল কুরুনভ, গতি আরও বাড়াতে বলছেন। তাঁর কথায় ক্ষীণ হলেও আতঙ্কের সুর। তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই ভয়ের উৎস আফগানিস্তানের একটা ঘটনা। ওখানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তিনি। একদিনের ঘটনা, একটা ট্যাংকের ভেতর ছিলেন কুরুনভ, তাদেরকে ধাওয়া করছিল T 55-এর মত একটা ট্যাংক। কুরুনভের ট্যাংকে সরাসরি গোলা লাগে, তিনি একাই শুধু জীবিত বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আজও দুঃস্বপ্নের ভেতর ক্রুদের চিৎকার শুনতে পান তিনি। ধাতব কফিনের ভেতর বিস্ফোরিত হয়েছিল আগুন। সেই থেকে ট্যাংক দেখলেই তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

T 55-এর ড্রাইভিং সীটে বসে সুইচ অন করল রানা, তারপর স্টার্টার নিয়ন্ত্রক ছোট্ট নবটা ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল এঞ্জিন। ভাল করে তাকাতে ফুয়েল গজ চোখে পড়ল, পুরো ভরা। ট্যাংক চালানোর অভিজ্ঞতা আছে ওর, তবে যেগুলো চালিয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এটার অনেক পার্থক্য। কোনটা কি কাজে লাগে পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক ভুলভাল করল। গিয়ার আর কন্ট্রোল কলাম নিয়ন্ত্রণ করে একটা মেটাল লিভার, সেটা পরখ করতে গিয়ে দেখল ট্যাংক ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে, একপাশের ট্র্যাকের গতি কমে যাচ্ছে অথচ অপরদিকের গতি বেড়ে যাচ্ছে, ফলে ডানে-বাঁয়ে হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গি করছে ট্যাংক,

অপ্রত্যাশিতভাবে দিক বদলাবার হুমকি দিচ্ছে। ব্রেক আর অ্যাকসেলারেটার খুঁজে পাওয়া কঠিন হলো না, তবে খেয়াল করল সাধারণ একটা কার-এ যেভাবে থাকে তার ঠিক উল্টাভাবে বসানো হয়েছে এখানে–ডান পায়ের জন্যে ব্রেক পেডাল রয়েছে লম্বা একটা সাপোর্টিং শ্যাফট বা স্টক-এ, আর অ্যাকসেলারেটার রয়েছে বাম দিকে। ব্যবহার করা তো দূরের কথা, সময়ের অভাবে থরে থরে সাজানো ইলেকট্রনিক্স পরীক্ষা করাও হলো না, তবে জানে ট্যাংকও চালাবে আবার হানড্রেড এমএম কামানও দাগবে, তা সম্ভব নয়। ওটা টারিট থেকে প্রায় উনত্রিশ ফুট লম্বা হয়ে আছে। নাগালের মধ্যে, ড্রাইভারের সীটের পাশে, একটা মেশিন গানও রয়েছে। কারে লিয়া আছে, কাজেই ওটা ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না। রানা মনোযোগ দিল সরাসরি ধাওয়ায়। ভাগ্য ভাল হলে, আর ট্যাংকটা যদি ঠিকমত চালাতে পারে, কুরুনভকে ধরা সম্ভব।

সামনের ফাটল দিয়ে ভাল দেখা যায় না, তবে এই মুহূর্তে রানা তেমন গুরুত্ব দিল না। নাগালের মধ্যে কোথাও সম্ভবত একটা পেরিস্কোপ আছে পিছন দিকটা দেখার জন্যে। আপাতত ট্যাংকটা চালানো শিখছে ও। সিনেমায় যখন ট্যাংক যুদ্ধ হয়, দেখে মনে হবে ওগুলো চালানো কি আর এমন কঠিন। কিন্তু রানা বোঝে কিভাবে কি করতে হয় জানা না থাকলে তোমাকে আর ট্যাংক চালাতে হবে না, ট্যাংকই তোমাকে চালাবে।

আওয়াজের ব্যাপারটাও তেমন গুরুত্ব দেয়নি রানা। ট্যাংকের ভেতর হাড় কাঁপানো ভাইব্রেশন শুরু হলো, উৎস ট্র্যাকগুলো। শব্দটা বদ্ধ জায়গায় শতগুণ বেড়ে গেল। রাস্তায় উঠে আসার পর প্রথমেই মাথায় ড্রাইভারের হেডফোন আটকাল ও, তারপর রেডিওর সার্চ বাটনে চাপ দিল, আশা পুলিস ব্যাণ্ড ধরতে পারবে। রুশ ভাষাটা ভালই শেখা আছে ওর, রোড ব্লক সম্পর্কে আলাপ শুনলে বুঝতে পারবে।

প্রচণ্ড আওয়াজ, সেই সঙ্গে ভাইব্রেশন, তার ওপর সীমিত দৃষ্টিসীমা; গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত আরেকটা বিপত্তি দেখা দিল–এত থাকতে আজই রাস্তায় ট্রাফিকের সংখ্যা অত্যধিক বেশি, যেন ষড়যন্ত্র করে বেরিয়ে এসেছে। দু'বার একজোড়া কার-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেল ট্যাংক। দুর্ঘটনা ঘটল না ভাগ্যগুণে। কুরুনভের কার ডান দিকে বাঁক নিল, অনুসরণ করছে রানা। বাঁকের কাছে এসে ঘুরে যাচ্ছে ট্যাংক, হিসেবে ভুল হয়ে যাওয়ায় বাম দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ানো এক সারি গাড়িকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দিল।

বাঁক ঘোরার পর রানা দেখল সামনে ট্রাফিক জাম লেগেছে দেখে পিছু হটছে কুরুনভের কার। দ্রুত পিছিয়ে এসে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল।

ট্যাংকের গতি বাড়াল রানা। এবার ব্রেক আর অ্যাকসেলারেটার ব্যবহার করে নিখুঁত বাঁক ঘুরল ও। অনেক দেরি হয়ে যাবার পর উপলব্ধি করল, গলিটা কার-এর জন্যে যথেষ্ট চওড়া হলেও, ট্যাংকের জন্যে খুব ছোট। কিন্তু ভেতরে একবার ঢুকে পড়ার পর আর কিছু করার নেই। ট্যাংক সিধে করে নিয়ে স্পীড বাড়াতে হলো ওকে।

গলি পেরুনোটা অবিরত ঝাঁকি খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াল। T 55-এর জন্যে ছ'ফুট কম চওড়া গলিটা। ট্যাংকের আসুরিক শক্তি আর রানার অজ্ঞতা এখানে অবদান রাখল–সবিস্ময়ে লক্ষ করল ও, গলি যেখানে খুব বেশি সরু সেখানে ট্যাংক নিজেই শক্তি প্রয়োগ করছে, ধারাল ছুরি দিয়ে মাখন কাটার ভঙ্গিতে পাঁচিলের প্লাস্টার ও ইঁট কাটছে, দু'পাশের বিল্ডিং থেকে ধুলো আর আবর্জনা উথলে উঠছে, দৈত্যটা পাথর বসানো রাস্তা চওড়া করে নিয়ে ছুটে চলেছে নিজের পথে। অবশেষে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল প্রশস্ত একটা তেমাথায়, সরাসরি সামনে একটা খাল। বাম দিকে বাঁক ঘুরছে রানা, ঝাঁকি খাচ্ছে ট্যাংক, গর্জন করছে এঞ্জিন।

একবার ডানে ছোটে ট্যাংক, একবার বাঁয়ে। বিপজ্জনক এই ভঙ্গি ধরে রেখেই একটা ব্রিজে উঠতে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই রানা উপলব্ধি করল, সামনে ভয়ংকর বিপদ। গলির দু'পাশ ভেঙে পথ করে নিয়েছে দৈত্যটা, কিন্তু সে সময় ট্র্যাক-এর নিচে শক্ত পাথর ছিল। সামনের ব্রিজটা খুবই সুন্দর দেখতে, হয়তো কোন পৌরকর্তা শখ করে বানিয়েছেন, বোধহয় সেজন্যেই ততটা মজবুত নয়। এই ব্রিজ বানানো হয়েছে শুধু সাধারণ ট্রাফিক চলাচলের জন্যে, ট্যাংক চলাচলের জন্যে নয়। ট্যাংকের ভার বহন করার ক্ষমতা ওটার না থাকারই কথা।

ট্যাংক তাক করেছে রানা ভুল দিকে, ফলে খোলটা এখন ব্রিজের প্রবেশমুখ থেকে কয়েক ফুট ডান দিক ঘেঁষে। কন্ট্রোল কলাম যতটা সম্ভব ডান দিকে ঠেলে দিল ও, পা দিয়ে ব্রেক ছুঁলো, তারপর বাঁ পা সজোরে নামিয়ে আনল অ্যাকসেলারেটারে।

নিজের অ্যাকসিস-এ ভর করে ঘুরে গেল ট্যাংক, নিখুঁত ১৮০ ডিগ্রী টার্ন নিচ্ছে। ঘোরাটা যখন শেষ পর্যায়ে, রানা দেখল মিলিটারিরা ওর পিছু নিয়েছে। জীপের মত একজোড়া ভেহিকেল, সঙ্গে দুটো BTU-152 U, পিছনে গিজগিজ করছে সশস্ত্র লোকজন।

ছোট জীপ দুটো কিছু করতে পারবে না। ওগুলোর ড্রাইভার ধোঁয়া আর ধুলোয় সামনের কিছু দেখতে পাচ্ছে না, গলি থেকে অন্ধের মত বেরিয়ে এসে সোজা ঝাঁপ দিল খালে। সৈনিকরা সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠার চেষ্টা করছে।

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল বিটিইউ দুটো, পরস্পরের খুব বেশি কাছে রয়েছে, গতি না কমানোয় ভালভাবে বুঝতে পারার আগেই ইতিমধ্যে ঘুরে যাওয়া ট্যাংকের সামনে পড়ে গেল।

একপাশে সরে গিয়ে সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করল রানা, পারা গেল না–একটা বিটিইউ সরাসরি আঘাত করল ট্যাংকের নাকে। অপর বিটিইউ-এর পাশে ঘষা খেলো ট্যাংকের খোল। ঘষা খেয়ে ট্রুপ ক্যারিয়ার উল্টে পড়ল। আর প্রথম বিটিইউ ফুটবলের মত বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, কাত হয়ে পড়ে যাওয়ায় ট্যাংকের সামনে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকল না। ফুল স্পীড দিয়ে ছুটল রানা, শুনতে পেল সিক্স-হুইলার থেকে ছিটকে পড়া সৈনিকরা ভাঙা হাত-পা আর ফাটা মাথা নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে।

'হায় লিয়া,' বিড়বিড় করল রানা, গলা লম্বা করে দেখল ওর সামনে জেনারেল কুরুনভের কার, একই দিকে ছুটছে, তবে খালের অপর পার ধরে।

গাড়ির ভেতর তড়পাচ্ছেন কুরুনভ। 'কি করছ কি! ওটা পুরানো একটা ট্যাংক, জোরে ছুটতে পারে না। ধরো ওটাকে, নাগালের মধ্যে আনো!'

'আমি যথাসাধ্য করছি, স্যার,' জবাব দিল ড্রাইভার।

পিছনের সীট থেকে রিয়ার উইণ্ডোয় তাকাল লিয়া, দেখল সমানগতিতে ছুটছে ট্যাংক, খালের অপর পারে প্রায় সমান্তরাল একটা রেখা ধরে। হাসি পেল তার, ভাবল, কি মজা! জেনারেলের দিকে তাকাল, হাসিটাও গোপন করল না।

লিয়াকে হাসতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন জেনারেল, রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ, লিয়া কোন কথা না বললেও গর্জে উঠলেন, 'চোপ, একদম চোপ!' পরক্ষণে লক্ষ করলেন, ডান দিকে আরও একটা ব্রিজ। 'ওটা পেরোও!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ট্যাংকের সামনে পৌঁছানো চাই। ব্রিজ পেরিয়ে সোজা সামনে ছোটো। উল্টো দিকে ঘুরে যাবার সময় পাবে না ও।'

লিয়ার হাসি দপ করে নিভে গেল। খালের অপর পারে ছ'টা পুলিস ও মিলিটারি কার দেখতে পেয়েছে সে। পিছন থেকে ধাওয়া করছে ট্যাংকটাকে। নিজেদের উপস্থিতি গোপন করছে না, প্রতিটি সাইরেন বাজছে, প্রতিটি হেডলাইট জ্বলছে। মিলিটারি ভেহিকেলগুলো, আর্মারড পারসোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি), অস্ত্রে বোঝাই।

জেনারেলের গাড়িকে ডান দিকে ঘুরে ব্রিজে উঠতে দেখল রানা। গতি বাড়াবার চেষ্টা করে কোন লাভ হলো না, কারণ আগে থেকেই ফুল স্পীডে ছুটছে ট্যাংক। ব্রিজ থেকে কারটা নেমে আসার আগে বাধা দেয়া সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে দমে গেল রানা।

ও জানে, অন্যান্য ভেহিকেল ধাওয়া শুরু করেছে, যদিও সেগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না। মৃদু হলেও সাইরেনের আওয়াজ পাচ্ছে ও। আল্লাই জানে কি ধরনের ভেহিকেল পিছু নিয়েছে। কল্পনায় এপিসি দেখতে পেল, অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল সহ। এই মিসাইল অনায়াসে ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।

বুলেটের মত ব্রিজে থেকে নেমে এল কার, সরাসরি ওর সামনে। গতি আগে থেকেই কমাতে শুরু করেছে ও, অ্যাকসেলারেটার ও ব্রেকে পালা করে পায়ের চাপ দিচ্ছে। এবার সব কিছু পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে, ট্যাংকটা ঠিকভাবেই রাস্তার ওপর আধপাক ঘুরে গেল। সামনে কারটা দেখতে পেল, একটা রাউণ্ডঅ্যাবাউটে সরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাউণ্ডঅ্যাবাউট বা বৃত্তাকার সচল প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে বিশাল একটা চকচকে স্ট্যাচু, প্রকাণ্ড ডানা বিশিষ্ট ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন জার নিকোলাস।

রানা আন্দাজ করল, কারটাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে ও, একটা রাম ধাক্কা দেয়ার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুনোর আগেই রাউণ্ডঅ্যাবাউটে উঠে ট্রাফিকের মিছিলে ঢুকে পড়ল কার।

'আসছি আমি,' বলে ট্যাংকটা সোজা ছোটাল রানা, ইতস্তত না করে উঠে

পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

মেটাল ক্যাপসুলের ভেতর ভেসে এল কার আর ট্রাকের ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, ট্যাংকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে ড্রাইভাররা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ট্যাংকের ডান দিকের ট্র্যাক বিয়ারের ক্যান ভর্তি একটা লরির নাক থেঁতলে দিল। কিছু ক্যান খসে পড়ল ট্যাংকের সামনে, কয়েকটা ড্রপ খেলো ড্রাইভারের পিট-এ। ট্যাংকের বা লরির কি ক্ষতি হলো বোঝার উপায় নেই।

তবে ইতিমধ্যে রাউণ্ডঅ্যাবাউটের মাঝখানে পৌঁছে গেছে ট্যাংক। তীব্র একটা ঝাঁকি খেলো রানা, ট্যাংকের খোল স্ট্যাচুটার ভিতে গুঁতো মেরেছে। জার নিকোলাস স্থানচ্যুত হয়ে নিখুঁতভাবে বসলেন একশো এমএম কামানের লম্বা মাজলে, এখনও ডানা লাগানো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আছেন।

কারের পিছন থেকে জেনারেল কুরুনভ দেখলেন, প্রতিশোধপরায়ণ একজন নিকোলাস তাঁর ওপর চড়াও হতে যাচ্ছেন। বহু বছর পর এই প্রথম বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকলেন তিনি, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে।

ওদিকে রাউণ্ডঅ্যাবাউটে ড্রাইভারদের মচ্ছব লেগে গেছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বিয়ারের ক্যান, গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে যে যা পারে তুলে নিচ্ছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পথিকরাও। বেশিরভাগই দু'চারটে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, কিংবা শপিং বাস্কেটে ভরছে। অনেককেই দেখা গেল পুলওভার কিংবা স্কার্টকে ব্যাগ বানিয়ে ক্যান ভরছে তাতে।

থেমে গেছে ট্রাফিক। চারদিকে হৈ-চৈ, গাড়ির হর্ন, চিৎকার-চেঁচামেচি। ড্রাইভাররা খিস্তি করছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধমক দিচ্ছে পুলিস আর মিলিটারি।

অন্তত আপাতত রানাকে ধাওয়া করা হচ্ছে না। তবে এই সুবিধে টিকবে না। ঠিক সাইরেনের আওয়াজ শুনে নয়, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই ওকে বলে দিল ওর পিছনে আরও অনেক পুলিস লেগেছে।

রানা যদি আকাশ থেকে কনভয়টা দেখতে পেত, দেখা যেত ট্যাংকের সামনে জেনারেলের কার খুব বেশি দূর নয়। আরও লক্ষ করত, তিনটে পুলিস কার দ্রুত ট্যাংকের পিছনে চলে আসছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্যাংক চালানো সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাম দিকে লম্বা ও চওড়া একটা বাঁক নিল ও, দেখল সরাসরি সামনে নিচু একটা ব্রিজ রয়েছে, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। জেনারেলের কার এই মুহূর্তে ওই ব্রিজের তলা দিয়ে ছুটছে।

এঞ্জিনে আরও শক্তি যোগাতে চেষ্টা করল রানা, দেখল ঝুলন্ত খিলান ওর দিকে ছুটে আসছে, পর মুহূর্তে ভাঙচুরের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল, বুঝতে পারল ওভারহ্যাঙ-এ বাড়ি খেয়েছে মাজলে বসা স্ট্যাচু, গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ধাওয়া রত যানবাহনের সরাসরি সামনের পথে।

ইতিমধ্যে পুলিস ব্যাণ্ডের কমিউনিকেশন ধরতে পেরেছে রানা। অ্যান্টি-ট্যাংক উইপন ও প্রচুর ফায়ার পাওয়ার সহ রোড ব্লক খাড়া করার আয়োজন চলছে। যদিও ধরা গেল না ঠিক কোথায় ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে। তবে আন্দাজ করা যায়,

কুরুনভের কার যে রুট ধরে ছুটছে তার সামনে কোথাও হবে। জেনারেলের কার, একটু দেরিতে রানা হঠাৎ লক্ষ করল, ডানদিকে বাঁক নিচ্ছে।

ট্যাংকের গতি কমাল রানা, কিন্তু বাঁক ঘোরার সময় ও সুযোগ পাওয়া গেল না, রাস্তাটাকে পাশ কাটিয়ে এল ট্যাংক। ওদিকে ওই রাস্তা ধরে ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কার।

শহরের বাইরে চলে এসেছে ওরা, বাড়ি-ঘরের সংখ্যা এদিকে অনেক কম। গতি আরও কমিয়ে পরবর্তী ডান দিকের বাঁক ঘোরার প্রস্তুতি নিল রানা, কোন আশা নেই জানার পরও ধারণা করছে কারটার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোবে ও।

কান খাড়া করে রেখেছে রানা, রোড ব্লক সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে শুনছে। পরবর্তী বাঁকটা কাছে চলে এল। গতি আরও কমিয়ে মোড় ঘুরল, গলা লম্বা করে ফাটলে তাকিয়ে আছে কারটাকে দেখতে পাবার আশায়। হতাশ হলো বাঁক ঘোরা সম্পূর্ণ হবার পর–রাস্তাটা চওড়া, তবে কানাগলি, শেষ মাথায় তিনতলা অফিস বিল্ডিং। স্ট্রীট লেভেলে অনেক জানালায় আলো জ্বলছে, জানালার পিছনে হাঁটাচলা করছে লোকজন। একেবারে শেষ মুহূর্তে অফিস কমপ্লেক্সের লোকজন আওয়াজটা শুনতে পেল। ট্যাংক আসছে! যে যেদিকে পারল ছুটল, লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ধাতব দৈত্যটার সামনে থেকে। বিল্ডিং ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল ট্যাংক, ভেঙে দেশলাইয়ের কাঠি বানিয়ে ফেলল ফার্ণিচার, টাইপরাইটারগুলো দুমড়ে দিল, ফাটিয়ে দিল কমপিউটর স্ক্রীন।

ফুল স্পীড দিয়েছে রানা, বিল্ডিং ভেদ করে অপর দিকে বেরিয়ে এল T 55। এদিকের রাস্তাটাও চওড়া। দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার পর মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও, ঠিক করতে পারছে না কারটাকে ধরার জন্যে কোনদিকে যাবে। তারপর ডানদিকে ঘুরিয়ে নিল ট্যাংক, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেল পুলিস আসলে রেডিওতে কি নিয়ে আলাপ করছিল।

ওর সামনে ব্যারিকেড, অ্যান্টি-ট্যাংক গান সহ অন্যান্য ফায়ার পাওয়ার নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডান দিকে একজন অফিসার একটা কমাণ্ড কার-এ দাঁড়িয়ে, বোঝাই যাচ্ছে নির্দেশ দেয়ার অপেক্ষায়। অফিসারের একমাত্র সমস্যা হলো, রানার ট্যাংক বিল্ডিঙের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে ব্যারিকেডের পিছনে।

এই প্রথম ফরওয়ার্ড ফায়ারিং মেশিন-গানের হ্যাণ্ডেল ও ট্রিগারের দিকে হাত বাড়াল রানা, চাপ দেয়ার পর স্বস্তির সঙ্গে উপলব্ধি করল অস্ত্রটা পুরোপুরি আর্মড এবং তৈরি অবস্থায় আছে।

বদ্ধ ট্যাংকের ভেতর করডাইটের তীব্র গন্ধ ঢুকল নাকে। সামনের দৃশ্যটা এক নিমেষে এলোমেলো হয়ে যেতে দেখল রানা। মেশিন-গানের কিছু ট্রেসার লক্ষ্যভেদ করল, বাকিগুলো অপেক্ষারত মিলিটারি ইউনিটকে আতঙ্কিত করে তুলল। একজন দুঃসাহসী লোক রানার মনোযোগ কেড়ে নিল, অ্যান্টি-ট্যাংক ঘুরিয়ে রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করতে চাইছে, ব্যারিকেডের পিছন দিকে ব্যারেল ঘুরিয়ে। কিন্তু রানার ট্যাংক এরইমধ্যে ওদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে

পড়েছে। T 55-এর ডানদিকের ট্র্যাক অ্যান্টি-ট্যাংক গানটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

রাস্তা ধরে বিরতিহীন ছুটছে ট্যাংক, অল্প কয়েকটা বুলেট ছুটে এল। আর্মার ভেদ করতে পারে এমন এক রাউণ্ড বুলেট পিছনের ভারি প্লেটিং-এ লাগল, তেমন কোন ক্ষতি হলো না। বিপদ পিছনে ফেলে সামনে চলে এসেছে রানা। আরও সুখবর, দুই ব্লক সামনে রাস্তার মাথাটাকে পাশ কাটাতে দেখা গেল কুরুনভের কারকে। এখন আর খুব কাছ থেকে অনুসরণ না করলেও চলে, কারণ এলাকাটা রানা চিনতে পারছে। সিআইএ প্রতিনিধি রবার্ট স্মিথ যখন ওকে সেন্ট পিটার্সবার্গ ট্যুর করায়, এই রাস্তায় ইচ্ছে করেই নিয়ে এসেছিল। রানা এখন জানে ঠিক কোথায় যাচ্ছেন জেনারেল কুরুনভ। এখন শুধু দেখতে হবে সময়মত ও নিজে সেখানে পৌঁছুতে পারে কিনা।

ছয়

এটা সাবেক সোভিয়েত মিলিটারি মেশিনের আরও একটা অবশিষ্ট। চৌকো করে কাটা বিশাল এক গহ্বরের গভীর তলদেশ, মাথার চারদিকে ইঁটের পাঁচিল আর রেজার ওআয়্যার। পাঁচিলটা ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে বিল্ডিংগুলোও, সব মিলিয়ে গোটা দৃশ্যটার মধ্যে ক্ষমতা হারানোর করুণ ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে আছে।

সন্দেহ নেই এককালে এই জায়গার বিরাট স্ট্র্যাটিজিক গুরুত্ব ছিল। নানা ধরনের বিশালাকায় কাঠামো, শক্ত করে বানানো প্ল্যাটফর্ম ও মরচে ধরা দৈত্যাকার ক্রেনগুলো দেখেই তা বোঝা যায়।

পাঁচিলের একটা ফাঁকে শুয়ে রয়েছে রানা, গহ্বরের মাথায়, নিচে তাকিয়ে বিচিত্র দৃশ্যটা দেখছে। একটা লম্বা গর্তের শেষ মাথায় বিশ্রাম নিচ্ছে T 55, ঘাস ঢাকা ঢালু ইমবাঙ্কমেন্ট বেয়ে ওঠার সময় গর্তটা তৈরি হয়েছে। ঘাসগুলো খুব লম্বা, ট্যাংকটা সহজে কারও চোখে পড়বে না।

জেনারেল কুরুনভের আগে পৌঁছুতে পেরে রানা খুব খুশি। কাজটা কঠিন হয়নি, কারণ লিয়াকে নিয়ে সাধারণ রোড ধরে আসতে হচ্ছে জেনারেলকে, আর ট্যাংক নিয়ে রানা এসেছে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে।

মনে মনে রবার্ট স্মিথকে ধন্যবাদ দিল রানা। ও যেদিন সেন্ট পিটার্সবার্গে এল, সেদিনই ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে এই জায়গাটা দেখিয়েছিল সে। পরে গ্যাঙস্টার আর্মস ডিলার দিমিত্রি নবোকভ রানাকে একটা গুজবের কথা জানায়, রবিন হুড নাকি একটা আর্মারড ট্রেনে চলাফেরা করে। কথাটা শোনামাত্র রানা বুঝতে পারে ট্রেনটা কোথায় রাখা হতে পারে–এখানে, এককালের নাম্বার ওয়ান স্ট্র্যাটিজিক (রেইল) উইপনস ডিপোয়। এই জায়গা আসলে কি ছিল তার সত্যিকার আভাস মেলে লম্বা, অতিরিক্ত শক্তিশালী ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের সংখ্যা দেখে। এগুলোই প্রধান ট্র্যান্সপোর্টার ভেহিকেল, নিউক্লিয়ার উইপন বহন করে।

ন্যাটো যে নিউক্লিয়ার উইপনের নাম দিয়েছিল—স্কেপগোট, স্যাভেজ, সেগো ও স্ক্রুজ। এগুলো সবই ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল, রেলযোগে সাইট অথবা সাইলোতে নিয়ে যাওয়া হত, কিংবা এমনকি সরাসরি এই ট্র্যাকগুলো থেকে ছোঁড়ার প্ল্যানও করা হয়েছিল।

রেল ট্র্যাক বেশ ভাল অবস্থাতেই রয়েছে, ডিপোয় দাঁড়ানো একমাত্র ট্রেনটাও তাই। বড় আকারের ডিজেল এঞ্জিন, পুরোটাই আর্মারড, পিছনে তিনটি ক্যারিজ। ক্যারিজগুলো একই রকম দেখতে, ওগুলোও আর্মারড। এঞ্জিন আগেই স্টার্ট দেয়া হয়েছে, জ্যান্ত হলেও নিশ্চল বা অলস। এঞ্জিনের চৌকো নাক থেকে নিঃসঙ্গ, দীর্ঘ একটা টেলিস্কোপিক স্টীল বাফার বেরিয়ে আছে। বাফারের শেষ মাথায় গোলাকার একটা প্লেট রয়েছে, এঞ্জিনের ফ্রন্ট প্লেটের আকৃতির প্রায় সমান।

এঞ্জিনের কাছাকাছি কেউ পৌঁছুতে চাইলে ওই বাফার একটা বাধা। শক অ্যাবজরভার হিসেবেও কাজ করে ওটা, বিশেষ করে ট্রেন যখন কোন নিউক্লিয়ার লোড বহন করে।

রানা ধারণা করল, গোটা ট্রেন নতুন করে সাজানো হয়েছে। কারণটা কি? চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল না, একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেল থেকে সবেগে বেরিয়ে এল জেনারেল কুরুনভের গাড়ি, চাকার রাবার পুড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘ্যাচ করে।

নিচে নামার আগে রানাকে নিশ্চিত হতে হবে সবাই ওরা ট্রেনে উঠেছে। গহ্বরের নিচে নামতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না ওর। রানা নিচে নামবে শুধু যে লিয়াকে উদ্ধার করতে, তা নয়। কুরুনভের সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি আছে। ওর আরও একটা উদ্দেশ্য হলো, রবিন হুডের সঙ্গে আবার একবার দেখা করা।

গাড়ির পিছন থেকে টান দিয়ে লিয়াকে বের করে আনলেন কুরুনভ। মুখ শুকিয়ে গেছে লিয়ার, ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

ড্রাইভার জানতে চাইল, 'আমি কি অপেক্ষা করব, কমরেড?'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল কুরুনভ। 'যদি চাও। চিরকাল অপেক্ষা করো, প্লীজ।' গুলি করলেন তিনি, দু'বার পেটে, শেষবার মাথায়।

চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এক পা পিছু হটল লিয়া, পরমুহূর্তে সবিস্ময়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল—ট্রেন থেকে কখন যেন নিঃশব্দে নেমে এসেছে ওলগা পলিয়ানা, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পিছনে।

'স্বাগতম, লিয়া,' নেকড়ের নিষ্ঠুর হাসি ফুটল পলিয়ানার ঠোঁটে, নাচের ভঙ্গিতে নিতম্বটা বার কয়েক দোলাল। পরে আছে স্কিনটাইট ওয়ান পীস কালো জাম্প সুট, পালিশ করা চকচকে গোড়ালি ঢাকা বুট। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা উজি। 'জেনারেল,' বলে সামনে এগোল সে, ঝুঁকে চুমো খেলো কুরুনভকে। 'এখানে আপনারা নিরাপদে পৌঁচেছেন দেখে স্বস্তিবোধ করছি আমি। রবিন হুড খুব খুশি হবেন।'

'আমার কথা শুনে বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর।'

'নেভার মাইণ্ড। খেলায় ভুলভাল হয়েই থাকে। আপনি বরং ঝলমলে রোদের কথা ভাবুন। এসো, অপরূপা।' লিয়ার দিকে এমন বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাল সে, যেন খেয়ে ফেলতে পারে।

লিয়াকে ওরা বলা যায় ট্রেনের দিকে টেনেই নিয়ে যাচ্ছে। কুরুনভ ইতিমধ্যে তাঁর বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে হাসিখুশি হয়ে উঠেছেন। 'সত্যি কথা বলতে কি,' বললেন তিনি, 'যেরকম শীত পোহালাম, খানিকটা রোদ পেলে একদম তাজা হয়ে উঠি।' তারপর হেসে উঠলেন তিনি, ভঙ্গিটা কদর্য, সুরটা কর্কশ। 'লিয়া, তুমি থাকায় খেলা দারুণ জমবে! কথা দিচ্ছি, ফান করার দারুণ সুযোগ হবে তোমার। পলিয়ানা এক ব্যতিক্রমী মেয়ে। পা আছে এমন যে-কোন প্রাণী পছন্দ করে ও। উত্তেজক কিছু চাইলে ওর সাহায্য নিতেই হবে তোমাকে।'

ট্রেনে ওঠার পর পরিচিত গন্ধগুলো পেল না লিয়া। ব্যাপারটা বিস্মিত করল তাকে। এমন কি ডিজেলের গন্ধও অনুপস্থিত। ট্রেনে সাধারণত ঘাম, তেল আর গ্রিজের গন্ধ থাকে, এখানে সে-সব কিছুই নেই। তার বদলে নাকে ঢুকল ফুলের গন্ধ। গোলাপের গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

পিটার মুরেলের ক্যারিজে নিয়ে আসা হলো লিয়াকে, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার আয়োজন দেখে দম বন্ধ হয়ে এল তার। ছবিতে জার নিকোলাসের ট্রেন দেখেছে সে। মূল্যবান ঝালর, ঝাড়বাতি, গদিমোড়া আসন, মেহগনি প্যানেলিং আর পালিশ করা টেবিলের কথা মনে আছে তার। এটা যেন তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি।

ব্রেকফাস্টের জন্যে ফেলা একটা টেবিলে বসে আছে পিটার মুরেল। টেবিলে আগেই রাজ্যের নাস্তা সাজানো হয়েছে। কড়া ও তাজা কফির গন্ধ পেল লিয়া। ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজানো এরকম চীনামাটির বাসনকোসন আগে কখনও দেখেনি সে–প্রতিটি কাপ, পিরিচ, জগ ও প্লেটে সরু সোনার বৃত্তাকার ব্যাণ্ড আছে, তার ওপর ও নিচে আছে একটা করে রয়্যাল ব্লু ব্যাণ্ড। তাছাড়াও, প্রতিটিতে রয়েছে রয়্যাল ক্রেস্ট–একটা করে নীল শীল্ড, তাতে দুটো করে গোল্ড প্রোফাইল, যেন একটা মুখ ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ঠিক যেন টেবিলে বসা কফি পান রত লোকটার মত–মুখের ডান দিকটা অক্ষত ও সুন্দর, বাম দিকটা ক্ষতবিক্ষত ও কুৎসিত, চামড়ায় টান পড়ায় অক্ষিকোটর নিচে নেমে এসেছে, মুখের কোণটা স্থির ও অসাড়। চোখ আর ঠোঁটের মাঝখানে ক্ষতিগ্রস্ত মাংস দেখে মনে হবে ওখানে যেন সাপের চামড়া লাগানো হয়েছে।

পিটার মুরেল নড়ছে না, তাকিয়ে আছে লিয়ার দিকে। কাঁপন অনুভব করল লিয়া। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। সামান্য দুলছে, গতি বাড়ছে দ্রুত।

কুৎসিত চেহারার লোকটাকে রবিন হুড বলে ধরে নিল লিয়া। চোখ ঘুরিয়ে জেনারেল কুরুনভের দিকে তাকাল মুরেল, তারপর আবার লিয়ার দিকে। লিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল। লিয়ার মনে হলো, লোকটা মনে মনে বিবস্ত্র করছে তাকে। এটা একটা অপমানকর অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা যতক্ষণ ধরে ঘটল,

লিয়ার মনে হলো অদ্ভুত এই লোকটার কাপড়চোপড় ভেদ করে ভেতরটা দেখার ক্ষমতা সত্যি আছে। লোকটার চোখের দিকে তাকাবে না সে, বিব্রত ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

এতক্ষণে কথা বলল লোকটা, বলল জেনারেল কুরুনভকে লক্ষ করে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না ভ্রমণের সময়টা আমার মনোরঞ্জনের জন্যে নিখুঁত একটা উপহার নিয়ে এসেছেন, নাকি আমাকে হতাশ হতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল, যেন এ-সবের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তিনি অন্য প্রসঙ্গে কথা বললেন, 'গাধাটা, উটারভিচ, ওদের কাছে আমার আগে পৌছায়।'

'আপনি আসলে আমাকে বলতে চাইছেন, মাসুদ রানা বেঁচে আছে।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন কুরুনভ। 'তিনি পালিয়েছেন।'

মুখের কদর্য অংশে বেরিয়ে থাকা একটা শিরা কেঁপে উঠল, মুরেল বলল, 'ওর জন্যে ভাল,' বিড়বিড় করল সে। 'তবে আপনার জন্যে খারাপ, জেনারেল।'

পলিয়ানার হাসির আওয়াজটা অপ্রীতিকর, কর্কশ। সে বলল, 'আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম—আমি যদি মাসুদ রানাকে না পাই, সেটা আপনার ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।'

মুরেল বলল, 'বিড়ালের মত রানার অনেকগুলো জীবন, মৃত্যুর মুখ থেকে বারবার পালিয়ে আসে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, এখন ওকে নিয়ে এসো এদিকে।' ইঙ্গিতে লিয়াকে দেখাল।

লিয়ার কাঁধে একটা হাত রাখলেন জেনারেল, রবিন হুড ওরফে মুরেলের দিকে ঠেলে আনলেন তাকে, কাছাকাছি এনে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিলেন মুরেলের পাশের চেয়ারটায়।

'লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ বসে থাকো, দুষ্টামি কোরো না, কেমন?' নরম সুরে বলল মুরেল, তার উচ্চারণ লিয়ার কানে অত্যন্ত মার্জিত লাগল। কিন্তু আচরণটা মোটেও মার্জিত নয়, লিয়ার ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল, যেন চুমো খেতে চাইছে। মুখটা ঝট করে সরিয়ে নিল লিয়া। লোকটা কুৎসিত, সেটা একটা কারণ; তারচেয়েও বড় কারণ, ব্যক্তিত্বের মধ্যে কদর্য কি যেন একটা আছে—অশুভ কিছু।

'তুমি আমার বন্ধু মাসুদ রানাকে পছন্দ করো?' জিজ্ঞেস করল মুরেল।

মাথাটা একটু নাড়ল বা ঝাঁকাল লিয়া, উত্তরটা হ্যাঁ কি না বোঝা গেল না।

'তাহলে শোনো। একটা সময় ছিল আমি আর রানা সব কিছু শেয়ার করেছি।' মুরেল হাসলে তার শুধু ডানদিকটা জ্যান্ত হয়, বাঁ দিকটা এক চুল নড়ে না। আরেকটা জিনিস লক্ষ করল লিয়া, তার বাঁ চোখের পাতা অনেক বেশি সময় নিয়ে, অলস ভঙ্গিতে ওঠা-নামা করে।

তার ওপর ঝুঁকে পড়ায় কোলন আর কফির গন্ধ পেল সে, তবে আরও কি যেন একটা আছে। প্রথমে গন্ধটা লিয়া চিনতে পারল না, তারপর হঠাৎ উপলব্ধি করল, পোড়া চামড়ার গন্ধ। সন্দেহ হলো, ব্যাপারটা তার কল্পনাও হতে পারে।

কে যেন তাকে একবার বলেছিল বার্লিনে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ওই শহর দগ্ধ হবার গন্ধটাও নাকি নাকে আসে—পঞ্চাশ বছর আগের যুদ্ধে মুষলধারে বোমা বর্ষণের সময় পোড়া গন্ধটা কি রকম ছিল, এ যেন তারই আভাস দিয়ে যায়।

লিয়া সরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হাসল মুরেল। 'সত্যি বলছি, রানা আর আমি প্রায় সবকিছু শেয়ার করেছি। আর জানোই তো, যুদ্ধে কেউ বিজয়ী হলে বন্দী নারীদের ওপর আপনাআপনি তার অধিকার জন্মে যায়। তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে আমি জিতেছি, রানা হেরে গেছে। কাজেই রানার মেয়েমানুষ এখন আমার মেয়েমানুষ।'

শিউরে উঠল লিয়া, মুখটা আরও আধ ইঞ্চি সরিয়ে আনল সে।

'জীবনটাকে তুমি ইচ্ছে করলে চুটিয়ে উপভোগ করতে পারো,' বলে চলেছে মুরেল। 'কিছু দিন এমন কি বিলাসিতায়ও ডুবে থাকতে পারো। এক সময় দেখবে, আমাকে তুমি পছন্দ করতে পারছ।' আবার লিয়াকে চুমো খাবার চেষ্টা করল সে।

চেয়ারে বসা অবস্থায় মুখ পিছিয়ে নেয়ার একটা সীমা আছে। লিয়ার এখন আর সরে যাবার জায়গা নেই। মুরেল তার ঠোঁট দিয়ে গলায় চুমো খেলো, ঠোঁট বুলাল নাকে, তারপর এক হাতে মুখটা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে ঠোঁটে চুমো খেলো।

মুরেলকে কাছে আসতে দিল লিয়া, জানে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। মুরেলের ঠোঁট চাপ দিতে নিজের ঠোঁট খুলে দিল সে। তারপর হঠাৎ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, রক্তাক্ত করে দিল মুরেলের নিচের ঠোঁট। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল মুরেল, ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

চড়টা দেখতে দেখতে পায়নি লিয়া, পটকা ফাটার আওয়াজের সঙ্গে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। 'বেজন্মা কুত্তা!' বলে তার মুখে থুথু ছিটাল সে।

'তেজি মেয়ে আমার খুব পছন্দ।' হেসে উঠল মুরেল, রুমাল দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছছে। 'জানা কথা, তুমি বালিশের মত বিছানায় পড়ে থাকো না। তোমাকে কাবু করতে মজা পাব আমি, দ্রোভনা লিয়া।'

চোখ দুটো বড় বড় করল লিয়া, চেহারায় বিস্ময়। 'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

চওড়া হাসি ফুটল মুরেলের মুখে। 'তোমার সম্পর্কে আরও কত কি জানি শুনলে...'

আবার মুখ বাড়াল মুরেল। এই সময় কান ফাটানো অ্যালার্ম বেজে উঠল। ক্যারিজের ছাদে লাল আলোও মিটমিট করতে দেখল লিয়া।

হাতের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার ছাড়ল মুরেল, দ্রুত কথা বলল কুরুনভের সঙ্গে—নির্দেশ দিল, জেনারেল যেন লিয়ার কাছে থাকেন। পরবর্তী ক্যারিজের দিকে ছুটল মুরেল, হাতের উজি বাগিয়ে ধরে তার পিছু নিল পলিয়ানা।

হাতে সময় খুব কম পেয়েছে রানা, অ্যামবুশের জন্যে বেছে নিয়েছে রেলপথের

এমন একটা অংশ যেটা মাইল খানেক একদম সরল, তারপরই শুরু হয়েছে ছোট একটা টানেল। নির্দিষ্ট যে জায়গাটা ব্যবহার করবে, একটা ঢালের নিচে, সেখানে ট্যাংকটাকে এনেছে ও। রেলপথের পাশে ঢাল থাকায় সুবিধে হয়েছে। এঞ্জিন বন্ধ করার পর গড়িয়ে নেমে এসে রেললাইনের ওপর লম্বালম্বিভাবে উঠে পড়েছে ট্যাংক। মুখ করে আছে যেদিক থেকে মুরেলের ট্রেন আসবে।

হ্যাচ খুলল রানা, গানার'স সীটে উঠল, র‍্যাকে রাখা শেলগুলো পরীক্ষা করল। 100 mm গান-এর জন্যে T 55-এ তিন ধরনের শেল রয়েছে—স্মোক, হাই এক্সপ্লোসিভ আর আর্মার পিয়ার্সিং। কোনটা ব্যবহার করতে হবে জানা আছে রানার। গান লোড করা কঠিন কোন কাজ নয়। এঞ্জিনকে অলস করে রেখে টারিট ঘুরিয়ে, ব্যারেল নামাল ও, যাতে ঠিক যেখানে প্রথম দেখা যাবে ট্রেনটাকে সেখানটায় তাক করা থাকে।

প্রস্তুতি নেয়া শেষ, তবে ঘটনাটা কিভাবে ঘটবে বলা কঠিন। সব কাজেই ঝুঁকি থাকে, এটাতেও আছে। এমন হতে পারে যে ঘটনাটা ঘটবেই না। ট্রেন আসবে, কিন্তু রেললাইনে ট্যাংক দেখে পিছিয়ে যেতে পারে মুরেল। ট্রেন রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে কিছুই করার থাকবে না রানার। আরও একটা ব্যাপারে জুয়া খেলছে রানা। ও জানে, পিছনের ক্যারিজে লিয়া আছে।

মাত্র একটা সুযোগ পাবে রানা। মাত্র একটা শেল ছুঁড়ে এঞ্জিনটাকে অচল করে দিতে হবে। আর ফায়ারিং বাটনে চাপ দেয়ার পর এক সেকেণ্ডও দেরি করা চলবে না, হ্যাচ গলে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে।

মেশিন পিস্তলে অ্যামুনিশন কম রয়েছে, সেজন্যে রানা উদ্বিগ্ন। খুব বেশি হলে ছয় রাউণ্ড আছে বলে ওর ধারণা, মুরেল আর তার সহকারীদের কাবু করার জন্যে মোটেও যথেষ্ট নয়।

ফরওয়ার্ড সাইটে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। দেখল দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসছে ট্রেনটা।

মুরেল আর পলিয়ানা সামনের কমিউনিকেশন ক্যারিজে চলে এল। কামরাটা অত্যাধুনিক কমপিউটর আর কমিউনিকেশনস ইলেকট্রনিক্স দিয়ে সাজানো, প্রয়োজন হলে এখান থেকে গোটা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব।

কামরার শেষ প্রান্তে একটা মনিটর রয়েছে, এঞ্জিনের সামনে বসানো ক্যামেরা ওটার পর্দায় ছবি পাঠাচ্ছে। ট্রেন ছুটে চলেছে, রেললাইনের ওপর ট্যাংকটাকে স্পষ্টই দেখতে পেল মুরেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলা অভ্যাস নয় তার, এখন ফেলল। তারপর দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল সে, তাতে তার ক্রোধ ও প্রশংসা দুটোই প্রকাশ পেল। 'এ শুধু রানার পক্ষেই সম্ভব,' বিড়বিড় করে বলল।

'ট্রেনটাকে লাইন থেকে ফেলে দেবে ও। ট্রেন এখুনি থামানো দরকার!' ভয় পাওয়া স্বভাব নয় পলিয়ানার, কিন্তু এখন পাচ্ছে।

'না!'

'আমরা এখন কি করব?' ট্রেনের সামনের কেবিন থেকে প্রশ্নটা ভেসে এল। ড্রাইভার আর তার এঞ্জিনিয়ার এরইমধ্যে ট্রেনের গতি কমাতে শুরু করেছে। পাম্প করতে শুরু করেছে ব্রেক।

'স্পীড বাড়াও।' দেয়ালে লাগানো মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নির্দেশ দিল মুরেল। 'সোজা ওর দিকে ছোটো। ফুল স্পীডে। গুঁতো মারো! গুঁড়িয়ে দাও।'

'কিন্তু...,' ড্রাইভার হতভম্ব।

'গুঁতো মারো, গাধার বাচ্চা! ট্রেনের সামনে অত বড় ব্যাটারিং র‍্যাম আছে কি করতে? এখনই ওটা ব্যবহার করার সময়।'

বলা বা সাহস করা সহজ, কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল তো নয়ই, বরং অত্যন্ত বিপজ্জনক। কি ঘটতে চলেছে তা বোঝার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে মুরেলের। রানার মত সে-ও ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে, জুয়া খেলায় অভ্যস্ত। এখন যা-ই ঘটুক না কেন, ট্রেনটা চুরমার হয়ে যাবে। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ পরিবহনের বিকল্প ব্যবস্থা করা তার জন্যে কঠিন হবে না। সামনের বাধাটা নগণ্য, খানিকটা অস্বস্তিকরও, তবে নিজের গন্তব্যে ঠিকই সে পৌঁছুবে।

মুখ তুলে মনিটরের দিকে তাকাল মুরেল, সীটের হাতল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। তার সামনে বসেছে পলিয়ানা, ঘাড় ফিরিয়ে সে-ও মনিটরের দিকে তাকিয়ে। পা দুটো লম্বা করা, কোলের ওপর উজি।

ওদের মাথার ওপর মনিটরে দেখা যাচ্ছে তীর বেগে ট্যাংকের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন। আর ছয়শো গজ যেতে হবে। মাঝখানের ব্যবধান দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

আর যখন দুশো গজ বাকি, মুরেলের মনের গভীরে আতঙ্ক বাসা বাঁধতে শুরু করল। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার নেই। আগুনের একটা ঝলক দেখা গেল, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো তারা, যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

ফায়ারিং বাটনে চাপ দিয়েছে রানা। রিকয়েলের ধাক্কায় লাফ দিল টারিট, শেলটা ছুটে গিয়ে এঞ্জিনের সামনের অংশ ভেদ করল, তারপর বিস্ফোরিত হলো– আগুনের বিশাল একটা চাদর দেখা গেল, মনে হলো ছুটে এসে ট্যাংকটাকে ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করছে।

হ্যাচ বেয়ে মাথায় উঠল রানা, বাম দিকে লাফ দিয়ে পড়ে গড়িয়ে দিল শরীরটা। এক সেকেণ্ড পর ট্রেনের এঞ্জিন ধাক্কা দিল ট্যাংকে, সংঘর্ষে লম্বা টেলিস্কোপিক বাফার দুমড়ে গেল।

ট্যাংকটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, ওদিকে রানা যেন মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ট্রেনের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে ট্যাংকেও। দুটোই ঢুকে পড়েছে টানেলের ভেতর।

তারপর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটল। বাজ পড়ার মত আওয়াজ হলো, আগুনের তীব্র আঁচ অনুভব করল রানা। যথেষ্ট দূরে শুয়ে ছিল, তা না হলে কি হত বলা যায় না। মাথা তুলে তাকাল ও, দেখল টানেলের ভেতর থেকে ধোঁয়া আর আগুনের

শিখা বেরিয়ে আসছে। টানেলের মাথায় আকাশে ধোঁয়া ও আগুন বিপজ্জনক প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত খাড়া হচ্ছে।

সিধে হলো রানা, হাতে মেশিন পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে। ক্যারিজগুলোর দিকে ছুটছে ও। লক্ষ করছে ভেতরে ঢোকার সহজ পথ কোথায় পাওয়া যায়।

শেষ ও মধ্যবর্তী ক্যারিজ দুটোকে এক করেছে একটা দরজা, সেই দরজায় ওঠার সিঁড়ি আছে, দেখতে পেয়ে লাফ দিল রানা। হাতলটা গরম আগুন হয়ে আছে, আঙুল পুড়ে যাবার অবস্থা, যদিও সেদিকে খেয়াল নেই ওর। মাথায় একটাই চিন্তা, আজ এখুনি মুরেলের সঙ্গে হিসাবটা চুকিয়ে ফেলবে।

*

কমিউনিকেশন ক্যারিজে প্রচণ্ড এক ঝড় বয়ে গেছে যেন। মুরেল ও পলিয়ানা, দু'জনেই ছিটকে পড়েছে মেঝেতে। দেয়াল আর ডেস্ক থেকে খসে পড়েছে ইকুইপমেন্ট। পলিয়ানার উজি প্যাসেজ ধরে হড়কে কোনদিকে চলে গেছে কে জানে। সবচেয়ে খারাপ হলো, ট্রেন অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ইমার্জেন্সী জেনারেটর!' চিৎকার করল মুরেল।

হোঁচট খেতে খেতে সামনে এগোল পলিয়ানা, দেয়ালে বসানো বড় একটা সুইচের কাছে পৌঁছুতে চাইছে সে। এঞ্জিন তো বিস্ফোরিত হয়েছেই, তার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে বিদ্যুতের স্বাভাবিক উৎস। এখন একমাত্র ভরসা ইমার্জেন্সী জেনারেটর।

সুইচটা ধরে টান দিল পলিয়ানা, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল আলো।

'কেউ নড়বে না,' আওয়াজটা ভেসে এল ওদের পিছন থেকে।

একটা টেবিলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে মুরেল, গলার আওয়াজটা চিনতে পেরেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। শুধু বলল, 'রানা, তুমি কী? তোমার কি সত্যিই মরণ নেই?'

সাত

মুরেলের স্বাভাবিক আচরণ হয় রানাকে খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, নয়তো অসতর্ক করার জন্যে। তবে কোনটাই ঘটল না। সে যে তার আস্তিনে নানা বিচিত্র ধরনের কৌশল লুকিয়ে রাখে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভালই জানা আছে রানার। বিশেষ করে একটা সেমিনারের কথা পরিষ্কার মনে আছে ওর, যেখানে ভাষণ দিয়েছিল পরীক্ষিত বিএসএস এজেট পিটার মুরেল। তার ভাষণের মূল কথা ছিল, ফিল্ডে থাকার সময় কোন এজেন্ট সত্যিকার অর্থে কোন রকম ভাবাবেগকে অবশ্যই প্রশ্রয় দেবে না, এবং প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়লে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি।

তারপর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, মানুষ হিসেবে আমূল বদলেও

গেছে মুরেল, তবে কাজের পুরানো পদ্ধতি এখনও সে ধরে রেখেছে। গত কয়েক মিনিটে যা ঘটেছে তারপরও সে যদি শান্ত ও স্বাভাবিক থাকতে পারে, ধরে নিতে হবে অবাক করে দেয়ার মত কিছু একটা আছে তার আস্তিনে। কাজেই খুব সাবধান থাকতে হবে রানাকে।

মুরেল ও পলিয়ানা ধীরে ধীরে সিধে হলো, রানার দিকে পিছন ফিরে। ওদের সামনে অসংখ্য সুইচ আর বোতাম রয়েছে, একটু বেশি কাছে। এর মানে হলো, আলোটা নিভিয়ে দিতে পারে ওরা, সামনের ক্যারিজে যাবার জন্যে বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে পারে।

টানেলে ঢোকার সময় ট্রেনের এঞ্জিন কারগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে রানার জানা নেই দুটোর মধ্যে কোন ক্যারিজে আছে লিয়া। এটা মাঝখানের ক্যারিজ, লিয়া সামনের অথবা পিছনের-টায় থাকতে পারে। নতুন একটা অস্ত্রও দরকার রানার।

মুরেল আর পলিয়ানা পিছন ফিরে থাকায় দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাবার সুযোগ পেল রানা। ছোট একটা অস্ত্র চোখে পড়ল। মনে হলো, বেরেটা। পড়ে আছে একটা কম্পিউটর ডেস্কের ওপর, সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণে ডেস্ক থেকে খসে পড়েনি।

এক পাশে সরে অস্ত্রটা তুলে নিল রানা, মেকানিজম কক করল। ওজনটাই বলে দিল, ভেতরে পুরো ম্যাগাজিন আছে। স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা গুলি নিয়ে এল ও।

'ঘোরো। মাথার ওপর হাত রেখে,' নির্দেশ দিল রানা। 'দু'জনেই! জলদি!'

নির্দেশ পালন করছে ওরা, রানা লক্ষ করল তিন ফুট দূরে মেঝেতে পড়ে থাকা উজির দিকে চট করে একবার তাকাল পলিয়ানা।

'ওটা পা দিয়ে ঠেলে দাও আমার দিকে, পলিয়ানা, প্লীজ। আমরা চাই না এখানে কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটুক। দু'জনেই তোমরা ওই দরজার কাছ থেকে দূরে থাকো।' উজিটা হড়কে চলে এল রানার দিকে। ওর হাতে পিস্তলটা এক চুল নড়ল না, পায়ের ধাক্কায় ওর ডান দিকের একটা সীটের নিচে পাঠিয়ে দিল ইসরায়েলি মেশিন গান।

মুরেল বিদ্রূপাত্মক সুরে হেসে উঠে বলল, 'রানা, তুমি আসলে চিরকালই ভাগ্যবান। তবে এ-ও সত্যি যে তুমি বোকাও। চাপের মুখে ভালই কাজ দেখাও, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখতে পাও না। শোনো হে, বন্ধুবর, আজ এখানে তুমি কোন সুবিধে করতে পারবে না।'

'আচ্ছা!'

'কারণ কি বলছি। এখানে তোমার কোন ব্যাকআপ নেই, নেই কোন এস্কেপ রুট। আমরা তোমার জিম্মি হিসেবে এখানে আটকা পড়েছি, তেমনি তুমিও আমাদের সঙ্গে আটকা পড়েছ। এক কবি একবার লিখেছিলেন, "দা গ্লাস ইজ ফলিং আওয়ার বাই আওয়ার"...'

বাকিটা পূরণ করল রানা, 'হুম। "দা গ্লাস উইল ফল ফর এভার। বাট ইফ

ইউ ব্রেক দা ব্লাডি গ্লাস, ইউ ওন্ট হোল্ড আপ দা ওয়েদার''। হ্যাঁ, আমি জানি, মুরেল। আমি এ-ও জানি যে দুনিয়াটাকে নাড়া দিয়ে যাবে এমন একটা প্ল্যান আছে তোমার…।'

'দুনিয়াটাকে নাড়া দিয়ে যাবে…বর্ণনাটা ভাল। খুবই ভাল, রানা। কিন্তু, না! না, এখন আর তুমি ঠেকাতে পারবে না। পারবে, যদি সোর্সটা খুঁজে পাও, এবং দুষ্ট বালক ভিক্টরকে দু'দিনের মধ্যে সরিয়ে দিতে পারো। তা না হলে তুমি ব্যর্থ, দোস্ত। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা পরিস্থিতিটা বদলে দিতে পারি। তবে সে সম্ভাবনা এখন আর নেই। তাছাড়া, তুরুপটা এখন আমার হাতে।'

'তাই?'

'সুন্দরী লিয়া আমার হাতে।'

'তো?'

'তো মানে কি, রানা?'

'লিয়া তোমার হাতের তুরুপ হতে যাবে কেন?'

'কাম অন, রানা। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি।'

'চেনো নাকি? তাহলে বলো, কোথায় সে? লিয়া যদি এত বড় একটা অ্যাসেটই হয়, জানাও কোথায় তাকে রেখেছ।'

'তাকে তোমার কাছে এনে দিতে পারি আমি,' বলল মুরেল, 'তুমি যদি মাইক্রোফোনটা আমাকে ব্যবহার করতে দাও।' ইঙ্গিতে দেখাল সে, দেয়ালে ঝুলছে সেটা, ওয়াল মাউন্টিঙের সঙ্গে সংযুক্ত। 'আমার শুধু তোমার অনুমতি দরকার…।'

'বোকার মত কিছু করে বসো না, মুরেল। আমি সত্যি তোমাকে খুন করতে চাইছি না। আমার ইচ্ছে তোমাকে তোমার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'ও, হ্যাঁ, দেশ! ধরে নিচ্ছি দেশ বলতে ইংল্যাণ্ড বোঝাতে চাইছ তুমি, তাই না? দেশ অর্থাৎ বাড়ি, বাড়ি এবং আরাম।'

'না। আমি বোঝাতে চাইছি দেশ মানে ইংল্যাণ্ড, বাড়ি ও বিচার।'

মাইক্রোফোনের দিকে আরেকবার ইঙ্গিত করল মুরেল, কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। রানার চোখ নড়ছে না, পিস্তলটা তাক করে আছে পলিয়ানা আর মুরেলের মাঝখানে।

'কুরুনভ! মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসুন।' মুরেল মাইকে কথা বলে ওয়াল ব্র্যাকেটে রেখে দিল সেটা। 'ভারি উপাদেয়, বুঝলে রানা। মেয়েটার কথা বলছি। পলিয়ানা ওর নাম দিয়েছে, অপরূপা। উপাদেয়…আর স্বাদটা কেমন হবে তোমার তা ভালই জানা আছে।'

'না, আমার জানা নেই।'

'তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। আমি জানি।'

রানা ভাবছে, মুরেলের অভিনয়ে চালাকি আছে। আমি জানি, মাত্র এই একজোড়া শব্দ উচ্চারণ করে একটা ছবি ফোটাবার চেষ্টা করছে সে, যেন রাতের পর রাত লিয়ার বাহুবন্ধনে সময় কাটিয়েছে, তার শরীরের সমস্ত রহস্য তার

জানা।

ওর পিছনের দরজা খুলে গেল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল লিয়া। তার গলাটা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরেছেন জেনারেল কুরুনভ, দুটো শরীর এক হয়ে আছে, কুরুনভের অপর হাতে একটা পিস্তল, সেটা লিয়ার মাথায় চেপে ধরেছেন তিনি।

হেসে উঠল মুরেল। তার হাসির আওয়াজে শুধু আনন্দ বা ব্যঙ্গ নয়, আরও কি যেন আছে। এ-ধরনের আওয়াজ পাওয়া যায় উন্মাদের হাসিতে। 'কেমন বোধ করছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল সে। আবারও রানার মনে হলো, মুরেল অস্বাভাবিক শান্ত। কিছু একটা প্ল্যান করেছে সে। বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

'মান্ধাতা আমলের মেক্সিকান স্ট্যাণ্ডঅফ, রানা। ভেবে দেখো, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই আমরা ফিরে এসেছি। তোমাকে যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে। মেয়েটাকে যদি চাও, তাহলে আমার হাতে কি আছে বা কোথায় সেটা লুকানো আছে তা তোমার জানা হবে না।'

মুরেল আর পলিয়ানার দিক থেকে পিস্তল না সরিয়ে মাথাটা সামান্য ঘোরাল রানা, জেনারেল কুরুনভ যাতে বুঝতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে ও, 'বলুন দেখি, এই ব্যাটা কসাক কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আপনাকে?'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, জেনারেলের চেহারায় বিস্ময় ও অনিশ্চিত একটা ভাব ফুটে উঠল।

বিড়বিড় করল মুরেল, 'খুলে বলো, খুলে বলো।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, জেনারেল?' প্রশ্ন করল রানা। 'পিটার মুরেল আসলে একজন লিয়েঞ্জ কসাক?'

'বহুজন্মের আগের কথা, অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। একজন নাট্যকার যেমন অবৈধ সহবাস সম্পর্কে বলেছিলেন- "সে তো অন্য এক দেশে ঘটেছিল, আর তাছাড়া, বেশ্যা মেয়েটা এখন আর বেঁচেও নেই"।'

'এ কি সত্যি?' কুরুনভকে হতচকিত দেখাল।

'অন্য দেশ সম্পর্কে?' একটা মাত্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে খুর চড়া গলায় হেসে উঠল মুরেল।

'কথাটা সত্যি, জেনারেল,' বলল রানা। 'বন্ধুবর পিটার মুরেল একজন লিয়েঞ্জ কসাক। আপনি জানেন, বঞ্চনা ও বিতাড়নের সেই পুরানো ঘটনা আজও ভোলেনি কসাকরা। আপনার বা আপনাদের কারও প্রতি ওর মনে এতটুকু দরদ বা ভালবাসা নেই, থাকতে পারে না। ও আপনাদের সঙ্গে বেঈমানী করবে। ও নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবার সঙ্গে বেঈমানী করেছে।'

'এ কি সত্যি?' আবার প্রশ্ন করলেন কুরুনভ।

এবার কড়া ধমক দিল মুরেল। 'সত্যি কি মিথ্যে, এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক হলো আমরা দু'জন, আপনি এবং আমি, কি পেতে যাচ্ছি। আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আপনি আর আমি যে পরিমাণ টাকা ও ক্ষমতা পেতে যাচ্ছি তা বোধহয় ঈশ্বরেরও নেই। ততক্ষণে বন্ধুবর মাসুদ রানা স্রেফ একটা

স্মৃতিতে পরিণত হবে। ওর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় খুব বেশি লোক হবে বলে আমি মনে করি না। সুযোগ পেলে বিএসএস-এর চীফ মারভিন লংফেলো আর বিসিআই-এর চীফ রাহাত খান আসতেন, কিন্তু তাঁরা জানবেনই না। খবর পেলে শোকে কাতর হবে গোটা দুনিয়ার কয়েক হাজার কোটিপতি, তবে কতটা বলা মুশকিল—কারণ ব্যাংকের সব টাকা হারিয়ে তাঁদের তো পাগল হয়ে যাবার কথা।' একটু থেমে রানার দিকে তাকাল সে। 'তাহলে কি ঠিক করলে, দোস্ত? দুটো টার্গেট। সময় আছে একটা গুলি করার। সিদ্ধান্ত নাও, কোনদিকে লাফ দেবে। মেয়েটাকে চাও, নাকি আমার প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ইচ্ছে হলে খুন করো মেয়েটাকে। আমার কাছে ওর কোন গুরুত্ব নেই।'

গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজটা মনে হলো লিয়ার খুব গভীর থেকে উঠে এল।

'তোমার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমার ধারণা মিথ্যে নয়, রানা,' বলে হাসল মুরেল। তারপর জেনারেলকে নির্দেশ দিল, 'আপনি দেরি করছেন কেন? মেরে ফেলুন, মেয়েটাকে মেরে ফেলুন···ঝামেলা কমান।'

কিন্তু কুরুনভ অসতর্ক হয়ে পড়েছেন, আর লিয়া আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, কুরুনভের উরুসন্ধিতে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল। তারপর ছিটকে সরে গেল, রানাকে গুলি করার জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

গর্জে উঠল পিস্তল, বদ্ধ ক্যারিজের ভেতর কামান দাগার মত শব্দ করে। যেন স্লো মোশনে জেনারেল কুরুনভের মাথাটা লাল মিহি কুয়াশায় পরিণত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে এক পাশে সরে গেল রানা, গুলি করতে করতে চলে এল লিয়ার কাছে। ওর প্রথম দুটো গুলি ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাম দিক ঘেঁষে। দ্বিতীয়বার লক্ষ্যস্থির করবে, শেষ প্রান্তের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল পলিয়ানা, মুরেলের পিছু নিয়ে। আরও দুটো গুলি করল রানা, চৌকাঠের ছাল ওঠা ছাড়া আর কোন লাভ হলো না, পলিয়ানাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে মুরেল। দরজার কাছে পৌঁছুল রানা, কবাট আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, শুনতে পেল উল্টোদিক থেকে বোল্ট আটকানো হচ্ছে। প্রায় একই সময়ে অসম্ভব পুরু আর্মারড শীল্ড সশব্দে নেমে এল জানালাগুলোর ওপর।

'আমরা একটা আর্মারড-প্লেটেড কফিনে আটকা পড়েছি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তুমি ঠিক আছ তো, লিয়া?'

'হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। ধন্যবাদ, রানা। জিজ্ঞেস করায় আমি কৃতজ্ঞ···।'

বড় একটা কম্পিউটর রয়েছে ডেস্কের ওপর, যে ডেস্ক থেকে বেরেটাটা তুলে নিয়েছিল রানা। হঠাৎ বীপ বীপ করে উঠল সেটা, ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল লিয়া। এক পলক তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিরগিজ!'

'কোথায়?'

'বাইরে কোথাও।' রানাকে ঠেলে একটা চেয়ারে বসল লিয়া, হাত দুটো কী

বোর্ডে, দ্রুত বোতাম টিপছে।

'লিয়া, কি করছ তুমি?'

'রানা, আমাকে বাধা দিয়ো না। বাইরে কোথাও, বাস্তব দুনিয়ায়, একটা কম্পিউটরের সামনে বসে আছে ভিক্টর কিরগিজ। তাই থাকার কথা তার, একটা কম্পিউটরের সামনে। শুধু কম্পিউটর পেলে জ্যান্ত মানুষ হয়ে ওঠে সে।'

'কিন্তু কোথায়?' আবার জানতে চাইল রানা। 'বাইরে মানে কতদূরে?'

'বলা কঠিন। যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে সে, টিমবাকথ্রী...'

'টিমবাকটু।'

'টু। ঠিক। শোনো, এটা তার প্রোগ্রাম। সে তার সমস্ত ফাইলের কপি তৈরি করছে, কাজেই তার হদিস বের করা সম্ভব। আমি যদি লাইনে একটা স্পাইক পাঠাতে পারি, ঠিক কোথায় সে আছে ধরে ফেলতে পারব। তাতে কি কোন সাহায্য হবে?'

'বিরাট।'

'গুড, তাহলে কাজটা আমাকে করতে দাও।' তারপর ভুরু কোঁচকাল লিয়া, ধমকের সুরে বলল, 'সং সেজে দাঁড়িয়ে থেকো না তো! তোমার কাজ তুমি করো, চেষ্টা করে দেখো এখান থেকে বেরুনো যায় কিভাবে।'

'ইয়েস, ম্যাডাম। কোন চিন্তা নেই, সে ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাবে।' মেঝের দিকে মনোযোগ দিল রানা, ওয়েস্ট ব্যাণ্ড থেকে বড় একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করে কাটতে শুরু করল কার্পেট।

ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল মুরেল আর পলিয়ানা।

'জানি না বিস্ফোরণে ওটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা,' বলল মুরেল, অস্থির ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। 'যদি ক্ষতি হয়ে থাকে, সব ভেস্তে যাবে।'

ফরওয়ার্ড কোচ-এর কাছ থেকে খানিকটা সরে দাঁড়িয়েছে ওরা, কোচটার সামনের অংশ বিস্ফোরণে কিছুটা পুড়ে গেছে। পকেট থেকে একটা জিনিস বের করল মুরেল, দেখতে টিভির ছোট আকৃতির রিমোট কন্ট্রোলারের মত। ক্যারিজের দিকে সেটা তাক করে বোতামে চাপ দিল সে।

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ক্যারিজের চারদিকের দেয়াল ঝুলে পড়ল নিচের দিকে, উন্মুক্ত হলো কালো ঝকঝকে একটা ছোট হেলিকপ্টার।

'উফ, কি ভাল যে লাগছে!' চিৎকার করল পলিয়ানা, মুরেলের পিছু নিয়ে ছুটল সে। লাফ দিয়ে ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে উঠে পড়ল তারা, কাজ শুরু করল একটা টীম হিসেবে, প্যাড লাগানো মেটাল লক খুলছে হেলিকপ্টারের চারদিক থেকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নিচু করে মাঝখানের ক্যারিজটার তলায় ঢুকল মুরেল, রানার কাজের আওয়াজ পেল কানে। একটা হাত বাড়িয়ে ক্যারিজটার সামনে বসানো কালো একটা বক্স খুঁজে নিল সে, সেটা খুলে কয়েকটা বোতাম টিপল।

ক্যারিজের তলা থেকে বেরিয়ে এসে মুরেল দেখল পলিয়ানা ইতিমধ্যে

হেলিকপ্টার স্টার্ট দিয়েছে, ঘুরতে শুরু করেছে রোটর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আকাশে উঠে পড়ল যান্ত্রিক ফড়িং, কন্ট্রোলে বসেছে মুরেল। বড় একটা বৃত্ত রচনা করল সে, তারপর ফিরে এসে ঝুলে থাকল মাঝখানের ক্যারিজটার মাথার ওপর। সাউণ্ড সিস্টেমে কথা বলল সে, শান্ত ও স্বাভাবিক সুরে।

ঝড়ের বেগে টাইপ করে যাচ্ছে লিয়া। তার মনিটরের রিডআউট ফ্ল্যাশ করছে, বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

C: > CD SPIKE

C: > SPIKE

C: > SEND SPIKE ENTER

এন্টার কীতে তর্জনী চেপে ধরল লিয়া, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল মনিটর:

C: > SPIKE SENT

উল্লাসে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল লিয়ার গলা চিরে। 'ওকে আমি পেয়েছি, ধরে নেয়া চলে!'

তারপরই রবিন হুডের কথা শোনা গেল, ওপর থেকে ভেসে আসছে। 'মেঝের কথা ভুলে যাও, দোস্ত। এক মিনিটে টাইমার সেট করেছি আমি। আর্কঅ্যাঞ্জেলে তুমিও আমাকে এইরকম সময় দিয়েছিলে। পুরানো বন্ধুর জন্যে এটুকু অন্তত আমি করতে পারি।'

ওদের নিচ থেকে বীপ বীপ শব্দ ভেসে এল, সেই সঙ্গে ক্যারিজের প্রতিটি দরজার ওপর দ্রুত জ্বলছে নিভছে লাল আলো।

'এর মানে কি?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল লিয়া।

'এর মানে হলো ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, যদি বাঁচতে চাই।'

'ইস!' কী বোর্ডের দিকে ফিরে আবার টাইপ করতে শুরু করল সে, আগের চেয়েও দ্রুত।

খানিকটা কার্পেট কেটে সেটাকে ভাঁজ করেছে রানা, নিচের ধাতব মেঝে বেরিয়ে পড়েছে। কব্জি থেকে হাতঘড়ি খুলে কাঁটা ঘোরাল ও, দুটো কাঁটাকে এক করল। নখ দিয়ে খুঁটরে একটা খুদে বোতামে চাপ দিল, ঘড়িটার পাশে বিন্দু আকারের একটা ফুটো তৈরি হলো। এরপর উল্টোদিকের আরেকটা বোতামে চাপ দিতে ফুটোটা থেকে সরু ও উজ্জ্বল লেযার রশ্মি বেরিয়ে এল হিসহিস শব্দ করে। লেযার রশ্মি নিচু করল ও, ধাতব মেঝে কেটে ফেলছে।

ওদিকে কম্পিউটরকে আরও একটা নির্দেশ দিচ্ছে লিয়া– C: > FOLLOW SPIKE TRACE.

স্ক্রীন পরিষ্কার হয়ে গেল, তারপর ফুটে উঠল একটা ম্যাপ। পৃথিবীর গ্রাফিকস-এর ওপর দিয়ে লাল একটা রেখা রওনা হয়েছে, চোখ দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করছে লিয়া, সেই সঙ্গে বিড়বিড় করছে। 'কিরগিজ রাশিয়ায় নেই, জার্মানীতে নেই, প্যারিসে নেই, মাদ্রিদে নেই, রোমে নেই, লণ্ডনে নেই।' তার

কণ্ঠস্বর দ্রুত থেকে দ্রুত হলো, কারণ রেখাটাও দ্রুত অনুসরণ করছে ভিক্টর কিরগিজকে। সন্দেহ নেই, অদ্ভুত একটা রুট ধরে রওনা হয়েছে কিরগিজ। 'নেই নিউ ইয়র্কে, ওয়াশিংটনে, মায়ামিতে, কী ওয়েস্টে···।'

'বিশ সেকেণ্ড,' বলল রানা।

'কিউবা, রানা! কিরগিজ এখন কিউবায়!'

লেযার ট্রেসিং-এর মাঝখানে হাতের তালু দিয়ে ধাক্কা মারল রানা, বৃত্তাকার ইস্পাতের একটা পাত খসে পড়ল ক্যারিজের নিচে। 'পনেরো,' চিৎকার করে বলল।

'হাভানা! পেয়েছি তাকে···না। না, ওখানে সে নেই। আরও উত্তর দিকে, তবে এখনও কিউবায়···।'

'ওতেই চলবে!' বলে লিয়ার শার্টের প্রান্ত ধরে টান দিল রানা, চেয়ার থেকে নামিয়ে ঢুকিয়ে দিল গর্তটার ভেতর, তারপর নিজেও নামল- হাতে সময় আছে আর পাঁচ সেকেণ্ড।

হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত ক্যারিজের তলা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। লিয়াকে ধরে শুইয়ে দিল রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল তাকে, পরমুহূর্তে ট্রেনের তিনটে ক্যারিজই সগর্জনে বিস্ফোরিত হলো, ঢাকা পড়ে গেল আগুনে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো লিয়া, ঝেড়ে দৌড় দিল; তার পিছু নিল রানা। বেশি দূর এগোতে পারেনি লিয়া, আবার তাকে ঢেকে ফেলল রানা। মুখ ফিরিয়ে ওর চোখে তাকাল সে, বলল, 'অ্যাই, খুব বুঝি মজা পাচ্ছ, তাই না?' হাসছে সে।

'তুমিই বলো, এ কি মজা পাবার পরিবেশ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আমাকে ভুল বুঝো না,' বলল লিয়া। 'আমার প্রাণ বাঁচানোর বিনিময়ে যা খুশি চাইতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ, আমি কখনও কারও দুর্বলতার সুযোগ নিই না।'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না, রানা,' বলল লিয়া। 'তুমি কি বলো তো? যে গাড়িতেই চড়ো, সেটাই ধ্বংস হয়ে যায়?'

'সেরকম মনে হলেও, আমাকে একা তুমি দায়ী করতে পারো না। আসলে এটা একরকম অপারেটিং প্রসিডিউর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ভাল কথা, এবার তাহলে আমাদের কিউবায় যাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমাদের?'

'কাজটা তুমি একা শেষ করবে? আমি রাজি হব?' মাথা নাড়ল লিয়া। 'ভাল কথা, রানা, তুমি কি স্যাটেলাইট বিনিয়াকে অকেজো করতে পারবে?'

'প্রসঙ্গটা তুলে ভালই করেছ। সত্যি পারব না। আমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'পাবে সাহায্য?'

'আশা করি।'

'গুড। এবার, রানা, বলো দেখি, আর কোন অপারেটিং প্রসিডিউর আছে কিনা, যা আমার জানা উচিত?'

'এক হাজার,' লিয়ার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা, তারপর পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল।

আট

সমস্যা দেখা দিল অনেকগুলো। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা সহজ হবার কথা, দেখা গেল সেটাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের কোনও বাহন নেই, অথচ সেন্ট পিটার্সবার্গের জিরো পয়েন্ট থেকে ছয় কি সাত মাইল দূরে আটকা পড়েছে ওরা। রাশিয়ায় গণতন্ত্র মাত্র শুরু হয়েছে, চারদিকে মহা বিশৃংখলা, সন্ত্রাসের এমন বিস্ফোরণ ঘটেছে যে গাড়ি না নিয়ে রাস্তায় বেরুনো সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ছিনতাইকারীরা বোমা ফাটিয়ে বা গুলি করে প্রথমে জখম করে, তারপর কেড়ে নেয় সব।

রানার একটা টেলিফোনও দরকার, রবার্ট মিথের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। সেই ওর একমাত্র ব্যাকআপ।

কয়েক মাইল হাঁটল ওরা, বলা যায় ভাগ্যগুণেই সন্ত্রাসীদের সামনে পড়ল না। তবে একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ বিরক্ত করল। সে তার হেঁড়ে গলায় গান শুনিয়ে পয়সা আদায় করবে। জোর করে বিষ খাওয়ার সঙ্গে ব্যাপারটার তেমন কোন পার্থক্য নেই। অথচ গানের কথাগুলো এরকম, 'হে নির্যাতিত ভাই ও বোনেরা, তোমাদের দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়...।' প্রৌঢ় ভিক্ষুক গান গাইছে, রানার মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসা একটা বেলের আওয়াজ ঢুকছে ওর কানে। এই ধ্বনিরও কোন সুর নেই, যেন তারের ওপর কেউ বাড়ি মারছে।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে উদারহস্তে দান করল রানা, পাঁচ ডলার। ভিক্ষুক চলে যাবার পর লিয়া বলল, 'ওটা ছিল একটা বিপ্লবী গান, বলশেভিক আমলের চেয়েও পুরানো।'

অবশেষে বিধ্বস্ত চেহারার একটা রেস্তোরাঁয় পৌঁছুল ওরা। টাকার বিনিময়ে টেলিফোন ব্যবহার করতে দিতে রাজি হলো মালিক। সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিল, দাম নিয়ে তর্ক না করে তার রেস্তোরাঁয় বসে নাস্তা খেতে হবে ওদেরকে।

রবার্ট মিথের দেয়া নম্বরে ডায়াল করল রানা। বেশি কথা বলতে নিষেধ করল মিথ, কাজের কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখতে অনুরোধ করল। তাকে রানা জানাল ওরা কোথায় রয়েছে, গাড়ি সহ আর কি কি উপকার দরকার তার একটা তালিকাও দিল।

রেস্তোরাঁর পরিবেশ সুবিধের না হলে কি হবে, কফিটা সত্যি ভাল লাগল। কালো রুটির সঙ্গে খানিকটা স্মোকড হেরিংও খেলো ওরা।

খাওয়া মাত্র শেষ হয়েছে, রেস্তোরাঁর বাইরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল একজোড়া পুলিস কার।

'খেল খতম,' ফিসফিস করল রানা। 'আমরা বিপদে পড়েছি।'

রেস্তোরাঁর মালিক ভাবছে অন্য কথা। সে এমন একজন মানুষ, যে-কোন আকৃতি বা আদলের কর্তৃপক্ষের প্রতি তার রয়েছে সীমাহীন আক্রোশ। কাউন্টারের পিছন থেকে সদ্য শেকল ছেঁড়া গ্রে হাউণ্ডের মত বেরিয়ে এল সে।

রুশ ভাষায় অনর্গল ফিসফিস করল, গরু খেদানোর ভঙ্গিতে পিছনের কামরায় নিয়ে এল ওদেরকে, ছোট একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলল, তারপর ঢুকিয়ে দিল বড় একটা কাবার্ডে–ভেতরে রয়েছে বিয়ারের ক্যান, ক্যান আর বাক্স ভর্তি শুকনো খাবার, কুকিং অয়েল ইত্যাদি। ব্ল্যাকমার্কেট, ভাবল রানা। ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে কাবার্ডের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল মালিক। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দম আটকে মরার অবস্থা হলো ওদের।

গালে লিয়ার আঙুল অনুভব করল রানা। ওর নাক, চোখ, ঠোঁট, চিবুক ছুঁয়ে দিচ্ছে। তাকে ধরে কাছে টানল রানা, নিজের গাল ঠেকাল তার গালে। প্রথমে লিয়া সাড়া দিল না। ভদ্রতায় বাধল, ছেড়ে দিল রানা। দু'সেকেণ্ড পর অন্ধকারে রানার গায়ে নিজেই আবার সেঁটে এল লিয়া, সক্রিয় হয়ে উঠল।

নিচে থেকে তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ ভেসে আসছে, তারপর হাসির শব্দ শোনা গেল। আরও প্রায় বিশ মিনিট পর সিঁড়িতে মালিকের পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। দরজা খুলে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখাল সে।

'জানি না কোন শালারা রেলওয়ের ইকুইপমেন্ট আর উইপনে হাত দিতে গিয়েছিল,' বলল সে। 'পুলিস আর সিকিউরিটি ফোর্স এক তরুণ আর এক তরুণীকে খুঁজছে। এ-ধরনের লোকদের সব সময় সাহায্য করি আমি, কাজেই বললাম আজ সকালে এখন পর্যন্ত আমি কোন খদ্দের পাইনি। ভাল করেছি? কি?'

'খুব ভাল করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা, হাতে কিছু ডলার গুঁজে দিতে আরও খুশি হলো মালিক।

আধ ঘণ্টা পর হাজির হলো মিথ, আগের সেই লোহার স্তূপ মস্কোভিচ চালিয়ে। গাড়িতে বসে হোটেলে ফিরছে ওরা, মিথকে একটা শপিং লিস্ট দিল রানা, তার মধ্যে আছে সম্ভাব্য প্রথম ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার টিকেট, লিয়ার জন্যে ভ্যালিড পাসপোর্ট সহ ভিসা, আর কিছু কাপড়চোপড়।

'কাগজগুলো জোগাড় করা সহজ হবে না,' বলল মিথ, যদিও হালকা সুরে। 'তবে অসম্ভব নয়।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

হঠাৎ রাস্তার ওপর গাড়ি ঘুরিয়ে সরু একটা গ্রাম্য পথ ধরল মিথ।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একদম সরু রাস্তা, একটা মটরসাইকেলকেও জায়গা ছাড়া যাবে না। কি দরকার ছিল?'

'বড় রাস্তার সামনে খেলাধুলোর আয়োজন করে রেখেছে ওরা। রোড ব্লক ইত্যাদি।'

'রোড ব্লক?' উত্তেজিত হয়ে উঠল লিয়া।

'হ্যাঁ–রোড ব্লকে গাড়ি আছে, ঘোড়া আছে, পুলিস, কেজিবি…'

'কেজিবির এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই,' প্রতিবাদ করল লিয়া।

'হ্যাঁ, না থাকারই কথা। তাহলে বলুন, এখনও সবাই কেজিবির নাম নিচ্ছে কেন? কিংবা পুরানো নাম চেকা বলে ডাকছে কেন? আসল ব্যাপারটা সত্যি যদি আপনি না জানেন, বলতে হবে কেউ আপনার চোখে ধুলো দিতে সফল হয়েছে। আমি এমন একজন রাশিয়ানকে চিনি না যে কেজিবিকে কেজিবি বলে উল্লেখ করে না, গণতন্ত্র আসার পর যে নামই রাখা হোক।'

'হুম,' আওয়াজ করল রানা।

'সে যাই হোক। শহরের কিনারায় কর্তৃপক্ষের লোকজন গিজগিজ করছে, তোমাদেরকে সব রকম বিপদে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে,' রানাকে বলল মিথ। 'আমি দ্রুত চেক করেছি, যে-কোন কারণেই হোক ওরা জানে না কোথায় তুমি উঠেছ। রানা, হোটেলে ওরা তোমার পাসপোর্ট নিয়ে রাখেনি তো?'

'না। বুকিং করার সময় কৌশলে গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।'

'ভেরি গুড।'

খানিক পর রানা জানতে চাইল, 'তুমি বলতে চাইছ, হোটেলের ওপর কর্তৃপক্ষ নজর রাখেনি?'

'রাখেনি, রানা। ওই হোটেল থেকে কাউকে তোমার নাম জানানো হয়নি।'

'তাহলে এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'অলিগলি ধরে শহরে পৌছুব। সেন্ট্রাল সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌছুতে পারলে মোটামুটি নিরাপদ। শহরে ওরা খুব একটা সতর্ক অবস্থায় নেই। এই লোকগুলো অদ্ভুত, বুঝলে। তাদের ধারণা, তুমি এত বোকা নও যে শহরে ফিরবে।'

'এবং?'

'এটা হলো ভাল খবর। খারাপ খবর হলো, ট্রেন স্টেশন আর এয়ারপোর্টে গিজগিজ করছে ওরা, সাদা পোশাকে। তোমাদের দু'জনেরই নতুন পাসপোর্ট দরকার হবে। সেকেলে কিছু পদ্ধতির সাহায্য নিতে হতে পারে, এই যেমন ছদ্মবেশ।'

ইদানীং ছদ্মবেশ তেমন পছন্দ করে না রানা, ওগুলো পরলে অস্বস্তি বোধ করে, ছদ্মবেশের সঙ্গে নতুন চরিত্রে অভিনয় করতে হিমশিম খেয়ে যায়। প্রতিবাদ জানাল, তবে মৃদু। বলল, ফ্যান্সি কোন ড্রেস পরতে সে রাজি নয়।

'চিন্তা কোরো না, রানা। খুব হালকা হবে তোমার ছদ্মবেশ। তোমাকে কোন ড্রাগ দেয়া হবে না। শুধু বয়েস একটু বাড়ানো হবে। তবে লিয়ার বয়েস কমানো হবে। চিন্তা কোরো না।'

হোটেলে ঢোকার সময় কেউ ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করল না। শাওয়ার সেরে অপেক্ষা করছে দু'জন, ভাবছে জিনিস-পত্র নিয়ে আসলেই ফিরবে কিনা মিথ।

ওদের সন্দেহকে মিথ্যে প্রমাণিত করে সাতটার মধ্যে ফিরে এল মিথ, সঙ্গে একটা কেস ও একজোড়া ফ্লাইট ব্যাগ।

রানার জন্যে একটা আমেরিকান পাসপোর্ট এনেছে মিথ, নতুন মুখ লাগানো-চোখে ভারি চশমা, ছাই রঙের চুল, চেহারায় আত্মভোলা ভাব। চুলের রঙ

বদলানো কঠিন কিছু নয়, মুখের আকৃতি বড় করতে হবে ফোম প্যাড দিয়ে।

'ওগুলো মুখের ভেতর রেখে কিছু খেতে চেষ্টা কোরো না, রানা,' সাবধান করে দিল মিথ। 'বিশেষ করে তরল কিছু। তরল জিনিস শুষে নেয়ার একটা প্রবণতা আছে ওগুলোর, কাজেই তোমার আশপাশে সবার গায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'এ-ধরনের কথা অনেকদিন আগে একটা এসপিওনাজ উপন্যাসে পড়েছিলাম।' বাথরুমে ঢুকল রানা, চুলের রঙ বদল করল, চশমা পরল চোখে, মুখের ভেতর ভরল ফোম প্যাড। চেহারার পরিবর্তনটা সত্যি দেখার মতই হলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সিটিংরুমে মিথের সঙ্গে এক স্কুলছাত্রীকে দেখল ও, চিনতে পারল না।

'আমি চেয়েছি ওনাকে দেখে যাতে মনে হয় বয়স মাত্র পনেরো। ব্রিটিশ পাসপোর্ট, সঙ্গে ভিসা। এ-ধরনের স্কুল ইউনিফর্মের অস্তিত্ব কিন্তু সত্যি আছে।' লিয়ার সঙ্গে মিথের আচরণে সমীহ থাকলেও, এই মুহূর্তে তার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকাল সে। টেবিলের ওপর একজোড়া পুরানো আমলের পাসপার্ট ফেলল।

'যে জিনিসটা আমার পছন্দ হয়নি···আণ্ডারঅয়্যার। মোটা, গাঢ় নীল, আর সার্জের মত কর্কশ।' লিয়াকে অসন্তুষ্ট দেখাল।

হাসল রানা। 'ব্রিটেনে স্কুল ছাত্রীদেরকে এই ইউনিফর্মই পরতে দেয়া হয়।'

'শুধু তো ফ্লাইটের জন্যে,' সান্ত্বনা দেয়ার স্বরে বলল মিথ। 'আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে পৌঁছুনোর পর দু'জনের জন্যেই সুন্দর সব ড্রেস ভরা একটা ব্যাগ পাবেন। আপনাদের সাইজ আমি আন্দাজে জানিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, প্রত্যেকের জন্যে একটা করে ফ্লাইট ব্যাগ রয়েছে, ওগুলোর দু'একটা জিনিস কাজে লাগাতে পারবেন।'

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। চারদিকে সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আত্মভোলা অধ্যাপকের চেহারা ও ভাব নিয়ে ইমিগ্রেশনে ঢুকল রানা। ওর আচরণে একটু খেয়ালী ভাবও থাকল, তবে কথা বলতে একদম উৎসাহী নয়। একজন অফিসার বেশি খুঁত খুঁত করছে দেখে ওপরমহলে রিপোর্ট করবে বলে হুমকি দিল রানা, গলে একেবারে নরম হয়ে গেল অফিসার।

এয়ার সাইডে পৌঁছে ঘাড় ফেরাতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। দু'জন বাঘিনী চেহারার সিকিউরিটি অফিসার পর্দা ঘেরা একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে লিয়াকে।

এটাই হচ্ছে লিয়ার জীবনের সবচেয়ে ভীতিকর মুহূর্ত। মহিলা দু'জনকে ভারি অদ্ভুত লাগল তার। সাংঘাতিক মারমুখো, বদমেজাজী, তবে হাতে কিছু ডলার গুঁজে দেয়ার পর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বন্ধ হয়ে গেল।

প্লেন ওদেরকে প্যারিসে নিয়ে এল। ছদ্মবেশ খুলে ফেলে যে যার স্বাভাবিক কাপড় পরল ওরা। মায়ামি ফ্লাইটে বসল পাশাপাশি। মায়ামিতে পৌঁছুনোর পর বিব্রতকর কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না। প্লেন বদলে পুর্টোরিকো-য় চলে

এল ওরা, এখানে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল সিআইএ-র একজন প্রতিনিধি। সে থাকায় ইমিগ্রেশন বা কাস্টমসে বেশি ঝামেলা বা দেরি হলো না। লোকটার বয়স ত্রিশের বেশি হবে না, একটু ছটফটে। ওদের জন্যে নতুন লাগেজ রয়েছে তার কাছে। নিজের নাম বলল, ডাক। দেখে মনে হলো লিয়া তাকে জাদু করেছে।

ওদেরকে একটা বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ-তে তুলল ডাক, নিয়ে এল আরও বিলাসবহুল একটা বীচ হাউসে। বলল, 'দ্বীপে যে ক'দিন থাকবেন, গাড়িটা আপনারাই ব্যবহার করবেন।'

বিকেলে লিয়াকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল রানা, দ্বীপটা ঘুরেফিরে দেখছে, তবে সান জুয়ানের ট্যুরিস্ট স্পটগুলো সযত্নে এড়িয়ে থাকল।

'আমার ওপর এ-সবের কি রকম প্রভাব পড়ছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' গরম বাতাস লেগে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে লিয়ার চুল। খালি রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, সাধারণ গাইডেড ট্যুর রুট থেকে অনেক দূরে। 'বিশ্বাস করবে, রানা, সেই ছোটবেলা থেকে ক্যারিবিয়ানে আসতে চেয়েছি আমি? এদিকের একটা দ্বীপের ছবি পর্যন্ত আছে, আমার ওঅর্ক-স্টেশন সেভারনায়ায়। সেই ছোটবেলা থেকে এই জায়গার স্বপ্ন দেখছি আমি। বিশ্বাস করতে পারছি না আমার সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে।'

'স্বপ্ন সত্যি হওয়ায় আমি খুশি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এখন স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে পরিণত না হলেই হলো।'

রানার শেষ কথাটায় গুরুত্ব দিল না লিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঠেকাল ওর কাঁধে। 'এখানে শুধু আমরা দু'জন, আর দ্বীপটা কি সুন্দর। একেই তো সুখ আর শান্তি বলে। তাই না, রানা?'

লিয়ার কথা তখনও শেষ হয়নি, রেডিও প্যানেল থেকে কর্কশ বীপ বীপ আওয়াজ শোনা গেল।

'ওটা সম্ভবত আমাদের ঘুম ভাঙানোর ডাক।' রেডিওর প্রি-সেট বোতামগুলোর একটায় চাপ দিল রানা, নিচে খসে পড়ল প্যানেল, ভেতরে দেখা গেল ছোট একটা রাডার স্ক্রীন। ডিসপ্লের ওপর একটা রেখা, ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে বিরতিহীন চক্কর দিচ্ছে, প্রতি চক্করে একবার করে সবুজ ব্লিপ ফ্ল্যাশ করছে। 'এর মানে হলো, আমাদের সঙ্গী জুটেছে।'

ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে রানার। তারপর গাড়ির আওয়াজকে ছাপিয়ে শোনা গেল শব্দটা। একটা প্লেন। এদিকেই আসছে।

ওটাকে রিয়ার-ভিউ মিররে দেখতে পেল রানা। লিয়া তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে। কাতর একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, মাথা নিচু করে সীটের কোণে লুকাতে চাইল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল ছোট একটা পাইপার আর্চার, ফ্ল্যাপ পুরোপুরি বিস্তৃত, যাতে ওদের সামনে রাস্তার ওপর ল্যাণ্ড করতে পারে।

'কি যেন বলছিলে তুমি?' রানার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে ওর একটা হাত ব্লেজারের ভেতর ঢুকে গেল, বেরিয়ে এল একটা অটোমেটিক

পিস্তল নিয়ে। পিস্তলটা রানা রাখল কনসোলের ওপর, দু'জনের মাঝখানে।

সামনের রাস্তায় ল্যাণ্ড করল আর্চার, এক সময় বাম দিকে ঘুরে গেল, গাছপালার ফাঁক গলে বেরুল ফাঁকা একটা মাঠে। ওখানেই থামল।

'যা কিছু নড়ে, এমন প্রতিটি জিনিসকে আকৃষ্ট করাই তোমার কাজ?' জিজ্ঞেস করল লিয়া, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

'এটা আমার ন্যাচারাল চার্ম।' এখনও রানার চেহারায় কোন রকম ভাব নেই। 'সঙ্গে ভায়োলেন্সের প্রতি আছে প্রবল দুর্বলতা।' ব্রেক করল ও, গাড়ি ঘুরিয়ে মাঠে নামল, আর্চারের দিকে এগোচ্ছে। প্লেনটার নাকে স্টেনসিল করা–লর্ড জিওফ ওয়ান।

গাড়ি থামতে প্লেন থেকে, প্লেনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে, ছোট একটা ব্রীফকেস নিয়ে নেমে এল মিথ। 'রনো!' চিৎকার করল সে।

'একবার না বলেছি আমার নাম রনো নয়। জানতে পারি, এখানে কি করছ তুমি?'

'কি আশ্চর্য! তুমিই তো বললে সেদিন, রবিন হুডের শেষ দেখে ছাড়বে। কথাটা মনে ছিল, তাই তোমার জন্যে তোমার বসের আশীর্বাদ বয়ে এনেছি। মি. খান বলেছেন, কাজ শেষ করে ফিরতে হবে তোমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, কালই। আর হ্যাঁ, কি যেন নাম সুন্দরী মেয়েটার···তোমাকে এটা পাঠিয়েছে।'

'সুলতানা পারভিন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' ব্রীফকেসটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাতাসের গন্ধ শুঁকল মিথ। 'বাহ্, ব্যানিয়ান গাছের গন্ধ!' হঠাৎ চুপ করে গেল সে, তারপর রানার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আমি এখানে আসিনি, কেমন? এই ব্যাপারটার সঙ্গে এজেন্সির কোনই সম্পর্ক নেই। কেউ কিছু জানবে না। তোমার কিউবায় যাবার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে?'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'ড্রাগস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিতে আমার এক বন্ধু আছে, ছোট পাখিটা তার কাছ থেকে ধার করা। এটা একেবারে তৈরি হয়ে সান জুয়ান ডমিনিক্কি-র প্রাইভেট এয়ারক্রাফট পার্কিং-এ অপেক্ষা করবে তোমাদের জন্যে–কাল সকালের প্রথম আলোয় আকাশে উঠবে।'

'থাকব আমরা ওখানে।' ডমিনিক্কি হলো সান জুয়ানের ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট, দ্বীপের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা শহরগুলো থেকে সারাদিনই ওখানে ওঠা–নামা করে যাত্রীবাহী প্লেন।

'কোন ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্লেনে চড়বে, তারপর কল সাইন দেবে- ওয়াণ্ডরিং ওয়ান। এবার···' ওদেরকে নিয়ে প্লেনের দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল মিথ, সীট থেকে কিছু কাগজ-পত্র তুলল। 'সম্ভাব্য সব রকমভাবে তোমাদেরকে কাভার দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, রানা। কোস্ট গার্ড, ফেডারেল এভিয়েশন অথরিটি ও সাউদার্ণ মিলিটারি কমাণ্ডকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলেছি দিনের

প্রথম আলো, মনে আছে? ঠিক ছ'টায় তোমরা অনুমতি পাবে।'

'স্যাটেলাইট রিপোর্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই নাও,' বলে রানার হাতে বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল মিথ। 'সর্বশেষ স্যাটেলাইট রিপোর্ট। আমাকে বলা হয়েছে ছ'শো ফুটের নিচে থাকলে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

সাঁৎ করে ছুটে এল লিয়ার একটা হাত, রানার কাছ থেকে এনভেলাপটা ছিনিয়ে নিল সে। 'ছ'শো নয়, পাঁচশো ফুট,' মিথের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

'কে উনি?' মাথাটা একদিকে কাত করে লিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল মিথ, যেন আগে কখনও দেখেনি তাকে।

'আমার উচিত ছিল পরিচয় করিয়ে দেয়া। সেন্ট পিটার্সবার্গে তুমি ওর কাপড় এনে দাও, মনে পড়ে?'

'ও, হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে আছে। ইভোভস্কি দ্রোভনা লিয়া।'

একবার শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে এনভেলাপটা খুলল লিয়া, ভেতরের কাগজ-পত্র গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। বেশিরভাগই স্যাটেলাইট ম্যাপ আর ফটোগ্রাফ। 'আমাকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে,' বলল সে। 'আমি এখন মি. রানার 'পসি'র ডেপুটি শেরিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।' মিথের দিকে তাকিয়ে খুব বড় একটা নিঃশব্দ হাসি দিল। 'নির্দিষ্ট কিছু ইন্টিমেট গারমেন্টস প্রসঙ্গে বলছি, আপনার রুচি আমার অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে, মি. মিথ।'

'ও, হ্যাঁ। আশা করি সাইজ মিলেছিল?'

'খাপে খাপে।' রানা ওদের দিকে তাকাল, সারা মুখে নিরীহ ভালমানুষির ছাপ।

'এখানে এই রাশিয়ান তরুণী...'

'তুমি চুপ করবে?'

'প্লীজ, কথাও বলতে...' লিয়া স্যাটেলাইট ম্যাপ পরীক্ষা করছে দেখে থেমে গেল মিথ। তার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আপনি ফুটবল মাঠের মত বিশাল একটা স্যাটেলাইট ডিশ খুঁজছেন, ধরে নিতে পারি? শুনুন, ওটার কোন অস্তিত্ব নেই। কিউবায় কেউ চুরুট ধরাবে আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি জানবে না, এ স্রেফ সম্ভব নয়।'

হাসি হাসি মুখে শান্ত সুরে লিয়া তাকে বলল, 'মি. মিথ, আমি জানি ওটা আছে। সেভারনায়ায় যেটা ছিল, এটা তারই হুবহু কপি।'

মাঝখান থেকে অন্য প্রশ্ন তুলল রানা, 'আমাদের যদি ব্যাকআপ দরকার হয়, মিথ?'

'প্লেনে একটা ট্র্যান্সমিটার আছে।' পাইলটের সামনে সারি সারি অনেক ইন্সট্রুমেন্ট, সেগুলোর দিকে হাত তুলল মিথ। পাইলট সোজা সামনে তাকিয়ে বসে আছে, ওদের দিকে ভুলেও একবার ফেরেনি। 'যদি বিপদে পড়ো, বোতামে চাপ

দিলেই হবে, আমি মেরিন পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

এই প্রথম ওদের দিকে তাকাল পাইলট, তাড়াতাড়ি কাজ সারার ইঙ্গিত দিল মিথকে।

'আমার শোফার অস্থির হয়ে উঠেছে।' রানার কাঁধে চাপড় মারল মিথ, চুমো খেলো লিয়ার কানের নিচে। 'রানওয়ের শেষ মাথা থেকে সামান্য একটু ডান দিকে ঘুরে যাবে। ওখান থেকে কাছেই কিউবা। গুড লাক। সকালে আমি এয়ারপোর্ট থেকে বিএমডব্লিউ নিয়ে আসব।'

'তা নিয়ো, তবে কি কাজ করে না জেনে কোনও বোতাম ছুঁয়ো না।'

'কেন, এ-কথা বলছ কেন? কি আছে ওটায়?'

'কি করে বলব কি আছে। বোতামগুলো আমি কি ছুঁয়েছি?'

রানা ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে হেসে উঠল মিথ। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'রানা, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। আমি জানি রবিন হুডকে তুমি ঘায়েল করতে পারবে। ওই লোক সম্পর্কে সব কিছু জানো তুমি।'

'সমস্যা হলো, সে-ও আমার সম্পর্কে সব জানে। দু'জনে আমরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'তারপরও তুমি তাকে ঘায়েল করতে পারবে, রনো।' ঘুসিটা এড়াবার জন্যে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল মিথ, ঘুরে উঠে পড়ল পাইপার আর্চারে। ধীর গতিতে এগোল প্লেন।

সেদিন রাতে নিভৃত বীচ হাউসে ব্রীফকেসটা পরীক্ষা করল রানা। নতুন একটা ঘড়ি রয়েছে, সঙ্গে ছ'টা ম্যাগনেটিক চার্জ, চার্জগুলো ঘড়িটার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্যাকেট করে একটা কিট-এ রেখে দিল সব, কাল সকালে ওটা ওর সঙ্গে থাকবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সৈকতে বসল রানা, সাদা ফেনার কাছাকাছি। সাগরের গর্জন সত্ত্বেও গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ও। গোপনীয়তা বজায় রেখে কাটিয়ে দেয়া সারাটা জীবনের কথা ভাবছে ও। উপভোগেই জীবনের সার্থকতা, এই বোধ থাকায় বিপজ্জনক পেশায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বঞ্চিত করার দুঃখজনক ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু তারপরও মনের গভীরে প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত কিসে পরিণত হয়েছে সে? সে কি শুধুই একটা কিলিং মেশিন? কর্তৃপক্ষ তাকে বিলাসিতায় গা ভাসাবার সুযোগ করে দেয়, সে কি এই জন্যে যে তারা জানে ওর কাজে ঝুঁকি আর টেনশন অত্যন্ত বেশি? ও জানে, ওর কিছু স্বভাব ও আচরণ দেখেও না দেখার ভান করা হয়। এ-ও জানে যে আর সব অফিসারের চেয়ে অনেক বেশি বেতন দেয়া হয় তাকে।

তারপর রানা ভাবল, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিল সে। সেই প্রেম এখনও তার ভেতর আগের মতই গনগনে আগুন হয়ে আছে, এতটুকু ম্লান হয়নি। তাহলে কেন তার নিজেকে শুধুই একটা কিলিং মেশিন বলে

মনে হবে?

জীবন থেকে কিছু পাওয়া হলো না, এই অনুভূতি আর যার থাক, রানার নেই। সে জীবনের কাছ থেকে এত বেশি পেয়েছে, আবেগে আপ্লুত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অতি বিনয়ের সঙ্গে এ যুক্তিও খাড়া করে সে, শুধু পায়নি, দিয়েছেও অনেক। অসংখ্য বিপদ থেকে রক্ষা করেছে দেশকে, সৎ ও অসহায় মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে বহুবার। যদিও, নোংরা ও বিপজ্জনক পৃথিবীর চেহারা তাতে খুব সামান্যই বদলেছে। সেজন্যে মন খারাপ করাটা বোকামি, নিজের সাধ্যমত যতটা সম্ভব ততটুকুই তো করবে একজন মানুষ।

চিন্তায় বাধা পড়ল লিয়াকে দেখে। খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে সে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে বাতাসের দিকে মুখ করল মেয়েটা। খানিক পর একটা হাত বাড়িয়ে ওর চুল ছুঁলো। রানা নড়ল না। মনে হলো লিয়ার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

তারপর ওর পাশে বসল লিয়া। মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'পিটার মুরেল বা রবিন হুড তোমার বন্ধু ছিল, তাই না?'

'কয়েক জন্ম আগে, হ্যাঁ।'

'আর এখন সে তোমার শত্রু। কাজেই কাল তুমি তাকে খুন করার জন্যে যাবে। ব্যাপারটা এরকমই সহজ, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

সশব্দে বড় করে শ্বাস নিল লিয়া। আওয়াজটা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, লিয়ার চোখে রাগ দেখতে পেল। 'না, রানা। না, ব্যাপারটা এত সহজ নয়।'

রানা কিছু বলল না।

হঠাৎ ঝট করে দাঁড়াল লিয়া, অত্যন্ত অস্থির লাগছে তাকে। তার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল রানা।

'এ-সব আমি ঘৃণা করি!' রাগে ফোঁস ফোঁস করছে লিয়া। 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমাদের সবাইকে আমি ঘৃণা করি! সারা দুনিয়ায় আজ যে এত শোক আর দুঃখ, সেজন্যে তোমার মত লোকেরাই দায়ী। তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে, তোমরা মানুষ খুন করার কৌশল জানো!' নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে লিয়া, সেই সঙ্গে রানার বুকে ঘুসি মারছে।

দু'হাতের আলিঙ্গনে তাকে ঘিরে ফেলল রানা, শক্ত করে চেপে ধরায় ধীরে ধীরে অসহায় হয়ে পড়ল সে, তারপর নরম সুরে কাঁদতে শুরু করল। 'জানো, আমার কত বন্ধু মারা গেছে?' ফোঁপাচ্ছে লিয়া। 'বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন। তোমার মত লোকদের জন্যে কত অসংখ্য মানুষ যে খুন হয়েছে।'

'আমার মত লোক থাকতেই হবে, লিয়া।' তাকে আরও কাছে টেনে আনল রানা। 'অতি প্রয়োজনীয় একটা দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাদের। সে দায়িত্ব আমি পালন না করলে, অন্য একজন করবে। আমার মত লোকেরা আছে বলেই

দুনিয়ার মানুষ এখনও নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পায়। আমার বিশ্বাস, তাদের সে স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হবে। আমি আশাবাদী, লিয়া। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি, আমার মত লোকেরা, যে যার ক্ষুদ্র সাধ্যমত শুভ ও মঙ্গলের জন্যে প্রাণপাত করছি। তোমার কাছে এর কোন মূল্য নেই?'

খানিক পর লিয়ার ফোঁপানো থামল। তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। পাশাপাশি হেঁটে বাড়ি ফিরে এল ওরা।

ভেতরটা একজোড়া ফ্যানের বাতাসে ঠাণ্ডা, আলো কমিয়ে গোধূলির ম্লান আভা তৈরি করা হয়েছে, স্টেরিওতে মাইলস ডেভিস-এর 'স্কেচেস অভ স্পেন' বাজছে, সঙ্গীতের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যাচ্ছে দূর সৈকত থেকে ভেসে আসা ঢেউ ভেঙে পড়ার নরম আওয়াজ।

গায়ে গা সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, সমস্ত অনুভূতি এক হচ্ছে, আঙুলে আঙুলে জড়াজড়ি, বাইরে থেকে ভেসে এসে ওদের নাকে ঢুকছে ফুলের কোমল গন্ধ, তার সঙ্গে অস্পষ্টভাবে মিশে আছে রানার তৈরি ডিশ-এর অ্যারোমেটিক সেন্ট, কিচেনে অল্প আঁচে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

লিয়ার হাত ধরল রানা, ওর পিছু নিল সে। লিয়ার চোখ নিচে নিবদ্ধ, যেন পুরুষমানুষ সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

এক ঘণ্টা পর রানার বুক থেকে মাথা তুলল লিয়া। 'রানা?' তার গলা খসখসে।

'বলো।'

'ট্রেনে। তুমি যখন আমাকে খুন করতে বললে ওদের। বললে, তোমার কাছে আমার কোন গুরুত্ব নেই। আসলে সত্যি সত্যি তা তুমি বোঝাতে চাওনি, তাই না?'

'অবশ্যই চেয়েছিলাম।'

মুখটা ঝট করে আরও একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল লিয়া, ভুরুতে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

হেসে উঠল রানা। 'লিয়া, মাই ডার্লিং গার্ল, আমার পেশায় এটা একটা বেসিক রুল। সব সময় ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

ছোঁ দিয়ে একটা বালিশ তুলে ছুঁড়ে মারল লিয়া, প্রায় চিৎকার করছে, আনন্দে উত্তেজিত তীক্ষ্ণ গলা, 'মিথ্যেবাদী শয়তান...!'

বালিশটা এড়িয়ে লিয়ার একটা হাত ধরে ফেলল রানা, একটানে নিজের বুকে তুলে আনল তাকে।

তারপর এক সময় রানাকে জিজ্ঞেস করল লিয়া, দ্বীপটা ওর ভালভাবে চেনা আছে কিনা।

'কেন?'

'না, মানে, আজ বিকেলে যখন তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে, আমার মনে হলো কোথায় যাচ্ছ তুমি তা জানো।'

বালিশে মাথা নামিয়ে নরম সুরে জবাব দিল রানা, 'হ্যাঁ, এই দ্বীপ আমি চিনি।

এক অর্থে, এই দ্বীপটাকে আমার ঘৃণা করা উচিত। তবে এখন নতুন একটা কারণ তৈরি হয়েছে ঘৃণার কথা ভুলে গিয়ে ভালবাসার।'

'এই দ্বীপে তোমার কিছু ঘটেছিল?'

'সে ঘটনার কথা আমি মনে করতে চাই না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর লিয়া হঠাৎ বলে বসল, 'ঘটনাটা একটা মেয়েকে নিয়ে। আমার মন বলছে। আমি বুঝতে পারি, তোমার জীবনে আগেও অনেক মেয়ে এসেছে। রানা, আমি মন খারাপ করছি না।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ সুরে বলল রানা। 'একটা মেয়েকে নিয়েই ঘটনাটা। আজও সে বেঁচে আছে, তবে জীবনে কোনদিনই আর হাঁটতে পারবে না। সেবার আমরা খুব খারাপ এক লোকের বিরুদ্ধে লেগেছিলাম।'

'কুরুনভের চেয়েও খারাপ?'

'এরা সবাই একই মাত্রায় খারাপ, লিয়া।'

আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। এবারও প্রথম কথা বলল লিয়া, 'এসো, কালকের কথা ভুলে যাই আমরা। তোমার সামনে অন্য একটা দ্বীপ পড়ে আছে, তুমি সেখানে বিচরণ করো। আজ আমি তোমাকে আনন্দে আত্মহারা দেখতে চাই।'

নয়

খুব নিচু দিয়ে উড়ে সাগরকে পিছনে ফেলে এল ওরা, উপকূল রেখা পেরিয়ে জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে ভেতরে ঢুকল প্লেন। নিচের ঘন সবুজ চাদর মনে হলো নিশ্ছিদ্র নিরেট, তবে মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। প্রাণীর কোন চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

'টার্ন টেন ডিগ্রীজ সাউথ অ্যাণ্ড হোল্ড বিয়ারিং ওয়ান-এইট-ফোর।' নেভিগেশনের দায়িত্বে রয়েছে লিয়া, শুরু থেকে সঠিক পথ-নির্দেশ দিচ্ছে। রানার বিবেচনায়, এসপিওনাজ জগতে ওর সহকারিণী হিসেবে এই মেয়েকে দারুণ মানিয়ে গেছে। বুদ্ধিমতী, অক্লান্ত পরিশ্রমী, সাহসী। সঙ্গে আছে বিশ্বস্ততা, আর ইনটিউইশন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। শুধুই একটা সুন্দর মুখ বা চোখ-ধাঁধানো শরীর নয়, এমন একটা মেয়ে যাকে রানা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে, যার ওপর চোখ বন্ধ করে আস্থা রাখা যায়। অল্প সময়ের ভেতর সে-ও রানাকে বিশ্বাস করতে পারছে। দু'জনেই ওরা জানে যে একজনের জীবন অপরজনের ওপর নির্ভর করছে। এ-ও জানে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু'জনেই ওরা মারা যেতে পারে।

নিচের জঙ্গলে তাকিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে ওরা, চোখ দুটোকে এক নিমেষ বিশ্রাম দিচ্ছে না। কি খুঁজছে, পরিষ্কার ধারণা নেই। শুধু জানে বেমানান কিছু, যা

এখানে থাকার কথা নয়। লিয়ার ধারণা, যা খুঁজছে তার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। রানা অবশ্য ততটা নিশ্চিত হতে পারছে না।

প্রায় মাইল দশেক দূরে আলোর ক্ষীণ একটা কাঁপন ধরা পড়ল চোখে। সেদিকে এগোল রানা। দূরত্ব কমে আসছে, বুঝতে পারল পানির ওপর রোদের প্রতিফলন ছিল ওটা।

তারপর বনভূমির মাঝখানে বড়সড় গর্তটা চোখে পড়ল, অকৃত্রিম ইনল্যাণ্ড লেক, পানি স্বচ্ছ কাঁচ, আর এত গভীর যে তলা পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না। তবে কিনারার কাছে তলা দেখা গেল, সরু এক ফালি বালির বিস্তৃতির ওপর লাফিয়ে পড়ছে ছোট ছোট ঢেউ। বালির পর ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে জমিন, গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা।

লেকটা বৃত্তাকার, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এল পাইপার আর্চার। এরকম গোল কেন? প্রথম ধারণাটা তাহলে ভুল, এটা অকৃত্রিম লেক হতে পারে না। বড় বেশি নিখুঁত এর আকৃতি, প্রায় জ্যামিতিক, মানুষের তৈরি না হয়েই যায় না।

প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে আবার লেকটা পেরুতে শুরু করল পাইপার আর্চার। ওটাকে পিছনে ফেলে আবার জঙ্গলের মাথায় উঠে এল ওরা।

'ওখানে নেই কিছু,' বলল লিয়া। 'একটা লেক, কিই বা থাকতে পারে।'

প্লেন ঘোরাতে শুরু করেছে রানা, বলল, 'চলো, আরেকবার দেখি। পানির খুব কাছাকাছি থাকব, কেমন? চোখ খোলা রাখো।'

এবার পানির খুব কাছ দিয়ে, প্রায় পানি ছুঁয়ে উড়ে গেল ওরা। কিন্তু না, লেকটা ছাড়া বেমানান আর কিছুই চোখে পড়ল না। হয়তো মিথের কথাই ঠিক, ভাবল রানা। পাওয়ার বাড়িয়ে আবার ফিরতি পথ ধরল ও। ফিরে এসে আবার ঘুরিয়ে নিল প্লেন, এবার বেশ ওপর দিয়ে লেক পেরুচ্ছে।

'রানা! দেখো! রানা!' গলা ফাটাচ্ছে লিয়া।

লিয়া চিৎকার করা মাত্র দেখতে পেয়েছে রানা। গভীর পানি থেকে সরাসরি উঠে এল ওটা, কাচের মত সারফেস ভেঙে, প্রায় কোন ঢেউ না তুলেই। রানার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো, নিশ্চয়ই বড় কোন মাছ হবে। ইয়োকটা সজোরে বাম দিকে ঠেলে দিল ও, পা শক্তভাবে সেঁটে আছে রাডার পেডালে। তারপর মনে হলো, মাছ নয়, রকেট—সম্ভবত একশো চল্লিশ এমএম রকেট। রাডার পেডালে আরও জোরে পা চেপে ধরল রানা, প্লেনের নাকের সঙ্গে ওটার সংঘর্ষ এড়াতে চাইছে। একশো চল্লিশ এমএম রকেট হলে, একটার পর একটা উঠে আসতে পারে—প্রতি রকেট প্যাকে সতেরোটা করে থাকে।

মনটা খুঁতখুঁত করছে। আজ পর্যন্ত শোনেনি এ-ধরনের রকেট পানির তলা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে কোথাও। না শুনলেও, এ-ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব। ওদের প্লেনকে সম্ভবত কমপিউটরের সাহায্যে ইলেকট্রনিকালি টার্গেট করা হয়েছে। অকস্মাৎ ডান দিকে বাঁক ঘুরতে শুরু করল রানা, ওদের বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথম রকেটটা।

‘এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে,’ গলা চড়িয়ে বলল রানা, আরও ডান দিকে ঘুরে গিয়ে উল্টোদিকে যাচ্ছে। সর্বনাশ, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। দ্বিতীয় রকেট উঠে এল ঠিক ওদের সামনের পানি থেকে। বিস্ফোরিত হলো না, তবে পোর্ট উইং অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

পাইপার খুব নিচে রয়েছে। অসহায় টার্গেট। গোটা ব্যাপারটা স্লো মোশনে আবার ঘটতে শুরু করল। ফাঁকি দেয়ার জন্যে দিক বদল করল রানা, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, প্লেনের নাক খানিকটা উঁচুও হলো, কিন্তু পেট নেমে গেল পানিতে।

কোন প্লেনের পানিতে আঘাত করা আর ইঁটের পাঁচিলে আঘাত করা একই কথা। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে আটাত্তর নট থেকে শূন্য নটে দাঁড়াল গতি। রানা অনুভব করল, প্লেনের তলার দিকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—কর্কশ, রোমহর্ষক ভাঙচুরের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আওয়াজটা ভোঁতা হয়ে গেল, প্রপেলার আলোড়ন তুলছে পানিতে। তীররেখা ওদের দিকে ছুটে আসছে, ফিউজিলাজের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে হড়কে উঠে পড়ল বালির ওপর।

পানির সঙ্গে সংঘর্ষের মুহূর্তে লিয়া আর্তনাদ করে উঠেছিল। এই মুহূর্তে, বালির ওপর ওঠার সময়, একটা হাত বাড়িয়ে লিয়াকে আড়াল করল রানা, অপর হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল।

পরমুহূর্তে এঞ্জিন থেকে লাফিয়ে উঠল আগুন।

ধ্বংসস্তূপ থেকে লিয়াকে কিভাবে বের করে আনল, বলতে পারবে না রানা। এক সময় দেখল, লিয়াকে জঙ্গলের ভেতর বয়ে এনেছে ও, একটা ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিচ্ছে। লিয়ার মাথাটা নড়বড় করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল।

লিয়ার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল রানা, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলল লিয়া। ‘কেমন লাগছে এখন?’

‘কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে আমাকে।’ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসল লিয়া, সাবধানে দাঁড়াল, আস্তে-ধীরে হাঁটাহাঁটি করে দেখে নিচ্ছে হাড়গোড় সব ঠিক আছে কিনা।

রানাও তাই করল। ‘দু’জনেই আমরা অখণ্ড আছি।’ কাঁধ দুটো উঁচু-নিচু করে ব্যথা কমাবার চেষ্টা করল ও। ‘কিংবা বলা যায় পার্টসগুলো জায়গামতই আছে।’

মাথা ঝাঁকাল লিয়া, তারপরই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল।

রানা অস্পষ্টভাবে সচেতন, আশপাশে আরও কি যেন একটা ঘটছে। দিশেহারা ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটা ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ওরা। হঠাৎ খেয়াল হলো, ফাঁকা জায়গাটার ওপর একটা হেলিকপ্টার ঝুলে রয়েছে। সেটা থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে আসছে একটা রশি। তারপর রশি বেয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল একটা মূর্তি।

প্রথমে রানা ভাবল, অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সাহায্য পাঠিয়েছে মিথ। রশিটার দিকে এগোল ও, তারপর বুঝতে পারল মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে।

রশির শেষ প্রান্তে নেমে এসে রানাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল ওলগা পলিয়ানা, বুট পরা পা দিয়ে লাথি মারল সে, লাগল রানার মুখে। মাটিতে ছিটকে পড়ল রানা। দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, পুরোপুরি পারেনি, আবার পা ছুঁড়ল পলিয়ানা। এবার মাটিতে ছিটকে পড়ার পর নড়াচড়া করতে সময় নিচ্ছে রানা।

শরীর কামড়ে ধরা কমব্যাট সুট পরে আছে পলিয়ানা, মেশিন পিস্তলটা নিতম্বে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। হিংস্র পশুর মত রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। রানার বুকের চারদিকে আঙটার মত উঠে এল তার পা জোড়া, পিষে সমস্ত বাতাস বের করে নিচ্ছে, একই সঙ্গে খামচি দিচ্ছে চোখ লক্ষ্য করে।

এবার রানাকে সত্যি বাগে পেয়েছে পলিয়ানা। মেয়েলি ও অশ্লীল কৌশল সম্পূর্ণ অসহায় করে তুলেছে রানাকে। বাতাসের অভাবে ছটফট করছে ও, বুঝতে পারছে যে-কোন মুহূর্তে হাড় ভাঙার আওয়াজ ঢুকবে কানে।

চিৎকার শুরু করল পলিয়ানা, যেন চরম পুলকে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। চিৎকারটা থামল লিয়া তার পিঠে চড়াও হতে।

রানার ওপর থেকে পলিয়ানাকে নামাতে চেষ্টা করছে লিয়া। তবে পারল না, এক হাত দিয়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল পলিয়ানা। চেঁচিয়ে উঠল, 'অপেক্ষা করো। এরপর তোমার পালা।'

লিয়াকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তার পায়ের পেশী খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে পলিয়ানার পিছনে হাত নিয়ে এল রানা, মেশিন পিস্তলটা ধরে ফেলল। আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচ অফ করেই ট্রিগার টেনে দিল ও।

নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে মেশিন পিস্তল থেকে আকাশের দিকে এক পশলা বুলেট ছুটল, ছুটল সরাসরি খাড়াভাবে, হেলিকপ্টারের একটা পাশ ভেঙে চুরমার করে দিল।

স্বভাবতই ঘাবড়ে গেল পাইলট, থ্রটল খুলে সামনে এগোল সে, ক্রমশ আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

পলিয়ানা আর হেলিকপ্টারের মাঝখানে রশিটা টান টান হলো। রানার ওপর থেকে টেনে নিল তাকে। ওপরে উঠতে শুরু করার সময় বন বন করে ঘুরতে শুরু করল তার শরীর, ঘোরার গতি প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে সবুজ পাঁচিলের দিকে এগোচ্ছে সে। হঠাৎ দেখা গেল উঁচু গাছের ডালে আটকা পড়েছে সে।

পলিয়ানার শরীরটা নোঙরের কাজ করল, রশিতে টান পড়ায় বাধা পেল হেলিকপ্টার। মেশিনটা নিচে নামিয়ে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করল পাইলট, কিন্তু টান টান রশি ঠেলে দিচ্ছে একপাশে। কাত হয়ে পড়ল হেলিকপ্টার, দ্রুত খসে পড়ছে। প্রথমে বাড়ি খেলো গাছপালার ডালে, ওগুলো মড় মড় করে ভেঙে বিকট শব্দে ধরাশায়ী হলো। তারপরই শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা অগ্নিকুণ্ড।

রানা দাঁড়াচ্ছে, ওর পাশে চলে এল লিয়া। হাত দিয়ে বুকটা ডলছে রানা, জানে আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলে মৃত্যু ঠেকানো যেত না। লিয়ার দিকে তাকাল ও, তারপর মুখ তুলে গাছের ডালে আটকা পড়া পলিয়ানার দিকে। তার

শরীরটা ডালপালার ফাঁকে এমনভাবে ঢুকে আছে, বোঝাই যায় ঢোকার আগে শরীরের খুব কম হাড়ই অটুট ছিল। এখনও মরেনি পলিয়ানা, তার চেহারা অসহ্য ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে। তবে মরতে আর বেশি সময়ও নেবে না।

'একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ,' বলল রানা। 'প্রেশার দিতে খুব ভালবাসত ও।'

লেকের অনেক নিচে, সেভারনায়ার সঙ্গে মিল আছে এমন একটা কমপ্লেক্সে, এক সারি মনিটরের সামনে বসে রয়েছে ভিক্টর কিরগিজ। তার চোখ একটা স্ক্রীনের ওপর স্থির হয়ে আছে, আঙুলে নাড়াচাড়া করছে একটা কলম।

পানির নিচে এই ফ্যাসিলিটি তিন স্তরে তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি সেকশনকে ঘিরে রেখেছে একটা করে ওয়াকওয়ে। স্ক্রীন আর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

কিরগিজের সামনে মনিটরে সচল সংখ্যা ফুটছে, একপাশে শিরোনাম-কারেন্সি ট্র্যান্সফার। অংকগুলো এত বড়, প্রায় দুর্বোধ্যই বলা যায়। ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সরিয়ে জমা করা হচ্ছে ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে। মাঝে মধ্যে অবিশ্বাস্য মোটা অংকের ডলার মার্কিন ব্যাংকগুলোতেও জমা পড়ছে।

'সব ঠিকঠাক মত চলছে তো?' কিরগিজের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিটার মুরেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিরগিজ বলল, 'ওরা জানতে পারবে আগামীকাল, তার আগে নয়।'

'তুমি জানো না!' হেসে উঠল মুরেল। 'বিনিয়াকে কাজে লাগালে কোনদিনই কিছু জানতে পারবে না ওরা। স্ট্যাটাস বলো দেখি। স্যাটেলাইট কি রেঞ্জের ভেতর?'

চুল এলোমেলো হয়ে আছে কিরগিজের, শার্টের বোতাম খোলা, আচরণে অস্থির একটা ভাব। সে তার ডানদিকের একটা লম্বা স্ক্রীনের দিকে হাত তুলল, ওখানে অরবিট স্ট্যাটাস দেখানো হচ্ছে, রেড স্যাটেলাইট সিম্বল দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর মিটমিট করছে। সিম্বলটা সচল। 'আর ছ'মিনিটের মধ্যে রেঞ্জের ভেতর চলে আসবে,' বলল সে।

'গুড। ডিশটা রেডি করো।'

কনসোলে একটা চাপড় মারল কিরগিজ, নিচের ঠোঁটটা সামনে ঠেলে দিল। 'না। এখুনি নয়। আমি তৈরি নই।'

'যা বলছি করো!' ধমক দিল মুরেল। 'আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই, বুঝতে পারছ? ডিশটা রেডি করো, কিরগিজ, তা না হলে পাওনা বুঝে নেয়ার সময় আশপাশে তুমি থাকবে না।'

ফাঁকা জায়গাটায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, লেকটা

ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে।

'এখানে কিছু একটা না থেকেই পারে না,' বলল রানা। 'আমরা কাছাকাছি চলে না আসলে পলিয়ানা তার ওই কুৎসিত কৌশল ব্যবহার করার জন্যে ছুটে আসত না।'

বনভূমি থেকে সৈকতে বেরিয়ে এল ওরা, দৃশ্যটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই।

পানিতে তুমুল আলোড়ন। নিচে থেকে বিশাল কিছু মাথাচাড়া না দিলে পানি এরকম উথলাবে না। তারপর লম্বা তিনটে টেলিস্কোপিক মাস্ট দেখতে পেল ওরা, সরাসরি লেকের তলা থেকে উঠে আসছে, স্টীল কেবল দিয়ে জোড়া লাগানো।

'প্লেনে করে এ জিনিস আনা সম্ভব নয়, সাবমেরিন ব্যবহার করতে হয়েছে,' আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'এখন বোঝা যাচ্ছে কেন আমরা কিছু দেখতে পাইনি।' লিয়ার একটা হাত মুখে উঠে এল।

পুরোপুরি বিস্তৃত হবার পর প্রতিটি জয়েন্টে লক হয়ে গেল মাস্টগুলো। ওগুলোর মাঝখানে, লেকের ঠিক ওপর, তেকোনা একটা জাফরি-কাটা কাঠামো দেখা গেল–ঝুলে আছে। ওটা থেকে একটা ক্যাটওয়াক নেমে গেছে পানিতে।

এরপর ওদেরকে হতভম্ব করে দিয়ে লেকের পানি নিচু হতে শুরু করল। পানি সরে যাচ্ছে, তার জায়গায় বেরিয়ে পড়ছে প্রকাণ্ড এক বৃত্তাকার কাঠামো, ডায়ামিটারে কয়েক শো ফুটের কম নয়।

'এত বড় রেডিও ডিশ!'

'এরকম বড় ডিশ দেখে অভ্যস্ত আমি, মনে আছে?' কাঁপা কাঁপা হাসি ফুটল লিয়ার ঠোঁটে।

'ওটার ওপর উঠতে চাও? জাফরি বেয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

'তুমি জানো, এখন আর তোমার পিছু ছাড়তে রাজি নই আমি।'

ওদের অনেক নিচে, বৃত্তাকার কন্ট্রোল রুমে, ব্রীফকেস খুলে মিরাকল বের করল মুরেল। কিরগিজের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্যাশ কার্ড। আশা করি এটা রিজেক্ট করা হবে না।'

মনিটরের ওপর চোখ, কিরগিজ বলল, 'বিনিয়া লাইনে চলে এসেছে।'

স্যাটেলাইট বিনিয়া এখনও বহু দূরে। দেখে মনে হবে মহাশূন্যে পরিত্যক্ত আবর্জনার একটা অংশ। এখন ওটা আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। একটা রূপালি ইউএলএফ অ্যান্টেনা পিছলে বেরিয়ে এল, বিস্তৃত হলো প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত।

ওদিকে, কৃত্রিম লেকের নিচে, কিরগিজ বলল, 'টার্গেট কোঅর্ডিনেটস, প্লীজ।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মুরেল, ইলেকট্রনিক রণক্ষেত্রে একজন কমাণ্ডারের মত নির্দেশ দিল, 'টার্গেট করো লণ্ডনকে।'

বিনিয়াকে অ্যাকটিভেট করার জন্যে কয়েক সেট নাম্বার টাইপ করতে শুরু করল কিরগিজ, আর ঠিক সেই সময় ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছনে এক্সটারনাল

সিকিউরিটি স্ক্রীনে তাকাল মুরেল। জাফরির ফাঁকে পা দিয়ে রানা ও লিয়াকে ডিশে উঠতে দেখল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরেল। 'এই লোকের কোনদিন শিক্ষা হবে না!' সশস্ত্র একজন গার্ডের দিকে ফিরল সে। 'যাও। ওরা ঝামেলা করার আগেই শেষ করে ফেলো।'

ডিশের রিম থেকে ওপর দিকে তাকিয়ে রানা দেখতে পেল সুপারস্ট্রাকচারের মাঝখানটা, প্রায় পাঁচশো ফুট ওপরে, ঘুরতে শুরু করেছে।

'স্যাটেলাইট সিগন্যাল পাঠাবার আয়োজন চলছে,' সাবধান করে দিল লিয়া।

'ঠেকানো যায় কিভাবে?'

'ওদিকে তাকাও, কি দেখছ? সুপারস্ট্রাকচারের ঠিক নিচে একটা মেইনটেন্যান্স রুম আছে। ওখানে পৌঁছুতে পারলে ট্র্যান্সমিটারটা খুলে নেয়া যায়, অ্যান্টেনার ঠিক ওপরে।'

লিয়া থামল, অমনি শুরু হলো গুলি।

দশ

যেখানে লেক ছিল সেই জায়গায় ডিশটা বিশাল এক গামলার মত দেখতে, সেই ডিশের রিমে ঝুলে আছে ওরা, ডিশের মাঝখানে প্রকাণ্ড সুপারস্ট্রাকচার-গুলি কোত্থেকে আসছে দেখা না গেলেও, গাছের ডালে বসে থাকা ঘুঘুর মতই সহজ টার্গেট ওরা।

ওদের চারদিকের ইস্পাতে লেগে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে বুলেটগুলো। শিউরে উঠে ডিশে পা হড়কাল লিয়া, শেওলা আর পানিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। একটা হাত বাড়িয়ে খপ করে তাকে ধরতে চেষ্টা করল রানা, পারল না, উল্টে নিজেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গামলার ঢাল বেয়ে হড়কে নেমে যাচ্ছে দু'জন। সরাসরি মাঝখানে এসে থামল ওরা, ডিশের ভিত বলা যেতে পারে জায়গাটাকে-বড়সড় একটা ব্লকহাউস, একপাশে সীল করা হ্যাচ। ওয়াটারপ্রুফ সীল, রানা আন্দাজ করল, সম্ভবত দু'দিক থেকে অ্যাকটিভেট করা যায়, কারণ মাঝখানে ভারি স্পাইক লাগানো একটা হুইল রয়েছে। হ্যাচের পিছনে একটা এয়ার লক-ও থাকার কথা, মেইনটেন্যান্স স্টাফের ব্যবহার করার জন্যে।

হুইল ধরে ঘোরাতে শুরু করল রানা, মাথা নিচু করে রেখেছে, জানে যে-কোন দিক থেকে আবার গুলি করা হবে। হিস্‌স্‌ শব্দ করে খুলে গেল হ্যাচ। লিয়াকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল ও। ছোট একটা চেম্বার, তবে দু'জনের জন্যে যথেষ্ট বড়। উল্টোদিকে আরও একটা হ্যাচ, মাঝখানে হুইল সহ। তারমানে

ডিশটা যখন পানির তলায় থাকে তখন এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করা হয়।

এক মিনিট পর দ্বিতীয় হ্যাচ গলে বেরিয়ে এল ওরা, মই বেয়ে নামছে। মইয়ের নিচে একটা ক্যাটওয়াক, পিলারের ওপর, কন্ট্রোল রুমটাকে ঘিরে রেখেছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার-এর আর্কাইভের কথা মনে পড়ে গেল রানার। বৃত্তাকার কন্ট্রোল রুমটা একই নিয়মে তৈরি করা হয়েছে, তবে আরও বড় আকারে, এবং ইনসুলেটেড মেটাল, টাইলস ইত্যাদির সাহায্যে। নানা উচ্চতার পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর মাথায় সারি সারি মনিটর ও জটিল ইলেকট্রনিক্স।

ওদের বাম দিকে পাঁচ কি ছ'টা লম্বা ও উঁচু সিলিণ্ডার দেখা গেল, ওগুলো থেকে সম্ভবত ইন্টারনাল জেনারেটরে ফুয়েল সাপ্লাই দেয়া হয়।

নিচে, বটম লেভেলে, ফায়ারিং কনসোলে বসে থাকতে দেখা গেল মুরেল আর কিরগিজকে। মুরেলের গলা ভেসে এল ওপরে, 'আমার সঙ্গে গোনো, কিরগিজ...' দু'জনের হাতই ফায়ারিং কী-তে। 'থ্রী...টু... ওয়ান...'

চাবি ঘোরাল ওরা, কনসোলের আলো মিটমিট করে সবুজ থেকে লাল হয়ে যাচ্ছে। ওপরের ডিসপ্লেতে লেখা ফুটল–ওয়েপন আর্মড। টাইম টু টার্গেট: 00:21:32:26.

ক্যাটওয়াকে যেন জমে গেছে ওরা, নড়ার শক্তি নেই। অসহায়, কিছুই করার নেই। দু'জনেই বিস্ফারিত চোখে দেখল ঢাকনি সরিয়ে ফায়ারিং বাটন বের করল মুরেল, চাপ দিল তাতে। হেসে উঠল সে, বলল, 'গড সেভ দা কুইন।'

ইংল্যাণ্ডকে টার্গেট করেছে মুরেল, বুঝতে পারল রানা। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, লণ্ডনকে। নড়ে উঠল ও, নিচে নামবে। ওর বাহু খামচে ধরে নিচের দিকে, মাঝ লেভেলে তাকাল লিয়া। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল একটা দরজা খুলে একজন টেকনিশিয়ান বেরুচ্ছে। পার্কা, ফার হুড আর গ্লাভস পরে আছে সে। বেরিয়ে এল বড় একটা কামরা থেকে।

'মেইনফ্রেম কমপিউটর,' ফিসফিস করল লিয়া। 'ওখানে ওদের একটা কুলিং সিস্টেম আছে। বড় রিফ্রিজারেটরের মত দেখতে হবে।'

লিয়ার কথা শেষ হওয়া মাত্র ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোককে দেখা গেল, সশস্ত্র, ইস্পাতের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে ওদের দিকেই উঠে আসছে। লিয়াকে ঠেলে একটা পিলারের আড়ালে সরিয়ে দিল রানা। আপার লেভেলে উঠেই ফায়ার ওপেন করল লোকগুলো।

সাবধানে, লক্ষ্যস্থির করে, দুটো গুলি করল রানা। ক্যাটওয়াকে উঠে আসা প্রথম লোকটা চরকির মত ঘুরে গেল, বাতাসে খামচি মারছে। দ্বিতীয় লোকটাও অনুকরণ করছে তাকে। সিঁড়ির মাথা থেকে গড়িয়ে নিচে নেমে গেল তারা।

বাকি লোকগুলো সিঁড়ির মাথায় উঠল হামাগুড়ি দিয়ে, বিরতিহীন গুলি করছে। বুলেট লেগে চুরমার হয়ে গেল টাইলস, ফুটো হলো ফুয়েল ট্যাংক, দেয়ালে লেগে ছুটল দিগ্বিদিক। পাল্টা গুলি করছে রানা, কিন্তু সংখ্যায় ওরা এত বেশি যে তেমন কোন লাভ হচ্ছে না। চট করে পিছন দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে

চাইল, লিয়া নিরাপদে আছে কিনা। ছ্যাৎ করে উঠল বুক। লিয়া ওখানে নেই।

চারদিকে উঁকি দিল রানা, ক্যাটওয়াকের নিচে কেউ একজন নড়ছে বলে মনে হলো। ঝুলছে। ওর পায়ের সরাসরি নিচে। ক্যাটওয়াকের কার্নিসে হাত, ওই হাত ব্যবহার করেই ধীর গতিতে এগোচ্ছে।

পিলারের পিছন থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছে লিয়া। উঁকি দিয়ে ক্যাটওয়াকের তলায়, কার্নিসের নিচে, এক সারি ধাপ দেখতে পায় সে। এই মুহূর্তে ওই ধাপ ধরে ঝুলছে, হাত বাড়িয়ে সামনের ধাপ ধরে পিছনেরটা ছেড়ে দিচ্ছে। সেই খোলা দরজার দিকে যাচ্ছে সে। ওই পথে মেইনফ্রেম কমপিউটর রুমে যাওয়া যাবে।

যতটা সম্ভব দেয়াল ঘেঁষে থাকল রানা, পিছিয়ে এসে লম্বা ফুয়েল ট্যাংকগুলোর প্রথমটার পিছনে গা ঢাকা দিল। বেল্টে আটকানো পাউচে হাত ভরে ছোট একটা ম্যাগনেটিক মাইন বের করল ও। বুলেট লেগে ফুটো হওয়া গর্ত থেকে ফুয়েল ঝরছে, খেয়াল আছে রানার। মাথা নিচু করে এক পা পিছিয়ে এল, গুলি করল আরও দু'বার, তারপর মাইনটা আটকাল পাশের ট্যাংকে।

গুলি করতে করতে পিছিয়ে আসছে রানা, বিরতির সময় একটা করে মাইন আটকাচ্ছে প্রতিটি ট্যাংকের তলায়। এই মাইনগুলো ইলেকট্রনিকালি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

একসময় ওর পিস্তল খালি হয়ে গেল। লিয়া খুব ভাল কিছু একটা করতে পারবে, এই আশায় ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছে রানা। ও একা, এতগুলো লোকের সঙ্গে পারবে না। হাতের অটোমেটিক ওয়াকওয়েতে ছুঁড়ে দিল ও, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, দাঁড়াল সশস্ত্র গার্ডদের মুখোমুখি। শৃংখলা বোধ বলে একটা কথা আছে, ট্রেনিং পাওয়া লোকজন সেটার চর্চা করে, রানা আশা করল ওকে আত্মসমর্পণ করতে দেখে ওরা আর গুলি করবে না।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছে রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল লিয়াকে। ক্যাটওয়াকের তলা থেকে খসে পড়ল, পড়ল খোলা দরজাটার ঠিক সামনে, যে পথে মেইনফ্রেম কমপিউটর রুমে যাওয়া যায়। চোখ সোজা করে নিয়ে গার্ডদের দিকে তাকাল ও।

তিন সেকেণ্ড পর আবার চোখ ঘোরাল রানা। লিয়া নেই।

মেইনফ্রেম রুমে ফ্রিজিং অ্যাটমসফিয়ার, লিয়ার নিঃশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে গেল। চারদিকে চোখ বুলাল সে। উপযুক্ত কাপড়চোপড় না থাকায় এখানে কয়েক মিনিটের বেশি টিকতে পারবে না, তার জানা আছে। দ্রুত পায়ে লম্বা প্লাস্টিক কীবোর্ডের সামনে চলে এল সে, সামনে ফেলা চেয়ারটা খপ করে ধরল। মেটাল চেয়ার ধরার সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল আঙুলগুলো, টেনে ছাড়িয়ে আনতে হলো, ছাড়াবার সময় হাতের খানিকটা চামড়া রয়ে গেল চেয়ারের গায়ে।

লিয়ার পিছনে বড় আকৃতির স্টেইনলেস স্টীল রয়েছে কয়েকটা, ঘুরে সেদিকে এগোল সে। প্রতিটির গায়ে লেখা রয়েছে—ডু নট টাচ, সঙ্গে একটা চিহ্ন—

২০০°। লিকুইড নাইট্রোজেন, ভাবল লিয়া। মেইনফ্রেমের জন্যে কুল্যান্ট, রাখা হয়েছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পরিবেশে।

সাবধানে প্লাস্টিক কীবোর্ডের সামনে বসল লিয়া, তারপর কাজ শুরু করল।

*

ওয়াকওয়েতে দাঁড় করিয়ে রানাকে ওরা চেক করল। দেয়ালের দিকে মুখ, হাত দুটোও দেয়ালের গায়ে লম্বা করা। ও যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে ফুয়েল ট্যাংকের তলায় ফিট করা মাইনগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, খুদে লাল আলো মিটমিট করে জানিয়ে দিচ্ছে ওগুলো আর্মড, এবং ওর বাঁ হাতে পরা ঘড়িটা ব্যবহার করামাত্র বিস্ফোরিত হবে। লোকগুলো প্রচুর সময় নিয়ে সার্চ করছে ওকে, তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাবার জন্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে ও, ট্যাংকগুলোর দিকে ভুলেও আর তাকাচ্ছে না।

সার্চ শেষ করে দুই প্রস্থ ইস্পাতের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল ওরা রানাকে। কনসোলের সামনে এনে দাঁড় করাল, ওখানে কিরগিজের সঙ্গে কাজ করছে মুরেল।

'রানা!' চেয়ারে ঘুরে বসল মুরেল, তার গলায় প্রায় উল্লাস। 'এরচেয়ে অপ্রীতিকর সারপ্রাইজ আর হতে পারে না!'

আহত দেখাল রানাকে। 'আমার লক্ষ্য কিন্তু সবসময় সবাইকে খুশি করা।'

একটা ভুরু উঁচু করল মুরেল। 'দু'জনের মধ্যে এখানেই বোধহয় পার্থক্য। আমার লক্ষ্য জড় উপড়ে ফেলা।' তার চোখ দুটো কঠিন হলো। 'মেয়েটা কোথায়?'

'এই মুহূর্তে পরস্পরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'সত্যি? আমার লোকজন বলছিল, তোমার সঙ্গেই আছে সে।' গার্ডদের দিকে তাকাল মুরেল। 'খোঁজো। এখানেই কোথাও আছে।'

চারজন লোক ছুটে গেল, বাকি দু'জন রানার সঙ্গে থাকল। রানার কাছ থেকে পাওয়া জিনিসগুলো মুরেলের সামনে কনসোলের ওপর রাখল তারা। কাজটা যখন করছে তারা, খুঁটিয়ে মনিটরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড থেকে সরিয়ে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অসংখ্য অ্যাকাউন্টে হাজার হাজার কোটি ডলার ট্র্যান্সফার করা হয়েছে, তারই বিবরণ ফুটে আছে লাইনের পর লাইনে। হঠাৎ ওর তলপেটে আলোড়ন উঠল। গ্লোবাল স্ক্রীনে স্পেনের ওপর দেখা যাচ্ছে বিনিয়াকে, সরাসরি লণ্ডন কোর্সে রয়েছে। কাউন্টডাউন ক্লক চালু করা হয়েছে, এই মুহূর্তে সেখানে স্থির হয়ে আছে–টাইম টু টার্গেট 00:15:07:39.

সন্দেহ নেই, ইংল্যাণ্ড তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। মানবিক কারণেই তা ঠেকাতে চেষ্টা করবে রানা। ওর মনে পড়ল, এই মুহূর্তে লণ্ডনে শুধু যে ওর বস্ রাহাত খান আর প্রাণপ্রিয় বন্ধু সোহেল আছে তা নয়, পরিচিত-অপরিচিত অসংখ্য মানুষ আছে। কিছু একটা করতে হবে, অথচ হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো মিনিট।

এ-ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে একটা কাজই করতে পারে রানা। যতটা সম্ভব

চুপিচুপি ডান হাতটা বাম হাতের দিকে সরিয়ে আনছে। ফুয়েল ট্যাংকের তলার মাইনগুলো যদি অ্যাকটিভেট করে, এখানে উপস্থিত একজনও বাঁচবে না, সেই সঙ্গে স্যাটেলাইটটা এক সময় নিচে নেমে আসবে, তারপর পুড়ে শেষ হয়ে যাবে নিউক্লিয়ার বোমা ফায়ার না করেই। ইলেকট্রনিক পালস তৈরি হবে না আর।

আগেই দেখেছে রানা, কনসোলের বাম দিকে, অনেকটা দূরে, খোলা দরজা সহ একটা এলিভেটর আছে–একজন টেকনিশিয়ানের পাশে। লোকটা গাইডেন্স সিস্টেম মনিটর করছে।

রানার পকেট থেকে পাওয়া জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করছে মুরেল। চাবি, মানি ক্লিপ, পেন, কয়েন। পেনটা ভাল করে পরীক্ষা করল সে। এমনকি একবার চাপ দিয়ে ক্লিক আওয়াজটাও শুনল। আবার চাপ দিয়ে বন্ধ করার আগে একটা প্যাডে নিজের নাম লিখল। কলমটা সে কনসোলে রেখে দিতে স্বস্তিবোধ করল রানা। আরও কয়েকবার চাপ দিলে মাইন অ্যাকটিভেট করার সময়ই পাওয়া যেত না।

হঠাৎ মুরেলের একটা হাত রানার বাম হাতের দিকে ছুটে এল। 'ঘড়িটা, রানা, প্লীজ।' হ্যাঁচকা টানে কব্জি থেকে ওটা খুলে নিল সে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে পরীক্ষা করছে। 'বিসিআই-এর টেকনিকাল ব্রাঞ্চ থেকে পেয়েছ, তাই না? আমি জানি, ওখানে যারা কাজ করে তাদের সবার মাথায় কুবুদ্ধি ঠাসা। তোমার কাছে এটা দেখছি নতুন একটা মডেল।' ধীরে ধীরে ঘড়িটা ঘোরাল সে, দেখা গেল তলার দিকে লাল একটা বিন্দু মিটমিট করছে। 'আগে বোধহয় চাবির বোতামে চাপ দিতে হবে, তাই না?' দিলও চাপ। তারপর আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল ডান দিকের ছোট একটা বোতামে। লাল আলোটা স্থির হয়ে গেল। রানা জানে, মাইনগুলোর ভেতর আর্মিং ডিভাইস অচল হয়ে গেছে, ফিরে গেছে আগের ডিঅ্যাকটিভেটেড মোড-এ। ও ধারণা করল, ইতিমধ্যে ট্যাংকগুলো থেকে যথেষ্ট ফুয়েল ঝরে পড়েছে–ক্যাটওয়াক হয়ে এই নিচের লেভেল পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ার কথা।

মেইনফ্রেম কমপিউটর রুমে অসহ্য শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে লিয়া। যতটা সম্ভব দ্রুত টাইপ করছে সে। নির্দেশ দেয়ার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় ছুটে ভেতরে ঢুকল চারজন গার্ড, একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ধস্তাধস্তি শুরু করল লিয়া, তারই মধ্যে সজোরে চাপড় মারল 'এন্টার কী'-তে। চেয়ার থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামানো হলো তাকে, কামরা থেকে বের করে সিঁড়ির দিকে নিয়ে আসছে।

নিচে রানাকে পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা, আর চেয়ারে বসে অপার আনন্দে হাসছে মুরেল। কীবোর্ডে তার কাজ করে যাচ্ছে কিরগিজ, কোন দিকে খেয়াল নেই। ওদের মাথার ওপর গ্লোবাল স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইট বিনিয়াকে, ধীরে ধীরে টার্গেটের কাছে সরে আসছে।

স্ক্রীন থেকে চোখ নামিয়ে ঘাড় ফেরাল রানা, লিয়া আর গার্ডদের দেখতে পেল। মনে মনে খুশি হলো ও, গার্ডদের বুট ভিজে ছাপ ফেলছে মেঝেতে। বোঝা

যাচ্ছে, চারদিকে বেশ ভালভাবেই ছড়িয়েছে ফুয়েল।

দলটা কনসোল এরিয়ায় পৌঁছুবার আগেই পেশীতে ঢিল দিল রানা। 'এখানে তোমার সেট-আপ খুবই ইন্টারেস্টিং, মুরেল। দেখতে পাচ্ছি কমপিউটরের সাহায্যে ব্যাংকের ভেতর ঢুকে পড়েছ তুমি, তারপর বিরাট অঙ্কের টাকা ট্র্যান্সফার করেছ। যতদূর বুঝতে পারছি, এরপর তুমি মিরাকল অ্যাকটিভেট করবে, ফলে লণ্ডন একটা ইলেকট্রনিক পালস-এর শিকার হবে, এবং তাতে করে টাকা সরানোর সমস্ত রেকর্ড মুছে যাবে–গোটা টার্গেট সহ। সত্যি, তোমার বুদ্ধি আর মেধার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, রানা। তোমার মুখের কথা, অতি উঁচু মানের প্রশংসা, সন্দেহ নেই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তবু এটাকে আমি শুধু চুরিই বলব, মুরেল। শেষ পর্যন্ত সবাই তোমাকে ব্যাংক ডাকাত ছাড়া কিছু বলবে না। একজন সাধারণ চোর। সাধারণ একজন খুনীও বটে।'

'তা নয়, রানা। তুমি বুঝতে পারোনি। পারবে কিভাবে, তোমার মনটা চিরকাল ছোট। শোনো হে, ইলেকট্রনিক পালস শুধুই ব্যাংক রেকর্ড মুছবে না।' তার চোখ ঝড়ো মেঘভর্তি আকাশের মত হয়ে উঠল, রানার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে। 'বৃহত্তর লণ্ডনের প্রতিটি কমপিউটরের প্রতিটি জিনিস, রানা। ট্যাক্স রেকর্ডস। স্টক মার্কেট। ক্রেডিট রেটিংস, ল্যাণ্ড রেজিস্টার। এমনকি ক্রিমিনাল রেকর্ডও…।' মুখ তুলে কাউন্ট-ডাউন ক্লকের দিকে তাকাল সে। 'আর এগারো মিনিট তেতাল্লিশ…না, বিয়াল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইউনাইটেড কিংডম আরও একবার প্রস্তর যুগে প্রবেশ করবে।'

'ইংল্যাণ্ডের পর টোকিও, ফ্রাঙ্কফুর্ট, নিউ ইয়র্ক, হঙকঙ, দিল্লী, ঢাকা। সারা দুনিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস করে দেবে তুমি।' মুরেলের দিকে এমন ভাবে তাকাল রানা, যেন করুণা করছে। 'কেন? না, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার ওপর, তোমার মা-বাবার ওপর যে অবিচার করা হয়েছিল, সেটার প্রতিশোধ নেয়া হবে!'

'তুমি থামো, রানা। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমার ভেতর সহানুভূতি বা বিবেক জাগাবার চেষ্টা করছ। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে তুমিও কম লোককে খুন করোনি। কাজেই আমাকে অহিংস নীতি শোনাতে আসা অন্তত তোমাকে একদম মানায় না।' রানাকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল মুরেলের দৃষ্টি, দেখল গার্ডরা লিয়াকে নিয়ে আসছে। 'নাকি সুন্দরী মেয়েদের বাহুবন্ধনে ঢোকার পর নিজের কৃতকর্মের কথা, নিজের অপরাধের কথা ভুলে যাও?' কনসোলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি মারল সে। 'বেঈমানীর শিক্ষা ইংল্যাণ্ডকে পেতেই হবে। আর ঢাকার কথা যদি বলো, শহরটা আমি ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব শুধু তোমার ওপর রেগে আছি বলে।'

লিয়া ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

'ওয়েলকাম টু দা পার্টি, মাই ডিয়ার লিয়া।'

তার নাম শুনে ঝট করে চেয়ারে ঘুরে বসল কিরগিজ। 'লিয়া?' হতচকিত

দেখাল তাকে।

'কমপিউটর নিয়ে খেলতে ভালবাস, কিন্তু এটা সে-ধরনের কোন খেলা নয়, কিরগিজ। সত্যিকার মানুষ মরতে চলেছে, বুঝলে, বেজন্মা কুত্তা?' ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিয়া, এক পা সামনে বাড়ল, কিরগিজের বাঁ গালে ঠাস করে চড় মারল, তারপর ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আবার।

লিয়াকে ধরে কিরগিজের কাছ থেকে সরিয়ে আনল গার্ডরা, খানিকটা ধস্তাধস্তি হলো, আর সেই ধস্তাধস্তির মধ্যে কারও একজনের ধাক্কা লেগে কনসোলের ওপর থেকে মেঝেতে পড়ে গেল কলমটা। ঝুঁকে সেটা তুলে নিল কিরগিজ, মাথায় বারবার চাপ দিয়ে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করছে।

তার দিকে চেয়ে থাকল রানা, ক্লিক-ক্লিক শব্দগুলো ওকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে। আরেকবার ক্লিক করলেই ডিভাইসটা আর্মড হয়ে যাবে। কিন্তু না, মুখের ভেতর পুরে ঘোরাতে লাগল কিরগিজ।

'ওকে তোমরা পেলে কোথায়?' গার্ডদের জিজ্ঞেস করল মুরেল।

'মেইনফ্রেমে ছিল, স্যার।'

কঠিন হলো মুরেলের চেহারা, ধমক দিল কিরগিজকে, 'দেরি করছ কেন? প্রোগ্রাম চেক করে দেখো সব ঠিক আছে কিনা।'

হেসে উঠল কিরগিজ। 'লিয়া? সাধারণ কোন খেলায়ও কোনদিন ওকে জিততে দেখিনি। ওর সাধ্য কি আমাদের ক্ষতি করে! ও তো একটা হাবা, সেকেণ্ড লেভেল প্রোগ্রামার। তাছাড়া, ওর তো ফায়ারিং কোডস-এর অ্যাকসেস নেই। ও শুধু গাইডেন্স সিস্টেম সম্পর্কে জানে,' কথাগুলোর বলার শেষ দিকে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, চেহারায় ইতস্তত ভাব। আর ঠিক এই সময় অ্যালার্ম বেজে উঠল।

একজন টেকনিশিয়ান, দূরের একটা মনিটরে বসে আছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'রেট্রো-রকেটস ফায়ারিং।'

লিয়ার এখন হাসার সময়, যদিও তার দিকে না তাকিয়ে কিরগিজের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ইতিমধ্যে কলমের মাথায় চাপ দেয়া বন্ধ করেছে সে। তিন বার চাপ দিলে কলমটা আর্মড হয়ে যাবে। আরও তিনবার চাপ দিলে ডিজআর্মড হবে।

এক ছুটে টেকনিশিয়ানের কাছে চলে এল কিরগিজ, ডান হাত দিয়ে কীবোর্ডে ঘুসি মারছে। 'বিনিয়া সাতানব্বুই মাইলে নেমে এসেছে, আরও নামছে, আরও নামছে। সর্বনাশ, আমি কন্ট্রোল ফিরে পাচ্ছি না!'

'এ-সব কি? কি ঘটছে?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুরেল, কিরগিজের দিকে হেঁটে আসছে। কিরগিজ আর টেকনিশিয়ান লোকটাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

'তেরো মিনিটের মধ্যে রি-এণ্ট্রি করতে হবে আমাদের,' বলল মুরেল, হাত বাড়িয়ে একটা রি-এণ্ট্রি ক্লক সেট করল। উজ্জ্বল লাল আলো ফ্ল্যাশ করল টাইমার। এখন টাইম টু টার্গেট-এ লেখা ফুটেছে—অ্যাবরটেড। টাইম টু রি-এণ্ট্রি: 13:24.

অটুট নিস্তব্ধতার ভেতর কথা বলে উঠল লিয়া, 'আটলান্টিকের ওপর কোথাও

পুড়ে শেষ হয়ে যাবে ওটা।'

'ওরে ডাইনী!' টেকনিশিয়ানের কীবোর্ডের সাহায্যে এখনও কন্ট্রোল ফিরে পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিরগিজ। মুরেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে মাথা তুলল সে। 'ডাইনীটা অ্যাকসেস কোডস বদলে দিয়েছে।'

তার কথা শেষ হতেই ঝট করে পিস্তল বের করল মুরেল, চেপে ধরল কিরগিজের কানের নিচে।

হেসে উঠল লিয়া। 'ইচ্ছে হলে খুন করো কিরগিজকে, রবিন হুড। আমার কাছে ওর কোন গুরুত্ব নেই।'

নরম চোখে লিয়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'আমাদের পেশায় এটা একটা বেসিক রুল। সব সময় ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'লিয়ার কোডস আমি ভাঙতে পারব, পিস্তলটা সরান!' হাত ঝাপটা দিয়ে অস্ত্রটা সরিয়ে দিল কিরগিজ, ওটা যেন একটা পোকা, তারপর টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরল। 'গাইডেন্স সাব-রুটিনস লোড করো, জলদি!' কথা শেষ করে আবার সে কলমটা নিয়ে খেলা শুরু করল।

ক্লিক-ক্লিক

ক্লিক-ক্লিক।

এত দ্রুত এবং ঘন ঘন ক্লিক করছে কিরগিজ, রানা আর গুণতে পারল না। কিরগিজ পিস্তলটা সরিয়ে দেয়ার পর মুরেল সেটা এবার লিয়ার দিকে তাক করেছে। 'বলো ওকে। কি বলছি শুনতে পাচ্ছ? বলো ওকে।'

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল কিরগিজ, লিয়ার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে, 'লিয়া, কোডগুলো দাও আমাকে। দাও বলছি!'

লিয়ার মুখের সামনে কলমটা ঝাঁকাচ্ছে কিরগিজ। ওটার স্ট্যাটাস এখন জানা নেই রানার। যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে, কাজেই ঝুঁকিটা এবার নিতে হয়। বিদ্যুৎবেগে হাত চালাল ও, মুরেলের মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পিস্তলটা, একই সঙ্গে পা চালিয়েছে কিরগিজের হাত লক্ষ্য করে।

ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেল কলমটা। এক সময় মনে হলো, বাতাসে স্থির হয়ে আছে। তারপর নিচে নেমে আসছে। বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ভেজা মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বিস্ফোরণ এবং আগুনের আকস্মিক লাফ ওদের সবাইকে হাত তুলে মুখ ঢাকতে বাধ্য করল। আগুনের চাদর থেকে সবাই যে যার চোখ বাঁচাতে ব্যস্ত। জ্যান্ত প্রাণীর মত সিঁড়ি বেয়ে ছুটল আগুন, ফিরে যাচ্ছে ফুয়েলের উৎসে।

প্রথম ফুয়েল ট্যাংকটা বিস্ফোরিত হলো। ইতিমধ্যে লিয়ার হাত ধরে ফেলেছে রানা, ওদের বাম দিকের এলিভেটরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে ঘটাং করে বন্ধ করল দরজা, পরমুহূর্তে পাইডিং দরজায় আঘাত করল কয়েকটা বুলেট।

'ও কি তোমার কোড ভাঙতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'অসম্ভব নয়,' বলল লিয়া, প্রায় নিরুদ্বিগ্ন গলায়।

'সেক্ষেত্রে ট্র্যান্সমিটারটা নষ্ট করতে হবে।' মাথা কাত করে তাকাল রানা, সংখ্যাগুলোকে বাড়তে দেখল। মনে মনে আশা করছে এলিভেটর ওদেরকে এই ফ্যাসিলিটির একদম মাথায় পৌঁছে দেবে।

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।' রানার দিকে তাকিয়ে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল লিয়া। 'ভাল কথা, ধন্যবাদ। আমি এখনও অক্ষত ও সুস্থ আছি।'

'গুড।'

ক্যাটওয়াকের গোড়ায় থামল এলিভেটর, এই ক্যাটওয়াক চলে গেছে ট্র্যান্সমিটার ক্রেডল-এর দিকে।

সশস্ত্র একজন গার্ড খোলা দরজার দিকে ফিরতেই দেখতে পেল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মেয়েটা। কিছু চিন্তা না করেই ছুটল সে, ছোটার পথে হাতের মেশিন পিস্তলটা ফেলে দিল, সাহায্য করার জন্যে এতই ব্যগ্র। অচেতন শরীরটার ওপর ঝুঁকল সে, সেই সঙ্গে ছাদ থেকে খসে পড়ল রানা।

গার্ডের পিঠে পা দিয়ে পড়ল রানা, পড়েই লোকটার ঘাড়ে হাতুড়ি ঠোকার ভঙ্গিতে কনুই চালাল। ভোঁতা আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলা থেকে, মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

লিয়া সিধে হচ্ছে, গার্ডের কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। মেশিন পিস্তলটা তুলছে ও, দু'জনেই অনেক নিচে থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল।

'কিভাবে চালাতে হয় জানো?' লিয়ার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল লিয়া, পাইড মুভমেন্ট চেক করল, ম্যাগাজিন বের করে দেখে নিল পুরোপুরি লোড করা আছে কিনা। 'হ্যাঁ,' বলল সে।

'গুড। আড়ালে সরে থাকো, ডিশ থেকে নেমে যাও। আমি অ্যান্টেনাটা নষ্ট করে দিয়ে আসি। তাতেই তো কাজ হবে, নাকি?'

'তোমাকে শুধু মেইনটেন্যান্স হ্যাচে পৌঁছুতে হবে। ওখানে সম্ভবত খুব সহজ একটা চেইন ডিভাইস আছে, অ্যান্টেনা ঘোরাবার জন্যে মেকানিজম হিসেবে কাজ করে। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি মেইনটেন্যান্স রূমের সব ক'টা ফিউজ সরিয়ে ফেলো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও।'

নিচে বিস্ফোরণ হচ্ছে, ডিশ আর সুপারস্ট্রাকচার কেঁপে উঠছে বারবার। লিয়াকে একটা চুমো খেয়ে উঁচু মেইনটেন্যান্স রূমের দিকে উঠতে শুরু করল রানা। অ্যান্টেনার অনেক ওপরে ওটা।

•

এগারো

ওঠাটা ক্লান্তিকর। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর স্ট্রাকচারটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল রানা। চল্লিশ ফুট ওপরে পৌঁছে নিচের দিকে তাকাল ও, দেখল ছুটে ডিশের কিনারায় চলে গেছে লিয়া, জাফরি টপকে মাটিতে নেমে জঙ্গলের দিকে দৌড়াল।

প্রথমে রানার প্ল্যান ছিল ক্যাটওয়াকে থামবে। বিরাট মেটাল মেইনটেন্যান্স রুমের দশ ফুট ওপরে ট্রাইয়্যাঙ্গলটাকে ক্রস করেছে ওটা। একটা হাউজিং থেকে অ্যান্টেনার ঝুরিগুলো নিচে নেমে এসেছে, থেমেছে ডিশ থেকে প্রায় ফুট দশেক দূরে। এই হাউজিং-এর সরাসরি ওপরে মেইনটেন্যান্স রুমটা। এখন রানা দেখতে পাচ্ছে, আরও বড় একটা চেম্বার রয়েছে, অনেক ওপরে, ট্রাইয়্যাঙ্গল-এর একেবারে মাথায়। এই কামরাটা থেকে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে অনেকগুলো কেবল আর ওয়ায়্যার। অ্যান্টেনা কিভাবে অপারেট করা হয়, ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করল রানা।

রূপালি আঙুল সচল করার কাজে ট্রাইয়্যাঙ্গল-এর মাথা থেকে নেমে আসা কেবল আর ওয়ায়্যারগুলোর নিশ্চয়ই ভূমিকা আছে। কোনটা সরাসরি নিচে নেমেছে, মেইনটেন্যান্স চেম্বার হয়ে। ওখান থেকে যেখানেই যাক, অ্যান্টেনা রিপজিশনিং-এর জন্যে আসল মেকানিজম সেখানে থাকারই কথা। অথচ আরও এক সেট মোটা কেবল রয়েছে। এগুলো অনেকগুলো পুলি আর হুইলের ভেতর দিয়ে গেছে।

স্ট্রাকচারের মাথা থেকে রানা যখন ত্রিশ ফুট নিচে, দেখল এই কেবলগুলো ডিশের দূর প্রান্তে চলে গেছে, কাজ করছে একটা কেবল কার-এর অবলম্বন হিসেবে। কারটা ডিশ লেভেল থেকে ক্যাটওয়াক পর্যন্ত উঠে আসতে পারে।

নিজেকে তিরস্কার করল রানা, কেবল কারটা আগে দেখতে পেলে মূল্যবান সময় বাঁচাতে পারত।

অনেক নিচে থেকে এখনও বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসছে।

কন্ট্রোল কমপ্লেক্সে ফুয়েল ট্যাংকগুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে, টপ সেকশনের ওপর ছাদ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ছুটোছুটি করছে গার্ডরা, তবে সবাই জানে যে ছাদটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। টাইলস আর ইনসুলেশন এরইমধ্যে খসে পড়তে শুরু করেছে, মুরেলের লোকজন বারবার মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকাচ্ছে, যেন বুঝতে চায় ঠিক কোন সময় কমপ্লেক্স ত্যাগ করতে হবে।

বিপদ সম্পর্কে বেখেয়াল একমাত্র কিরগিজ। কীবোর্ডে বসে স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে সে। নিজের কাজে মগ্ন, অন্য কোন দিকে

তাকাবারও সময় নেই।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুরেল, কিরগিজের প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে। 'আর কতক্ষণ লাগবে?' চারদিকে তাকাল মুরেল, উপলব্ধি করল পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে।

কিরগিজ জানাল, তার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। 'আর দু'মিনিট··· খুব বেশি হলে তিন।'

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে রানার কথা ভাবল মুরেল। পালিয়েছে ও, কিন্তু পালিয়ে গেল কোথায়? খুব ভাল করেই জানা আছে তার, হার মানার লোক মাসুদ রানা নয়। পালায়নি, সরে গেছে। সরে গিয়ে কলকাঠি কিছু একটা নিশ্চয়ই নাড়ছে। কি হতে পারে সেটা?

অ্যান্টেনার কথা মনে পড়ল মুরেলের। ভাবল, রানার কাছে যদি আরও বিস্ফোরক থাকে, তাহলে তো সর্বনাশ। পাশে দাঁড়ানো গার্ডের দিকে তাকাল সে। 'ওর ওপর নজর রাখো,' কিরগিজের দিকে আঙুল তাক করল। 'চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখলে গুলি করবে।'

ছুটল মুরেল, ফায়ারফাইটারদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে পথ থেকে। কেবল কারের দিকে যাচ্ছে সে, ওটা তাকে মেইনটেন্যান্স রুমের ওপর ক্যাটওয়াকে পৌঁছে দেবে।

দু'মিনিটের মাথায় ছোট খাঁচাটার ভেতর পৌঁছে গেল সে, ধীর গতিতে উঠতে শুরু করল স্ট্রাকচারের ওপর।

কিরগিজের সামনে কাউন্টডাউন ক্লকে রিডিং এখন–টাইম টু রি-এন্ট্রি: 09:41.

মুরেল যখন ক্যাটওয়াকের দিকে যাত্রা শুরু করল, রানা তখন ফ্রেমওয়ার্কের মাথায় চেম্বারে পৌঁছে গেছে।

চেম্বারটা চারকোনা, ইস্পাত দিয়ে তৈরি। আলাদা দুই সেট মেশিনারির মাঝখান দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে এগোল রানা। এক পাশে খাঁজ কাটা অনেকগুলো হুইল, যেগুলো থেকে কেবল বেরিয়ে আসছে, নেমে যাচ্ছে নিচে। ও যখন চেম্বারে পা দিল, হুইলগুলো তখনই ঘুরতে শুরু করেছে, স্টার্ট নিয়েছে মেকানিজম। তারমানে কেবল কার-এ কেউ একজন আছে। তারমানে ওর হাতে সময় খুব কম।

দরজার ঠিক পাশেই বিরাট একটা চৌকো কাঠামো দেখা গেল, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল জিনিসটা সচল। কিন্তু কোন দরজা বা ফাঁক-ফোকর দেখা যাচ্ছে না। রানা উপলব্ধি করল, এটা আসলে জেনারেটর, অ্যান্টেনা নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়।

ওপরে ওঠার সময় রানা ভেবেছে, প্রয়োজনে শেষ মাইনটা ব্যবহার করবে ও। এগুলো শুধুই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ব্যবহার করা যায়, তবে একটা টাইমারে সেট করা সম্ভব। ওর আসল সমস্যা হলো, মাইন ফাটানোর জন্যে টাইমারটা শুধু ফাইভ-মিনিট ডিলে-তে সেট করা যায়।

পাউচ থেকে কালো বৃত্তাকার জিনিসটা বের করল রানা, ওটার সঙ্গে বেরুল ছোট একটা স্ক্রুড্রাইভার। তলার স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল। রানা কাজ করছে ধীরে, শান্তভাবে। বিস্ফোরক এমন এক জিনিস, তাড়াহুড়ো করলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ খোয়াতে হতে পারে।

কাজটা তখনও শেষ হয়নি, একটা ঝাঁকি খেয়ে কেবল কার মেকানিজম থেমে গেল। কার-এ যেই থাকুক, ক্যাটওয়াকে পৌঁছে গেছে সে।

মাইনের ভেতর থেকে রিমোট টাইমার বের করল রানা–ছোট একটা মাইক্রোচিপ, কড়ে আঙুলের নখের সমান। ওটার নিচে খুদে একটা ডায়াল রয়েছে, সচল পয়েন্টার সহ–ঘড়ির কাঁটার মত। স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে পয়েন্টারটা ঘোরাল ও, ঘুরিয়ে সর্বশেষ প্রান্তে নিয়ে এল। মেকানিজম ক্লিক-ক্লিক শুরু করল, ধীরে ধীরে পিছন দিকে সচল হলো পয়েন্টার। জেনারেটরের নিচে মাইন বসিয়ে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল রানা, নিচের ক্যাটওয়াকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাত্র তিন ধাপ নেমেছে রানা, বাতাসে শিস কেটে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট। কাঁধ থেকে এক ঝটকায় মেশিন পিস্তল নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল ও।

ক্যাটওয়াকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুরেল, তার ডান হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল, লক্ষ্যস্থির করছে আবার।

স্ট্রাকচারের ভেতর থেকে ঘুরে লক্ষ্যস্থির না করেই মুরেলের দিকে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা। বুলেট লাগল না, তবে মুরেল মাথা নিচু করে ছুটল, ক্যাটওয়াকের শেষ মাথায় পৌঁছে ঢুকে পড়ল কাছাকাছি আড়ালে–কেবল কার-এর ভেতর।

আবার নামতে শুরু করল রানা, গুলি করল আরও এক পশলা। স্টীলের পাতে গুলি লাগায় আগুনের ফুলকি ছুটল, কিন্তু ওর টার্গেট অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ক্যাটওয়াক এখন আর মাত্র বারো কি তেরো ফুট নিচে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা। এই এক সেকেণ্ডের অনিশ্চয়তা ওর প্রাণ কেড়ে নিতে যাচ্ছিল। কেবল কার-এর দিক থেকে দুটো গুলি ছুটে এল, দুটোই ওর মাথার কাছাকাছি বীমে লাগল। দোল খেয়ে ট্রাইয়্যাঙ্গল-এর রড ও বীম-এর ভেতর গা ঢাকা দিল রানা, তারপর খসে পড়ল নিচের ক্যাটওয়াকে, পা শূন্যে থাকতেই কেবল কার লক্ষ্য করে গুলি করছে।

কেবল-কার খালি, এটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল রানা। ঠিক সময়মত ঘাড় ফিরিয়েছিল, তা না হলে মুরেলকে দেখতেই পেত না। যেভাবেই হোক ক্যাটওয়াকের আরেক দিকে চলে গেছে সে, পজিশন নিয়েছে রানার পিছনে।

রবিন হুড ওরফে পিটার মুরেল সন্তুষ্টির হাসি হাসছে। অটোমেটিকটা তুলল সে। 'বিদায়, বন্ধু, শুভেচ্ছাসহ,' বিড়বিড় করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগারটা।

আওয়াজটা শতগুণ হয়ে কানে বাজল, যেন লাউডস্পীকার থেকে বেরিয়ে এসেছে–ফায়ারিং পিন নেমে এসে শব্দ করল ক্লিক। কাকে যেন অভিশাপ দিয়ে

খালি পিস্তলটা সোজা রানার দিকে ছুঁড়ে মারল মুরেল। রানা এরইমধ্যে নিজের অস্ত্র তুলেছে, মনোযোগ দিয়ে নিশানা ঠিক করছে।

মাথার একটা পাশে বাড়ি মারল পিস্তলটা, ঠিক যখন গুলি করছে ও। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ও, আর তারপরই জোরাল একটা ক্লিক শোনা গেল, লকড হয়ে গেছে মেশিন পিস্তল। তারমানে রানার অ্যামুনিশনও শেষ।

মাথায় আঘাত পাওয়ায় সামান্য আচ্ছন্নবোধ করছে রানা, মুরেলকে ছুটে আসতে দেখেও সরে দাঁড়াবার যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল না। মাত্র এক পা সরতে পারল, মুঠো করা একটা হাত ওপরে তুলল, মুরেলের চোয়ালে মারবে।

মুরেলের মাথার পাশে লাগল ঘুসিটা, পড়ে গেল সে, ক্যাটওয়াকের ওপর গড়াচ্ছে।

নিচে তাকাল রানা, নিচের মেইনটেন্যান্স রুমের ছাদ মাত্র দশ ফুট নিচে। এবার আর রানা ইতস্তত করল না, ক্যাটওয়াক থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল ছাদটার ওপর।

হামাগুড়ি দিয়ে এক পাশে সরে এল ও, নিচের দিকে গড়িয়ে হ্যাচের দিকে এগোল। হ্যাচের ভেতর ঢুকেছে, ইলেকট্রিক মটরের গুঞ্জন ঢুকল কানে। কেউ একজন নতুন পজিশনে আনছে অ্যান্টেনাটাকে।

মাটির তলায় বিজয়ী বীরের মত রণহুঙ্কার ছাড়ছে কিরগিজ, সেই সঙ্গে নাচছে। 'আমার কোন তুলনা নেই! আমি সব পারি! আমি অজেয়!' তারপর স্থির হলো সে, কীবোর্ডে আবার বসল, টাইপ করল ফাইন্যাল কমাণ্ড—সেণ্ড কমাণ্ড: অ্যাবর্ট রি-এণ্ট্রি।

কাউন্টডাউন ক্লকে রিডিং পড়ল সে- রি-এন্ট্রি: 07 : 45.

তারপর স্ক্রীন পরিষ্কার হলো, মেসেজ ফুটে উঠল—স্ট্যাণ্ডবাই: অ্যান্টেনা রিপজিশনিং।

মেইনটেন্যান্স রুমে যে যান্ত্রিক গুঞ্জনটা শুনেছিল রানা, সেটা ছিল মেকানিজম অপারেট ও কোঅর্ডিনেটস রিসেট করার শুরু, অ্যান্টেনার লম্বা ও বাঁকা স্পাইক সঠিক পয়েন্টে নিয়ে এসে স্যাটেলাইটের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার প্রস্তুতি। চারদিকে চোখ বুলাল ও, যে-কোন ধরনের ফিউজ বক্স খুঁজছে। কিন্তু মেইনটেন্যান্স রুমের প্রতিটি ইকুইপমেন্ট সীল করা। ধূসর রঙের বড় একটা মেটাল বক্স বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে, আর স্ট্রাকচারের মাথায় যে মেকানিজম রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা কেবলগুলো সবই প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে সুরক্ষিত করা।

দাঁড়িয়ে আছে রানা, ইলেকট্রনিক্স অকেজো করার উপায় খুঁজছে, হঠাৎ ভারি কিছু পতনের আওয়াজ হলো, কেঁপে উঠল গোটা কামরা। রানার সন্দেহ হলো, লাফ দিয়ে মুরেলও সম্ভবত ক্যাটওয়াকে পড়েছে।

যে-কোন মুহূর্তে মাইনটা বিস্ফোরিত হবে বলে আশা করছে ও। কিন্তু যদি কোন কারণে মাইনটা না ফাটে? রানা নিশ্চিত হতে চায় অ্যান্টেনা যাতে সঠিক

পয়েন্টে লক্ষ্যস্থির করতে না পারে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে নিচে তাকাল ও, তারপর খসে পড়ল, নেমে এল হাউজিং-এ। ওর জানা আছে যে মেকানিজমের চূড়ান্ত স্তরটা এখানেই।

বিরাট বৃত্তাকার হাউজিং-এ একটা হ্যাচ আছে, সেটা গলে দ্রুত ভেতরে ঢুকল রানা, জানে ওর পিছু নিয়েছে মুরেল।

ভেতরে জায়গা খুব কম, কারণ বিশাল আকৃতির ঘড়ির মত দেখতে একটা হুইল বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো জিনিস লক্ষ করল রানা–লম্বা একটা ফিউজ বক্স, আর একটা টেলিস্কোপিক মই। মইটা দেয়ালের সঙ্গে লাগানো, একটা স্টীল ট্র্যাপডোরের সরাসরি ওপরে। এটা, রানা উপলব্ধি করল, এঞ্জিনিয়ারদের পথ, সরাসরি অ্যান্টেনায় নেমে যাওয়া যায়। রানা আন্দাজ করল, এই জায়গা থেকে ডিশটার দূরত্ব আশি থেকে নব্বুই ফুটের মত হবে।

মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তারই মধ্যে ফিউজ বক্সের বাটারফ্লাই বোল্টের স্ক্রু খুলে ফেলল রানা, ঢাকনি তুলে প্রতিবারে পাঁচ-ছ'টা করে ফিউজ ভেঙে ফেলল। এক সময় একটা ফিউজও অক্ষত থাকল না। মেশিনের গুঞ্জন থেমে গেছে।

মুরেল ইতিমধ্যে কাছাকাছি চলে এসেছে। রানা যেন তার গন্ধ পাচ্ছে নাকে। ঠিক যেমন গন্ধ ছড়াচ্ছে ওর নিজের ভয়। লাফ দিয়ে টেলিস্কোপিক মইটার কাছে চলে এল ও, দেয়াল থেকে নিচে ফেলার জন্যে সেফটি বোল্ট-এর ক্লিপ খুলল।

হ্যাচওয়েতে হাজির হলো মুরেল, ওই একই সময়ে ট্র্যাপডোরে সজোরে লাথি মারল রানা, হাত দুটো মইয়ের নিচের দিকের ধাপে।

ট্র্যাপডোর খুলে গেল, কুণ্ডলী ছাড়াল মই। মইটা নেমে গেল প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে, পুরোপুরি বিস্তৃত হবার পর ভীতিকর একটা ঝাঁকি খেয়ে থামল, অ্যান্টেনার মাথা থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে।

রানার মনে হলো সকেট থেকে খুলে আসবে ওর বাহু দুটো, তবু দাঁতে দাঁত চেপে মইটা আঁকড়ে ধরে থাকল। ওর মাথার ওপর ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ করছে ওটা, দোল খাচ্ছে। এই সময় ট্র্যাপডোরে দেখা গেল মুরেলের মুখ।

'নিচে নামার জন্যে তোমার বুঝি সাহায্য দরকার, দোস্ত?' চিৎকার করল সে। 'তোমার কাছে এখুনি আসছি আমি, অপেক্ষা করো।' ট্র্যাপডোর গলে ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল সে। মইয়ের শেষ ধাপ থেকে ওপরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রানা।

একটা শব্দ শুনেছে লিয়া, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেদিকে হাঁটছে সে। গাছপালার ফাঁক থেকে একবার যা দেখেছে দ্বিতীয়বার আর তা দেখতে চায় না সে– দোদুল্যমান মইয়ের শেষ মাথায় ঝুলছে রানা, ডিশের তলা থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে, সরাসরি অ্যান্টেনার ওপর। আওয়াজটা লক্ষ্য করে ধীর পায়ে, সাবধানে এগোচ্ছে সে। সামনে গাছ ও ঝোপ কেটে ফাঁকা একটা জায়গা তৈরি করা হয়েছে.

সেটার কিনারায় পৌঁছুনোর আগেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা হেলিকপ্টার গানশিপ, রোটরগুলো অলসভঙ্গিতে ঘুরছে।

মাটির নিচে, কন্ট্রোল কমপ্লেক্সে, চোখে নগ্ন অবিশ্বাস নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিরগিজ। স্ক্রীনে ফুটে রয়েছে—অ্যান্টেনা ম্যালফাংশন। মেঝেতে পা ঠুকে চিৎকার শুরু করল সে, দুর্বোধ্য খিস্তি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

রানার ওপর রয়েছে মুরেল, মই বেয়ে নেমে আসছে ওর দিকে, এক ধাপ এক ধাপ করে। রানার কাছ থেকে দু'ধাপ ওপরে পৌঁছে থামল সে, একটা হাত মই থেকে তুলে নিল, তারপর শার্টের পকেট থেকে ছোট একটা থ্রোট মাইক্রোফোন বের করে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারা থেকে লিয়া দেখল হেলিকপ্টারের ককপিটে একা শুধু পাইলট রয়েছে। যান্ত্রিক ফড়িং-এর এঞ্জিন আরও জোরে গর্জন করে উঠল, বেড়ে গেল রোটরের গতি। বোঝাই যায়, আকাশে উড়তে যাচ্ছে পাইলট। ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটল লিয়া, সোজা হেলিকপ্টারের পিছন দিককার দরজা লক্ষ্য করে।

'এবার, রানা, শেষবারের মত বিদায় জানাচ্ছি তোমাকে।' রানার ঠিক ওপরের ধাপটায় নেমে এল মুরেল, পা তুলল ওর হাতে লাথি মারার জন্যে। পা তুলেছে মুরেল, হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে ভেঙে গেল ধাপটা।

খসে পড়ছে মুরেল। রানা অনুভব করল ওর পায়ে ঘষা খেয়ে নিচে নামছে সে। সচেতন কোন প্রয়াস নয়, স্রেফ রিফ্লেক্সই বলা যায়, খপ করে একহাতে তার কব্জিটা ধরে ফেলল ও।

বিশ্বাসঘাতক লোকটা মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল, মুখে ঘাম আর আতঙ্ক। 'রানা, ভাই আমার,' বলল সে, চোখ ভরা অনুনয়। 'তোলো আমাকে, প্লীজ। ফর গড'স সেক...অন্তত বন্ধুত্ব আর স্নেহ-ভালবাসার খাতিরে। প্লীজ, রানা, প্লীজ। তোলো আমাকে!'

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার। পুরানো দিনের কথা বলছে মুরেল। এক সময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের মধ্যে। এক সঙ্গে অনেক আনন্দ ও শোকের ভাগীদার ছিল দু'জন। একটা সময় ছিল, যখন রানাকে শ্রদ্ধা করত মুরেল, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হবার পর রানাই তাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়ে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু সেই মুরেল আর এই মুরেল এক মানুষ নয়। কাজেই এই মুরেলের ওপর রানার কোন দুর্বলতা থাকতে পারে না। তবু, তবু কেন যেন, এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা, অনুভব করল বুকে একটা টনটনে ব্যথা। রানা তখন ভাবল, এভাবে লোকটাকে মরে যেতে না দিয়ে বন্দী করলে কেমন হয়? আইনের হাতে তুলে দিলে? তারপর মনে পড়ল, মুরেল একা নয়...

তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি রানা। ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিল মুরেল। মুক্ত হাতটা দিয়ে রানার হাতটা ধরল সে, তারপর হ্যাচকা একটা ঝাঁকি দিল–রানাকেও খসিয়ে আনতে চেষ্টা করল মই থেকে।

ম্লান ও বিষণ্ণ দেখাল রানাকে। 'গো টু হেল,' বলে ছেড়ে দিল মুরেলের কব্জি।

আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুরেলের গলা চিরে। অ্যান্টেনার ওপর পড়ল সে, সেখান থেকে সেই একদম ডিশ পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে।

ঠিক ওই একই সময়ে ট্রাইয়্যাঙ্গল-এর মাথাটা বিস্ফোরিত হলো। মাইনটা ফেটেছে। গোটা কাঠামো দুলতে শুরু করল, খণ্ডবিখণ্ড মেটাল আর ছিন্নভিন্ন ওয়্যারিং ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এত সব শব্দের মধ্যেও রানার মনে হলো একটা হেলিকপ্টার আসছে। এখনও মইয়ের শেষ মাথায় ঝুলে আছে ও, দেখল গানশিপটা সরাসরি ওর দিকেই ছুটে আসছে। যতটা সম্ভব কাছাকাছি চলে এল ওটা। সেদিকে তাকিয়ে রানার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাইলট একটু একটু করে রানার আরও কাছাকাছি সরিয়ে আনছে হেলিকপ্টার। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে লিয়া, হাতের পিস্তল আতঙ্কিত লোকটার মাথায় চেপে ধরা। লিয়ার নির্দেশে কাজ করছে সে, যদিও কঙ্কালসদৃশ প্রকাণ্ড কাঠামোটার কাছাকাছি আসাটা এখন মোটেই নিরাপদ নয়।

ঘন ঘন এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরে একটু একটু করে এগিয়ে এল গানশিপ, এক মিনিট পর হেলিকপ্টারের পোর্ট ল্যান্ডিং স্কিড এমন এক পয়েন্টে পৌঁছুল, ধাপ ধরে রানা যেখানে ঝুলছে তার ঠিক সামনে ও নিচে। এটাই একমাত্র সুযোগ, কারণ, মনে হলো ওর চারপাশে সবকিছু ধসে পড়তে যাচ্ছে। দোল খেয়ে ধাপ ছেড়ে দিল রানা, লাফ দিয়েছে শূন্যে। ঠিক যখন পিছু হটে সরে যেতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার, খপ করে ধরে ফেলল স্কিডটা।

ডিশের মাঝখানে জ্ঞান ফিরে পেল মুরেল। তার চোখ খোলা, মুখে রক্ত, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা। সন্দেহ নেই, মৃত্যুর খুব কাছে চলে এসেছে সে। নিজেও তা জানে।

তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে ওপর থেকে। খসে পড়ছে ভাঙাচোরা, বিচ্ছিন্ন মেটাল। মাথা ঘুরিয়ে ওপর দিকে তাকাতেই লম্বা রুপালি একটা স্পাইক দেখতে পেল মুরেল, এই তো, খানিক আগে পর্যন্ত ওটা অ্যান্টেনা ছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে নেমে আসছে। নেমে আসছে সরাসরি তার দিকে। চিৎকার করবে, সে শক্তিও নেই। চোখ বুজল সে, তারপরও দেখতে পাচ্ছে স্পাইকটাকে।

কন্ট্রোল কমপ্লেক্সের ভেতর এখনও উন্মাদের মত আচরণ করছে কিরগিজ, তবে বুঝতে পারছে গার্ডদের বেশিরভাগই হয় মারা গেছে নয়তো পালিয়েছে। মনে হলো একমাত্র সে একাই জীবিত। যতই পাগলাটে হোক, পৈত্রিক প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে মাঝখানের গ্যালারি লক্ষ্য করে ছুটল সে। মেইনফ্রেম রুমে যেই পৌঁচেছে, অমনি অকস্মাৎ লিকুইড কুল্যান্ট বিস্ফোরিত হলো। ছুটে এল সাদা হিম

কুয়াশা, শাটার লাগানো দরজা ভেদ করে গেল।
কি ঘটছে বোঝার জন্যে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় পেল কিরগিজ, তারপরই বরফ হয়ে গেল সে। ওখানেই দাঁড়িয়ে। বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটির মাঝখানে বরফের তৈরি একটা স্ট্যাচু।

ফাঁকা জায়গাটায় ধীরে ধীরে নেমে এল গানশিপ। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল রানা, আড়মোড়া ভাঙল, চোখ দুটো বন্ধ।
হেলিকপ্টারের ভেতর রুশ ভাষায় কথা বলছে লিয়া, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে। পাইলটকে সাবধান করে দিল, যদি কোন চালাকি করার ইচ্ছে না থাকে, তাহ চলে যেতে পারে সে। তারপর মেইন ডোর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল রা পাশে।
গানশিপ নিয়ে আকাশে উঠল পাইলট।
নিচে ব্যাকুল সুরে ডাকছে লিয়া, 'রানা…? রানা…? তুমি ঠিক আছ তো? রানা, প্লীজ কথা বলো।' মাটিতে শুয়ে রয়েছে রানা, চোখ বন্ধ, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।
একটা চোখ খুলে লিয়াকে নিজের দিকে টেনে নিল রানা। 'কে বলেছে কিছু হয়েছে আমার?'
'ওরে পাজী!' হেসে উঠল লিয়া, রানা তাকে আরও কাছে টেনে আনল, ফলে এক হয়ে গেল দুটো মুখ। তারপর দু'হাত দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিল ও।
'রানা, না। প্লীজ। কেউ দেখে ফেলতে পারে।'
'বোকা নাকি,' হাসল রানা। 'কেউ আছে নাকি যে দেখবে?'
ছেলেমানুষ হয়ে গেছে যেন, মনের আনন্দে মাঠময় গড়াতে শুরু করল রানা লিয়াকে বুকে চেপে ধরে। একবার রানা নিচে পড়ে, একবার লিয়া। পাগলের মত হাসছে হা-হা করে–বাঁচার আনন্দ।
রানার চোখ শুধু লিয়ার ওপর, কাজেই ঝোপের আড়াল থেকে রবার্ট স্মিথ মাথা তুললেও তাকে দেখতে পেল না। শুধু স্মিথকে নয়, তার সঙ্গী চল্লিশজন ক্যামোফ্লেজড মেরিনকেও দেখতে পেল না। সবাই তারা ফাঁকা জায়গাটার কিনারা থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে নিঃশব্দে।
দূর থেকে ভেসে এলো মেরিন হেলিকপ্টারের আওয়াজ, রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে আসছে ওগুলো।
শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াল ওরা, সামনে এতগুলো লোক দেখে থমকে গেল– লাজুক হাসি হাসছে দুজন।

* * *

G. Manager, Executive Motors Ltd,
158 B Tejgaon–Gulshan Link
Road, Dhaka-1208 L.D F15
Sales Consultant

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

নীল বজ্র

মাসুদ রানার প্রথম লড়াইটা ছিল কেজিবির
এক কর্নেলের সঙ্গে।
কর্নেল কুরুনভ ওর প্রিয় বন্ধু পিটার মুরেলকে
গুলি করে মারেন ওরই চোখের সামনে।
এমন এক পরিস্থিতি,
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় রানা,
প্রতিশোধ নেয়াটা তখন আর হয়ে ওঠেনি।
আট বছর পর এল সুযোগ।
ক্রাইম সিন্ডিকেটের এই রবিন হুডটি আসলে কে?
শুরু হলো সেয়ানে সেয়ানে পাল্লা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০